প্রকাশিকা :
শ্রীমতী ছায়া চট্টোপাধ্যায়
শরৎ পাবলিশিং হাউস
৯/৪, টেমার লেন
কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদ :
খালেদ চৌধুরী

প্রকাশ : কলিকাতা বইমেলা '৮৫

মুদ্রাকর :
শ্রীসরোজকুমার রায়
শ্রীমুদ্রণালয়
১২, বিনোদ সাহা লেন
কলিকাতা-৭০০ ০০৬

মাঝে মাঝে কখনো বা কারো কারো সঙ্গে দেখা হয়
শুধুমাত্র সাক্ষাৎ সে নয়,
পাশাপাশি কথা বলে অগ্রসর প্রদীপ্ত মনন—
দেখা দেয় সম্ভাবনাময় এক বৃহৎ জীবন,
প্রত্যক্ষের উচ্চদাবী সেইখানে
মিলনের সাড়া পায় নক্ষত্রের গানে।
নিজেকেই করি আবিষ্কার—
দেশে দেশে সাংস্কৃতিক মিলনের দৃঢ় অঙ্গীকার।

* * *

কনিষ্ঠোপম দুই তরুণ-সুহৃদ
ইণ্ডো-জি. ডি. আর. মৈত্রী সম্পাদক
অধ্যাপক ড. পঞ্চানন সাহা
ও
সপ্তাহ-সম্পাদক
কবি-অধ্যাপক তরুণ সান্যাল-এর
ঘনিষ্ঠ হাতে
স্নেহ-উপহার

প্রসঙ্গ-কথা

বর্তমান জগৎ প্রতিদিনই আবিষ্কার করে চলেছে ছায়ান্ধকার আফ্রিকাকে। আগামী দিনে আরো জানতে হবে রাজনীতিক কি অর্থনীতিক প্রয়োজনেই নয়, তার চেয়েও বেশীটা তাকে না জানার লজ্জা কাটাতে এবং অজানাকে জানার আগ্রহে ও আনন্দে। মহাদেশ আফ্রিকার মর্মজীবনের পরিচয় লেখা তার আশ্চর্য সুন্দর শিল্পে ও সাহিত্যে। এই গ্রন্থে আফ্রিকার গদ্য সাহিত্যের কিছু ধারাবাহিক পরিচয় তুলে ধরলাম—সুপ্রাচীন সাহিত্যালোকের উপকথা-পুরাণকথা থেকে সাম্প্রতিক কালের ছোটগল্প পর্যন্ত। প্রাচীন সাহিত্যের শ্রেণীবিন্যাস: ১॥ উপকথা-পুরাণকথা, ২॥ নীতিগল্প, ৩॥ লোকগাথা-রূপকথা, ৪॥ বৈঠকী গল্প। আধুনিক সাহিত্যের শ্রেণীবিন্যাস: ১॥ আধুনিক সাহিত্যে প্রাচীন কাহিনী, ২॥ উপন্যাসের অংশবিশেষ, ৩॥ ছোটগল্প। এখানে উল্লেখ্য প্রাচীন সাহিত্য পরিবেশনে আমার ভূমিকা অনুবাদকের নয়—অনুলেখকের, এবং আধুনিক সাহিত্য অংশে অনুবাদকের। সমগ্র পরিকল্পনা' ও নির্বাচন পদ্ধতির জন্য সম্পাদকই দায়ী, এবং এখানে আমি কোনো বিদেশী গ্রন্থন কি সঙ্কলনের কোনো প্রকার সাহায্য গ্রহণ করিনি, বস্তুত এরকম সামগ্রিক সাহিত্য-পরিচিতির প্রয়াস এখনো এদেশে কি ওদেশেও হয়েছে বলে জানি না। এটা একটা প্রাথমিক প্রয়াস এবং অবশ্যই মোটা রেখাঙ্কনে তুলে ধরা। কারণ এক একটি বিষয় নিয়েই এক-একখানা বই হতে পারে, এবং হওয়াটাও প্রয়োজন বিস্তৃত পরিচিতির জন্যেই। একমাত্র ছোটগল্প নিয়েই কয়েক খণ্ড সঙ্কলন গ্রন্থ করা যেতে পারে। কিন্তু এই সঙ্কলন গ্রন্থে ছোটগল্পের ক্ষেত্রেও কয়েকজন বড় লেখককে এগিয়ে দিতে পারিনি (যেমন রিচার্ড রাইভ কিংবা লা গুমাকে), তেমনি একজন বড় লেখকেরই খুব ভালো ছোটগল্পও একাধিক নয় (যেমন, 'ওয়া থিয়ঙ্গ'ও থেকে) এই সঙ্কলন গ্রন্থ প্রসঙ্গে আমাকে সব সময়েই সচেতনও থাকতে হয়েছে—এই গ্রন্থ আফ্রিকার প্রাচীন ও নবীন জীবনের পরিচয়-মূলক কিশোর সাহিত্য, নির্বাচনের দায়িত্বটা তাই আপেক্ষিক রূপেই সংযত। তবু এখানে তুলে ধরতে পেরেছি শিশু-কিশোর জীবনেরই কিছু সহৃদয় ও সুন্দর পরিচয়। যা কিশোর-সাহিত্যের সীমা লঙ্ঘন করেছে তা এখানে স্থান দেওয়া ঠিক মনে হয়নি।

গিরি মরু নদী প্রান্তর, গ্রাম ও শহর, খনি ও ক্ষেতখামার নিয়ে মহাদেশ আফ্রিকা যেমন বহুবিচিত্র, তেমনি তার জনজীবন ও ভাষা। এদেশের সাহিত্যে ঐতিহ্যের মূল্যবোধের সঙ্গেই আধুনিক জীবনবোধের বিরোধ ও সমন্বয় প্রয়াস খুবি লক্ষ্য করবার মতো, আর স্বদেশের ও স্বজাতির চেতনার দাবীতেই স্বাধীনতা-প্রতিষ্ঠার আন্দোলন তথা মুক্তিযুদ্ধের নতুন অধ্যায়। তবে সর্বত্রই মানবিক মূল্যবোধ ধর্মবোধ-নীতিবোধ ও অকৃত্রিমতা প্রতি সরল অনুরাগ খুবি লক্ষ্যনীয় বৈশিষ্ট্য। বস্তুত আফ্রিকার সাহিত্য—যাকে বলে সৎ সাহিত্য, কখনো বা মহৎ সাহিত্য। এই সঙ্কলন গ্রন্থে এরই কিছু নমুনা যদি তুলে ধরতে পেরে থাকি, এবং লেখকদের পরিচিতিও কিছুটা,—তবে বহুদিনের পরিশ্রম ও নিষ্ঠা সার্থক মনে হবে।

এই গ্রন্থ রচনার কাজে আমি অনেক সূত্র থেকেই কিছু কিছু গ্রন্থসাহায্য পেয়েছি এখানে তা উল্লেখ্য মনে করি: কবি অধ্যাপক তরুণ সান্যাল, কবি-সাংবাদিক কৃষ্ণ ধর, জাতীয় গ্রন্থাগার এবং তার ডেপুটি লাইব্রেরীয়ান হরিশ গুপ্তা রবীন্দ্র বিচিত্রা ভবনের কিউরেটর শ্রীসমর ভৌমিক, ড. পঞ্চানন সাহা এবং পরিশেষে উল্লেখ্য আমার বড় ও ছোট দুই ছেলে: অধ্যাপক অমিতাভ চক্রবর্তী এম. এ. [এই সঙ্কলনের 'পাপিয়া গান গায়' এবং 'একটি ককিনের ইতিহাস'—তারই হাতের অনুবাদ] এবং অরুণাভ চক্রবর্তী এম. এ., এবং সহধর্মিণী বেলা দেবী—যাদের সহায়তা ছাড়া এই গ্রন্থ এভাবে গ্রন্থিত হতে পারত না।

সাধ থাকলেও সাধ্য হয় না সব সময়ে—এই একান্ত দুর্মূল্যের দুর্দিনে একাশিকার পক্ষে এই গ্রন্থের কলেবরকে আরো স্ফীত করা অর্থাৎ গ্রাহকদের বিব্রত কি বিমুখ করা স্বতই সম্ভব হ'ল না।

এই গ্রন্থের প্রথমেই সংশ্লিষ্ট চিত্রটিতে আছে মিশরের সতীমাতা আইসিস এবং পিছনের পাতায় আফ্রিকার দারুশিল্পের দুইটি সুন্দর নমুনা। ইতি॥

তাং ১. ৩. ৫৫

—অনিলেন্দু চক্রবর্তী

॥ বিষয়-নির্দেশ ॥

॥ প্রাচীন সাহিত্য ॥

॥ আধুনিক সাহিত্য ॥

সন্তানহারা পিতা ও বিধাতা

একসময় একজন লোক ছিল। একে একে মারা গেল তার সব সন্তানই—আপন বলতে কেউই আর রইল না। এতে কিন্তু সে খুবি ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল বিধাতা ভগবানের উপরেই। শোক নয়, এখন তার প্রচণ্ড ক্রোধ।

সে এক কামারশালায় গিয়ে কামারকে বলল—'এক্ষুনি আমাকে কিছু তীর বানিয়ে দাও। সবচেয়ে ছুঁচালো আর ধারালো হয় যেন। ঐ তীর দিয়ে আমি বিধাতাকে ফুঁড়ে ফুঁড়ে হত্যা করব।'

এরপর সে রওনা হল তীরগুলি হাতে নিয়ে, যেতে যেতে পেঁছিল গিয়ে পৃথিবীর পূর্বদিকের কিনারায়—যেখানে সূর্য ওঠে। সেখানে এসে সে দেখে কি, কোনো কোনো পথ চলে গেছে স্বর্গের দিকে—কোনো কোনো পথ পৃথিবীতে।

দাঁড়িয়ে রইল সে সূর্যোদয়ের প্রতীক্ষায়। এমন সময় হঠাৎ শোনে বহু লোকের পায়ের শব্দ। আর তার সঙ্গেই সে কী কলরব—'খুলে দাও, দরজা খুলে দাও। মহারাজ আসছেন!'

লোকটি দেখে কি, আলোয় আলো চারিদিক—এগিয়ে আসছেন শত শত দিব্য পুরুষ! তাঁদের সর্বশরীর থেকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে তীব্র রশ্মি! ভয়ে ভয়ে সে লুকিয়ে পড়ল পাশেই একটা ঝোপের ভিতর। চোখ গোল গোল করে দেখতে লাগল : সবার মধ্যখানে এক জ্যোতির্ময় পুরুষ। আর, অন্যসব দিব্য পুরুষেরা তাঁকে ঘিরে ধরে এগিয়ে চলেছেন ধীরে ধীরে। কী আশ্চর্য সেই স্বর্গীয় শোভাযাত্রা! লোকটি তো দেখে দেখে অবাক।

কিন্তু হঠাৎ থেমে গেল শোভাযাত্রা। সামনের দিকের দিব্য পুরুষেরা বলে উঠলেন—'এ কী দুর্গন্ধ! পৃথিবীর কোনো লোক নিশ্চয়ই চলে গেছে এই পথ দিয়ে।' চারদিকে তাকাতে তাকাতে হঠাৎ তাঁরা দেখতে পেলেন ওই লোকটিকে, তাকে শক্ত হাতে ধরে নিয়ে এলেন বিধাতা পুরুষের কাছে। বিধাতা পুরুষ জানতে চাইলেন—কী চায় লোকটি?

লোকটি বলল—দুঃখশোকেই সে ঘরছাড়া হয়েছে, এখন ঝোপের মধ্যে বসে বসে মৃত্যুরই প্রতীক্ষা করছিল।

কিন্তু বিধাতা পুরুষ বললেন—'না, তা নয়। ওটা মিথ্যা কথা। আমি আগেই জানি, তুমি আমাকে হত্যা করবার জন্যেই এসেছ। বেশ তো, এখন তাই করো।'

কিন্তু লোকটি তখন আর তা করতে রাজি নয়। বিধাতা তার সঙ্গীদের তখন বললেন—লোকটি যে কী চায়, কী জন্যেই বা এখানে এসেছে সব তিনি আগেভাগেই জানতেন। লোকটিকে এবার বললেন—'তুমি যদি তোমার সন্তানদের নিয়ে যেতে চাও, অবাধেই নিয়ে যেতে পারো। ওই তো দাঁড়িয়ে আছে তারা—আমার পিছনেই।'

লোকটি চেয়ে দেখে—সামনেই তার সেই দুই ছেলে! কিন্তু এত দীপ্তি তাদের দেহে, আর এত আশ্চর্য তাদের সেই রূপ! নিজের ছেলেদেরকেই সে যেন চিনে উঠতে পারছে না। তাই বিধাতাকে সে বলল—'ওদের উপর অধিকার এখন একমাত্র বিধাতারই। বেশ, তাই থাকুক।'

ভগবান বিধাতা পুরুষ তখন লোকটিকে বললেন—'যাও, এবার বাড়ী ফিরে যাও। পথ চলতে চলতে দেখেশুনে যেও, এমন কিছু পেয়ে যাবে—যাতে খুশিই হবে।'

—ফিরতি পথে এবার সে পেয়ে গেল হাতীর দাঁতের বিরাট এক ভাণ্ডার। আর, তার দৌলতে সে হয়ে উঠল বড়লোক।

তারপর আরো ছেলে হল তার, আর সেই ছেলেরা তাদের বাবা-মাকে বুড়ো বয়সে খুবি সাহায্য করত—সেবা-শুশ্রূষা করত।

রাজার রাজা ভগবান

রাজার কাছে হাজির হলে সকলেই বলে ওঠে—'দীর্ঘজীবী হোন মহারাজ।' কিন্তু একজন লোক ছিল সে কিনা রাজসভায় উপস্থিত হতেই বলত—'রাজার রাজা ভগবান।'

দিনের পর দিন প্রতিদিনই ঐ কথা বলত সে রাজসভায় এলেই, আর তাই শুনতে শুনতে একদিন বেজায় রেগে উঠল রাজামশাই। সে স্থির করল—লোকটাকেই সরিয়ে দিতে হবে এই দুনিয়া থেকে। আর তাই সে ফন্দী আঁটতে লেগে গেল।

একদিন সে লোকটিকে রাজসভায় ডেকে এনে তার হাতে তুলে দিল দু-দুটো দামী আংটি, দিয়েই বলল—'খুব যত্ন করে রেখে দিও।' ভালো মানুষটির মতোই একথা বললেও, রাজা মনে মনে জানে ঐ আংটির সূত্র ধরেই সে তার প্রতিহিংসা চরিতার্থ করবে।

এ লোকটা—সবাই যাকে বলে 'রাজার-রাজা-ভগবান'—সে বাড়ী গিয়েই একটা ভেড়ার শিংয়ের ভিতরটা ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করল, তারপর ভিতরে রেখে দিল ঐ আংটি দুটো। স্ত্রীকে বলল—জিনিষটা যেন সযত্নে রাখা হয়।

সপ্তাহখানেক পরেই রাজামশাই ডেকে পাঠাল ঐ রাজার-রাজা-ভগবানকে, পাঠিয়ে দিল তাকে বিশেষ এক কাজে বহুদূরের এক গাঁয়ে। তার রাজ-বাড়ীর চারদিকে পাঁচিল তুলতে হবে, তাই গ্রামের পর গ্রাম থেকে মজুর জোগাড় করে আনতে হবে।

লোকটি চলে যেতেই রাজামশাই তার এক অনুচরকে পাঠাল রাজার-রাজা-ভগবানের স্ত্রীর কাছে। সে গিয়ে বলল—বাড়ীতে যে ভেড়ার শিংটা আছে তাই যদি হাতছাড়া করতে রাজি হয় তো, রাজামশাই ওর বদলে তাকে দিয়ে দেবেন লাখ টাকার হীরা, আর দেবেন নানারকমের অলংকার, আরো দেবেন দামদামী মাথার বান্দানা…গা-ঢাকার পোশাক…। এতসব বাহারী বাহারী উপহার পাবার লোভে রাজার-রাজা-ভগবানের স্ত্রী নরম হয়ে গেল—সযত্নে রাখা ভেড়ার শিংটাই তুলে দিল রাজার অনুচরটির হাতে।

রাজামশাই শিংটা পেয়ে চেয়ে দেখে—ভিতরে ঠিকই রয়েছে আংটি দুটো। তবু একবার হাতে নিয়ে পরখ করেই রেখে দিল যথাস্থানে, এবং তার অনুচরদের আদেশ দিল—তারা যেন এক্ষুনি গিয়ে ঐ শিংটা ফেলে দেয় একটা গভীর সরোবরের ঠিক মাঝখানটায়। রাজার আদেশমতোই কাজ করল অনুচরেরা। আর তখনি, প্রকাণ্ড একটা মাছ ছুটে এসে গিলে ফেলল শিংটা।

তারপর রাজার-রাজা-ভগবান একদিন ফিরে আসছিল তার কাজ সেরে—সঙ্গে বহু লোকজন। আসতে আসতে পথে একদিন দেখে তার গাঁয়ের কয়েকজন বন্ধু যাচ্ছে মাছ ধরতে। ওদের সঙ্গে সেই পুকুরে গিয়ে সে মাছ ধরল বড় একটা। তারপর মাছটার আঁশ ছাড়িয়ে পেটটা কাটছে কি—ঠক্ করে ছুরিতে লেগে গেল শক্ত-কিছু একটা। পেটটা থেকে বেরিয়ে পড়ল সেই শিংটাই, শিংয়ের বাঁধা মুখটা খুলেই দেখে রাজামশাইর দেওয়া সেই আংটি দুটো! আর তাই দেখে আনন্দে বলে ওঠে সে—'হ্যাঁ, রাজার রাজা ভগবান!, সত্যি কথা।'

সেই সময়েই রাজার এক অনুচর এসেই রাজার-রাজা-ভগবানকে বলল—'রাজামশাই এক্ষুনি তলব করছেন—আংটি দুটো নিয়ে এক্ষুনি হাজির হতে হবে রাজসভায়।'

লোকটি তখন তার স্ত্রীর কাছে উপস্থিত হল—চাইল তার জিম্মায় রাখা সেই আংটি দুটো। কিন্তু তার স্ত্রী বলে উঠল—'সেই আংটি দুটো তো?

কোথায়ও আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না—বোধ হয় খেয়ে ফেলেছে ধেড়ে ইঁদুরে।'

এমন কথা শুনে লোকটি আর কোনো কথা বলল না, সোজা রওনা হল রাজ-দরবারে। রাজামশাই দরবারে এসে উপস্থিত হতেই সবাই একবাক্যে বলে উঠল—'দীর্ঘজীবী হোন, মহারাজ।' কিন্তু রাজার-রাজা-ভগবান শান্ত-স্বরেই বলল—'রাজার রাজা ভগবান!'

রাজামশাই সভাসদদের নীরব থাকতে বলল, ধীরে ধীরে নেমে এল সিংহাসন থেকে। লোকটির কাছে এগিয়ে এসে জানতে চায় কঠিন স্বরে—'তুমি বলছ, রাজার রাজা ভগবান?'

লোকটি দৃঢ় কণ্ঠেই জবাব দেয়—'হ্যাঁ, তাই।'

রাজামশাই অমনি ফেরৎ চাইল লোকটির কাছে গচ্ছিত-রাখা তার আংটি দুটো। আর, প্রহরীদল রাজার নির্দেশে অমনি লোকটিকে ঘিরে ধরল চারদিক থেকে—এক্ষুনি হত্যা করবে এমনি ভাবখানা। কিন্তু রাজার-রাজা-ভগবান অমনি তার জামার ভিতরে হাত ঢুকিয়ে বার করে আনল সেই শিংটা—তুলে দিল রাজার হাতে।

রাজামশাই শিংয়ের মুখটা খুলেই দেখে—ওই যে তার সেই আংটি দুটো! বিস্মিত রাজা অমনি সোল্লাসে বলে উঠল—'সত্যিকথা, রাজার রাজা হ'ল ভগবান।'

অভিভূত রাজামশাই, এবং এবারেই তার প্রথম চেতনা হল যে রাজা নয়—রাজার বড়ো সবার বড়ো হ'ল ভগবান। রাজামশাই এবার তার রাজপুরীকে ভাগ করল সমান দুই ভাগে—একভাগ দান করল রাজার-রাজা-ভগবানকে।

ঈশ্বর কেন পৃথিবী ছেড়ে গেলেন

সৃষ্টির প্রথম দিকে সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বর থাকতেন এই পৃথিবীতেই, আর সঙ্গে থাকত তাঁর বিশ্বস্ত ভৃত্য লেগ্‌বা। লেগ্‌বা চলত একমাত্র ঈশ্বরের কথামতোই—তাঁরি আদর্শ অনুসরণ ক'রে। ঈশ্বর কখনো কখনো লেগ্‌বার উপরে আদেশ জারি করতেন—এমন কি অন্যায় বা অনিষ্ট কিছু করতেও। আর, সবাই তখন দায়ী করত লেগ্‌বাকেই, এবং দিনে দিনে সবাই ঘৃণার চোখে দেখতে লাগল লেগ্‌বাকে। লেগ্‌বা যা-সব ভালো ভালো কাজ করত সেজন্যে কিন্তু লোকজন ধন্যবাদ জানাত কিনা ঈশ্বরকেই—লেগ্‌বাকে নয়।

দিনে দিনে এমন হল, লেগ্‌বার আর ভালো লাগে না তার উপরে ঈশ্বরের

যত অবিচার। একদিন সোজা সে ঈশ্বরের কাছে এসেই জানতে চায়—'অন্যায় কিছু হলে সবাই কেন আমাকেই দায়ী করে? আমি তো নিজের ইচ্ছেমতো কিছুই করি না—সবি করি তো ঈশ্বরেরই নির্দেশ মতো।'

ঈশ্বর বললেন—'দেখো লেগ্‌বা, সৃষ্টি-সাম্রাজ্যের যিনি বিধাতা তাকে সবসময়েই কৃতজ্ঞতা জানানো উচিত—যা-কিছু ভালো তার জন্যে, কিন্তু দোষের জন্য দায়ী তাঁর আজ্ঞাবাহক যারা তারাই।'

এখন, এই ঈশ্বর ঠাকুরের ছিল চমৎকার একটা বাগান—সেখানে বেড়ে উঠেছিল কী সুন্দর সুন্দর ফলের গাছ। লেগ্‌বা একদিন গিয়ে ঈশ্বর ঠাকুরকে জানাল—চোরেরা কিন্তু সব ফল লুটে নেবার জন্যে ষড়যন্ত্র করছে। ঈশ্বর তখন তার সব অনুচরদের ডেকে কড়া নির্দেশ জারি করলেন: যাকেই দেখবে চুরি করতে, সোজা মেরে ফেলবে।

তারপর একদিন রাত্রিবেলা লেগ্‌বা গুঁড়িসুড়ি ঢুকে গেল ঈশ্বরের ঘরে—চুরি করে নিল তার পায়ের জুতোজোড়া। এবারে সে তা নিজের পায়ে পরে নিয়েই নেমে পড়ল বাগানে—আর নিজেই কিনা নিয়ে গেল বাগানের সব ফলগুলো।

কিছু আগেই বৃষ্টি হয়ে গেছে, তাই জুতোর ছাপ পড়ে গেল স্পষ্ট। লেগ্‌বা এবার ভোর হতেই চুরির ব্যাপার নিয়ে সোরগোল তুলল—কার এত বড় সাহস, এমনটা সাফ করে ফেলেছে ঈশ্বরের বাগানটা! সকলেই বলাবলি করতে লাগল—জুতোর ছাপ থেকেই স্পষ্ট ধরা যাবে চোরটি কে?

সমস্ত লোকজনদের ডেকে এনে জড়ো করা হল, কিন্তু কারো পায়ের মাপের সঙ্গেই তো মিলছে না ঐ বাগানের ছাপগুলো—এক নয় বড়, নয়তো ছোট। লেগ্‌বা তখন বলল—'ঈশ্বর ঠাকুর নিজেই বোধ হয় ঘুমের মধ্যে উঠে গিয়ে সব ফলই খেয়ে নিয়েছেন।'

কিন্তু না, ঈশ্বর তো স্বীকার করছেন না—লেগ্‌বাকেই দায়ী করলেন তার নষ্টামির জন্যে। লেগ্‌বাও মচকাবার নয়, সে ঈশ্বরের জুতোর মাপ নিয়ে দেখিয়ে দিল—বাগানের ছাপগুলোর সঙ্গে একেবারেই একমাপ!

লোকজন চেঁচিয়ে উঠল—তাহলে তো ঈশ্বর ঠাকুর নিজেই নিজেরটা চুরি করে চোর সাজাতে চাইছেন কিনা অন্যকে। ঈশ্বর কিন্তু এতে খুবই রেগে উঠলেন—'আর নয়! তাঁরই সন্তান—তাঁরই বিশ্বস্ত অনুচর লেগ্‌বাই কিনা তাঁকে ফাঁদে ফেলে ঠকিয়েছে?'

—সঙ্গেসঙ্গেই ঈশ্বর চলে গেলেন এই দুনিয়া ছেড়ে, যাবার সময় লেগ্‌বাকে বলে গেলেন—'এখন থেকে তুমিই পৃথিবীতে থাকবে, আমি নয়। আর, প্রত্যেকদিন রাতে আকাশে উঠে গিয়ে আমার কাছে বলে আসবে—পৃথিবীতে কোথায় কি হচ্ছে।'

এশু ঃ আফ্রিকার নারদ

এশু! এশু হলেন মহাশক্তিধর ও মহাবুদ্ধিমান, এবং মহাচক্রান্তকারীও বটে। এশুর উপরে আসন পেতে পারেন একমাত্র ঈশ্বরই, এবং এশুও দায়ী থাকেন একমাত্র ঈশ্বরের কাছেই।

একদিন পবন-দেবতা খুবি বড়াই করছিল সে পদানত করতে পারে যে কোনো দেবতাকেই। এশু তাই শুনে এগিয়ে এসে বললেন—'যে কোনো দেবতাকে' বলতে কি তাঁকেও বোঝানো হচ্ছে? পবনদেব ঝঞ্ঝাদেব অমনি তার ত্রুটিটা সবিনয়ে স্বীকার করে মাফ চাইল—না, এশুর কথা সে বলছিল না।

আর একবার আর এক দেবতা কিনা এশুর অনুমতি না নিয়েই এক অনুচর নিয়োগ করেছিল। কিন্তু ঠিক পরের দিন ঘুম ভাঙতেই দেখা গেল কে যেন গলা টিপে মেরে ফেলেছে সেই অনুচরটিকে!

চক্রচক্রান্ত কি গৃহ-বিবাদ বাধাতেও এই এশু মহা ওস্তাদ। একবার একটা অদ্ভুত ঘটনাটা ঘটেছিল ঃ

একজন লোকের ছিল দুজন স্ত্রী, তবু তারা মিলেমিশে বেশ সুখেই ছিল। কিন্তু কলহ বিবাদ বাধাতে না পারলে সুস্থ বোধ করেন না এশু, খুশি থাকেন না। তিনি এক ফন্দী আঁটলেন ঃ এক বণিক সেজে দাঁড়িয়ে রইলেন বাজারের চৌমাথার মোড়টিতে—হাতে কী সুন্দর একটি ওড়না, যেমন রঙ্ তেমনি বুনানী। তা একবার দেখলে আর মন ফেরানো যায় না—যাই দাম লাগুক না কিনতেই হবে।

লোকটির বড়োবউ বাজারে এসে ওটা দেখতে পেয়েই কিনে আনল বাড়ীতে, স্বামীকে দেখাতে সে ভারী খুশি—সত্যিই সুন্দর জিনিসটা। কিন্তু ওই ওড়নাটা দেখেই তো ঈর্ষায় জ্বলে ওঠে ছোটোবউ, সেও বাজারে এসে দেখতে পেল—এক বণিকের হাতে আর একটা ওড়না, দেখতে আরো সুন্দর আরো মিহি। ওড়নাটা কিনেই মাথায় চড়িয়ে হাসতে হাসতে ঢুকল এসে বাড়ীতে। ছোটোবউকে ওই সাজে দেখে তো স্বামীটি আহলাদে ডগমগ—সোহাগে কাছে টেনে আনে ছোটোবউকে।

তাই দেখে বড়োবৌ বাজারে আসে তাড়াতাড়ি, দেখে সেই লোকটির হাতে আরো সুন্দর এবং আরো মিহি নতুন আর একটি ওড়না। বড়োবউও কিনে নিয়ে এল, হাসতে হাসতে বাড়ীতে ঢুকেই স্বামীর কাছে ঘনিয়ে আসে, আর স্বামীটির সোহাগও উথলে ওঠে।

এবং এইভাবেই চলতে লাগল দিনের পর দিন। দুই বউই টেক্কা মারতে চাইছে এ-ওর উপর, আর স্বামীকে রাখতে চাইছে একান্ত নিজেরি দখলে। দুই বউ এখন থেকে এ ওকে আর দুচোখে দেখতে পারে না—দেখলেই জ্বলে ওঠে তেলেবেগুনে।

আর, স্বামীর দরদ এখন দুলছে—একবার এদিক একবার ওদিক। দুই বউর কেউই ঠিক বুঝে উঠছে না স্বামীটি কার পক্ষে। তাই নানাভাবে সত্যিমিথ্যে জুড়ে চক্রচক্রান্ত চালাতে লাগল দুই বউই—এ ওর বিরুদ্ধে। এই দেখে মনে মনে মহাখুশি এশু, তাঁর পাতা ঈর্ষার বীজে ভালোই ফল ফলেছে। না, এখন আর তাঁকে দরকার হবে না। এশু তাই চলে গেলেন স্বর্গে।

বাজারে আর তো আসে না সেই বণিকটি—দুই বউই হতাশ হয় যেন। তবে, সুখের পরিবারটিতে সেই যে ভাঙ্গন ধরল, কিছুতেই আর জোড়া লাগল না।

দেবী আইসিস ঃ মিশরের সতী-মাতা

মিশরের মহারাজ গেব হলেন পিতা, মাতা নাট। ভাইবোন চারজন—বড়ভাই ওসিরিস, ছোটভাই শেট ; দুইবোনের বড়টি আইসিস, ছোটটি নেপ্থি। রাজবংশের নিয়মমতোই বড়বোন আইসিসের বিয়ে হয়েছে ওসিরিসের সঙ্গে, শেটের সঙ্গে ছোটবোন নেপ্থির। কিন্তু গণ্ডগোলটা বাধল রাজ্য ভাগাভাগি নিয়ে। পিতা গেব মিশরের উত্তর আর্ধেকটা দিলেন শেটকে, দক্ষিণভাগটা ওসিরিসকে। শেট তাতে রাজি নয়, সমস্ত রাজ্যটারই দখল চায় সে একা। এতে রেগে উঠলেন মহারাজ গেব, সমস্ত রাজ্যের উত্তরাধিকার থেকেই বঞ্চিত করলেন শেটকে। তাই গোটা মিশর দেশেরই রাজা হলেন ওসিরিস, রাণী হলেন আইসিস।

এই রাজারাণীর রাজত্ব ছিল সুখসম্পদের রাজত্ব—দেশটাও সুন্দর হয়ে উঠল শিল্পশ্রীতে। কৃষিকার্য ও শিল্পকর্মে এই রাজারাণীর ছিল আন্তরিক আগ্রহ। আর, রাজা ওসিরিস নিজেই ছিলেন এক মহাশিল্পী এবং এ ছাড়াও বহুগুণের অধিকারী। তিনি তাঁর রাজ্য মিশরের বন্য ধরণের সেই স্থূল ও হিংস্র জীবনধারাই পালটে দিলেন—রাজ্যের লোকজনকে করে তুললেন কৃষিকর্মী ও শিল্পানুরাগী। তিনি শেখালেন কেমন করে ক্ষেতে ক্ষেতে কৃষিকাজ করে ফসল ফলাতে হয়—আঙুরের বীজ থেকে জন্মাতে হয় আঙুরলতা,

কেমন করে মনাক্কা করতে হয় পাকা আঙুর থেকে। শুধু তাই নয়, কেমন করে পুজো করতে হয় তাও। আর এসব কাজে তাঁর সহকারী ছিলেন থথ্— তাঁরি প্রধানমন্ত্রী। এই সহকর্মী থথ্ নতুন নতুন শিল্পকলার উদ্ভাবন করতেন নতুন নতুন রূপে, এমনকি বিজ্ঞানেও অধিকার ছিল তাঁর। আর এই থথের সাহায্যে ও রাণীর উৎসাহে ওসিরিস মিশর দেশে গড়ে তুললেন এক নবসভ্যতা। ওসিরিস শাসন করতেন গায়ের জোরে নয়, মনের বলে—শক্তির প্রয়োগে নয়, সহানুভূতির গুণে। বুঝিয়ে সুঝিয়ে তিনি অনুকূলে আনতেন প্রতিকূলদেরও।

ওসিরিস এবার স্বদেশকে সভ্য করার পরে বিদেশে চললেন সভ্যতা প্রচারের কাজে। সঙ্গে নিয়ে চললেন বহুরকমের সঙ্গীতশিল্পীদের—বাদক ও গায়কদের, এবং তাঁর অনুচররূপে যোগ দিলেন এসে বহু দেবতাও। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের লোকদেরও তিনি শেখালেন কেমন করে সভ্যভাবে জীবন যাপন করতে হয়। ওসিরিস প্রাধান্য দিলেন কয়টি বিশেষ ধরণের কাজকে—কেমন করে ফলাতে হয় গম বার্লি আর আঙুর; কেমন করে তৈরী করতে হয় দালান কোঠা শহর, আর নীলনদের জলস্রোতকেই কীভাবে বাঁধ দিয়ে নিয়ন্ত্রণ করতে হয়; এবং কেমন করে জলসেচে উর্বর করে তুলতে হয় কৃষিক্ষেত্র।

বহুদিন হল ওসিরিস তাঁর সুযোগ্যা রাণী আইসিসের হাতে ছেড়ে দিয়ে এসেছেন রাজ্যভার। রাণীও স্বামীর বিদেশবাসকালে রাজ্যশাসন করতে লাগলেন শান্তিনীতি অনুসরণ ক'রে—জোরজবরদস্তি কখনোই নয়। রাজশক্তিকে তিনি রূপান্তরিত করলেন সহানুভূতিতে ও ভালোবাসায়—মন জয় করলেন সারা দেশের। আইসিস হলেন কেবল যোগ্যারাণীই নন, জননী প্রজাসন্তানের জননী— মাতৃরূপা মহাদেবী। বিশেষত কৃষিকার্যের উন্নতিতে তিনি ছিলেন বিশেষ পারদর্শিনী—তাই কৃষকজীবনে হলেন তিনি জননী-স্বরূপিণী অন্নপূর্ণা। এ ছাড়াও তিনি নিজেই এক আদর্শ গৃহিণী—নিজহাতেই করেন ঘরকন্নার কাজকর্ম। ঘরে ঘরে একের পর এক শেখালেন তিনি শস্যকে জাঁতায় ভেঙে গুঁড়ো করতে, তুলো দিয়ে সুতো কাটতে, তাঁতে কাপড় বুনতে। চিকিৎসা-বিদ্যাও জানতেন দেবীরানী আইসিস। মহামন্ত্রী ও তাঁর প্রেমিক থথের সাহায্যে আইসিস দেশে বিদেশে প্রচার করলেন সেই চিকিৎসা-বিদ্যা। আরো একটি আশ্চর্য বিদ্যা ছিল তাঁর দখলে—জানতেন যাদুবিদ্যা। আইসিস নিজেই ছিলেন এক মায়াবিনী বিদ্যাধরী।

তা, ওসিরিস যখন নানাদেশে সভ্যতা বিস্তারের কাজে বাইরে বিদেশে, শেট তখন হাজার রকম চেষ্টা চালাতে লাগল রানী আইসিসের সুশাসন বানচাল

করতে। কিন্তু সমস্ত চক্রান্তই ধরা পড়ল বুদ্ধিমতী আইসিসের কাছে—কোনোকিছুই তাঁর নজর এড়াল না। শুরুতেই তিনি টুটি টিপে ধরতেন সমস্ত দুষ্টচক্রের।

তারপর একদিন ফিরে এলেন ওসিরিস। আর শেটও মরীয়া হয়ে উঠল এক নতুন চক্রান্ত সফল করবার জন্যে। তার সঙ্গে জুটল এসে দুষ্ট বন্ধুদল—যত সব অশুভ চক্র। আর এই ব্যাপারে শেটের সঙ্গিনী হল তার স্ত্রী নয়, প্রতিবেশী রাজ্য ইউথোপিয়ার রাণী আসসো। শেটের স্ত্রী নেপথি কিন্তু তার দিদির পক্ষে—আইসিসের দলে। কারণ সে ছিল সুচরিতা, তাই দুষ্টচক্রের বিরুদ্ধে।

শেট তার গোপন চক্রান্তমতোই কিভাবে অগ্রসর হচ্ছিল—বাইরে থেকে কিন্তু বুঝবার উপায় ছিল না। দাদা ফিরে এলে সে খুবি আনন্দ প্রকাশ করল, তারপর বলল—এই বিশেষ দিনটির জন্যই সে তৈরি করে রেখেছে একটি মহামূল্য সিন্দুক, অলঙ্কৃত করে রেখেছে বহু ধনরত্নে। তা সিন্দুকও বটে, এবং ভিতরে এক শয্যাও বটে। এবং যে ঠিক ঠিক শুতে পারবে ওর ভিতরে গিয়ে, সিন্দুকটি হবে তারই প্রাপ্য। উৎসবের দিনে এ একটা প্রতিযোগিতা, এক মজাও বটে।

একে একে এগিয়ে এল অনেকেই, আসলে কিন্তু সকলেই তারা দুষ্টচক্রের লোক। কিন্তু কেউই ঠিক বাজি মতো ভিতরে ঢুকে শুতে পারল না—এমনকি সিন্দুকটার অত উঁচু গা বেয়ে উঠতেও পারল না, কিংবা ডালাটাই তুলতে না পারার ভান করল। আর তখন রাজা ওসিরিসকেই প্ররোচিত করা হতে লাগল—কেউ না পারলেও মহারাজ নিশ্চয়ই পারবেন। তারপর ওসিরিস সিন্দুকটার ডালা তুলেই একলাফে ভিতরে ঢুকে শুয়ে পড়লেন। শেটের সাঙ্গ-পাঙ্গরা অমনি বন্ধ করে ফেলল সিন্দুকের ডালাটা, পূর্বের ফন্দীমতোই ডালাটার চারপাশে বড় বড় পেরেক ঠুকে ঠুকে একেবারে আটকে ফেলল, তারপর টেনে নিয়ে ফেলে দিল নীলনদের জলে।

রাণী আইসিস কিন্তু ঘটনাটার বিন্দুবিসর্গও জানতেন না—ধারেকাছেও ছিলেন না তখন। এই নিদারুণ সংবাদ পেয়েই হাহাকার করতে লাগলেন পাগলিনীর মতো, কেটে ফেললেন তাঁর সুদীর্ঘ কেশজালের অর্ধেকটা, বিধবার বেশ পরলেন আগাছা দিয়ে তৈরী একখানি মাত্র কাপড়। চোখ মুছতে মুছতে ওসিরিসের প্রিয়তমা পত্নী আইসিস বেরিয়ে পড়লেন খালি পায়ে—ঘুরতে লাগলেন পথে পথে। তাঁর স্বামীর দেহটি উদ্ধার করতেই হবে—যেমন করেই হোক, যেখান থেকেই হোক না। পথে পথে যাকেই পান জানতে চান—কেউ কি একটা সিন্দুক ভেসে যেতে দেখেছে নীলের জলে?

তারপর, বহুদিন পের এক গাঁয়ে কয়েকটি বাচ্চাছেলের সঙ্গে দেখা হতে

তারা বলল—হ্যাঁ, তারা দেখেছে নীলনদেরই এক শাখানদী বেয়ে একটা সিন্দুক ভেসে যাচ্ছে সমুদ্রের দিকে। কিন্তু কোথায় আছে এখন সেই সিন্দুক ? মহাদেবী আইসিস বসে পড়লেন—ভাবতে লাগলেনঃ দেহ স্থির, চোখ নিমীলিত, নিঃশ্বাস রুদ্ধপ্রায়। যোগবলে দৈবীশক্তিতেই মহাদেবী আইসিস সঠিক জেনে নিতে চান সিন্দুকটি কোথায় আছে এখন। আর সহসাই তাঁর সামনে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল এক অদ্ভুত দৃশ্য ঃ

সমুদ্রস্রোতে সিন্দুকটা ভেসে ভেসে চলে যাচ্ছে ফিনিশিয়া দেশে। বাইব্লস নামের একস্থানে সিন্দুকটা ঢেউয়ে ঢেউয়ে বেলাভূমিতে উঠে পড়ে আটকে রয়েছে—অতিকায় একটা তেঁতুলগাছের গোড়ায়, আর সেই গাছটাই চারদিক থেকে ঘিরে রেখেছে সিন্দুটাকে।

বাইব্লস-এর রাজা ছিলেন মালাকা। একদিন তিনি ওই অতিকায় গাছটাকে দেখে তো মহাখুশি—গোড়াটা কেটে আনালেন তাঁর লোকজন দিয়ে, মিস্ত্রীদের দিয়ে বানিয়ে নিলেন সুন্দর একটি স্তম্ভ।

—আইসিস এই বৃত্তান্ত মনে মনে জানতে পেরেই দিনের পর দিন কত কষ্টে এসে পৌঁছলেন বাইব্লস রাজ্যে। তাঁর মনেপ্রাণে শুধু একটিমাত্র সংকল্প ঃ যে করেই হ'ক উদ্ধার করতে হবে স্বামীর দেহ। সেদেশের রানী সম্প্রতি প্রসব করেছেন এক রাজকুমার। আইসিস আত্মপরিচয় গোপন রেখে ভাব জমিয়ে নিলেন সেই রানীর সঙ্গে। কিন্তু রানীর কেমন বিস্ময় ঃ এমন স্বর্গীয় সুবাস কেন এই মেয়েটির গায়ে ! অবশ্য, বেমন সমীহভাব বজায় রেখেই তিনি আইসিসকে নিযুক্ত করলেন নবজাত শিশুর ধাত্রীরূপে। দেবী আইসিস এবার শিশুটির উপরে প্রয়োগ করতে শুরু করলেন তাঁর দৈবীশক্তি—শিশুটিকে দান করবেন অমরত্ব। শিশুটিকে তিনি চুষতে দিতেন কেবলমাত্র তাঁর একটি আঙুল, আর গভীর রাতে জ্বালতেন এক পুণ্যশিখা, এবং তা শিশুটির দেহের উপর ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দূর করে দিতেন যত আলাই বালাই—মরণশীল যা-কিছু। রাজকুমারের মায়ের কেমন ভয় ভয়, কেমন এক সন্দেহ—ওই দেবীর মত ধাত্রীটি আসলে কে ? তারপর একদিন হয়েছে কি, সবার অলক্ষ্যে রানী এসে দেখে ধাত্রী তো নেই কোথাও। আশ্চর্য এক চাতক কিনা অবিরাম চক্রাকারে ঘুরছে স্তম্ভটাকে ঘিরে ঘিরে, আর কাঁদছে কী করুণ ! রানী এই দেখে ভয়ে হঠাৎ আর্তনাদ করে উঠলেন, এবং সেই শব্দে ভেঙ্গে গেল মরণজয়ী যাদুবিদ্যার সম্মোহ—ভেঙ্গে গেল রাজকুমারের মৃত্যুঞ্জয়ী হবার সুযোগ।

তারপর আইসিসকে হঠাৎ সামনেই দেখতে পেয়ে ভয়ে বিস্ময়ে থমকে দাঁড়ালেন রানী। এবং আইসিসও প্রকাশ করলেন তিনি কে, এবং কি জন্যে এসেছেন এই দূর দেশে। রাজা সব শুনে আইসিসকে দিয়ে দিলেন সেই স্তম্ভটা। আইসিস

নিজেই স্তম্ভটা কেটে কেটে সাবধানে বার করে আনলেন সিন্দুকটা, আর ডালাটা ঠুকে ঠুকে খুলে ফেলেই তাঁর সে কী বুকফাটা তীক্ষ্ণ চিৎকার! এবং সেই শব্দাঘাতেই মারা গেল রাজকুমার। রাজা দুঃখ পেলেও ভেঙ্গে পড়লেন না বা সুবুদ্ধি হারালেন না—তাঁর যথাকর্তব্য তিনি করলেন। দেবী আইসিসকে ও তাঁর সিন্দুকটাকে তুলে দিলেন জাহাজে—স্বদেশে ফিরে যাবার জন্যে, এবং সঙ্গীরূপে দিলেন বড় রাজকুমারকে—তাঁর বড় ছেলেটিকে। তারপর জাহাজটা কিছুদূর যেতেই আইসিস তাঁর স্বামীকে দেখবার জন্যে ডালাটা খুলেই এমন এক ভয়ঙ্কর আর্তনাদ ছাড়লেন যে বড় রাজকুমার সভয়ে এগিয়ে গেল আইসিসকে সান্ত্বনা দিতে। কিন্তু শোকে উন্মাদিনী আইসিস হঠাৎ কেমন অন্ধক্রোধে ঝাঁপিয়ে পড়লেন রাজকুমারের উপর, আর রাজকুমারও সভয়ে পিছিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ অচেতন হয়ে পড়ে গেল সমুদ্রের মধ্যে—আর উঠল না।

মৃত স্বামীকে অপলক দেখতে দেখতে এগিয়ে চলেছেন আইসিস। দিন যায় রাত্রি যায়, মাসের পর মাস। একদিন হঠাৎ আইসিস অনুভব করেন তাঁর দেহে এসেছে ওসিরিসের সন্তান! মৃত স্বামীকে আলিঙ্গন করে তাঁর মধ্যেই যোগবলে সঞ্চারিত করলেন জীবন, কিংবা অতিকায় এক চিলের বেশ ধরে মায়াবিনী আইসিসই মৃত স্বামীকে জড়িয়ে ধরেছেন দুই ডানা গুটিয়ে,—সে যে ভাবেই হ'ক যাদুবিদ্যাবলেই সন্তান-সম্ভবা হলেন দেবী আইসিস।

তারপর একদিন মিশরে এসে পৌঁছতেই সতর্ক হলেন আইসিস। এখন তাঁকে দুটো দিকে দৃষ্টি রাখতে হবে—নিরাপদে রাখতে হবে স্বামীর মৃতদেহকে, আর গোপন রাখতে হবে তাঁর সন্তান-সম্ভাবনার ব্যাপারটা। তাই বুটো অঞ্চলের এক জলা-জঙ্গলের মধ্যে লুকিয়ে রাখলেন ওসিরিসের দেহটিকে। কিন্তু সন্ধানী শেটের নজর এড়ানো অত সহজ নয়। শেট এক জ্যোৎস্না রাতে জলায় শিকার করতে গিয়ে হঠাৎ দেখতে পেল সেই সিন্দুকটি, ওসিরিসের মৃতদেহ টেনে বার করে অমনি সে খণ্ডে খণ্ডে চৌদ্দখণ্ড করে ফেলল—তারপর ছড়িয়ে ফেলল দিগ্বিদিকে।

আইসিস নীরব ধৈর্যে আর অদম্য ভালোবাসায় দিনের পর দিন খুঁজতে খুঁজতে একত্রিত করলেন স্বামীর দেহখণ্ডগুলি—একের পর এক জুড়ে গেঁথে নিলেন। মহাবুদ্ধিমতী আইসিস বুঝেসুঝেই আর একটা কাজ করলেন—যেখানে যেখানে দেহখণ্ডগুলি পেয়েছেন সেখানে সেখানেই তৈরী করে রাখলেন এক একটি সমাধি-বেদী। এটা করলেন ধূর্ত শেটের চোখেই ধুলো দেবার জন্যে—সে যাতে ভাবে দেহখণ্ডগুলি দাহ করা হয়েছে। কিন্তু ওসিরিসের সব অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলির সন্ধান পেলেও এক অখণ্ড দেহ জুড়তে বাকী ছিল কেবলমাত্র যৌন-অঙ্গটি। তা, ব্যাপার হল, শেট ওটা ফেলে দিয়েছিল নীলনদের জলে,

আর তা খেয়ে ফেলেছিল এক কাঁকড়ায়। সেজন্যেই আজো নীলের কাঁকড়া হল মিশরের এক অভিশপ্ত জীব। মহাগুণী আইসিস হার মানবার নন, তিনি নিজহাতেই তৈরী করে নিলেন ওসিরিসের যৌনাঙ্গটি, স্থাপন করলেন তাঁর দেহে। এবারে এই দেহবিদ্যা-চিকিৎসাবিদ্যায় মহা পারদর্শিনী দেবী আইসিস স্বামীর পূর্ণাঙ্গ দেহটির গায়ে লেপন করলেন বহুমূল্য ভেষজ-তেল, জড়িয়ে দিলেন ভেষজ-তেলে ভিজানো বস্ত্র। এইভাবেই সঞ্জীবন-গুণে তিনি সুসম্পন্ন করলেন অমর জীবনের অভিষেক-ব্যবস্থা। মিশরে সেই থেকেই এই ধ্যানধারণা গড়ে উঠল যে মৃতদেহকে বিশেষ ধরণে সংরক্ষিত করলে তা হয়ে ওঠে মৃত্যুঞ্জয়ী—মৃতদেহই লাভ করে মৃত্যুঞ্জয়ী আত্মার সুনিশ্চিত আশ্রয়। এই কাজে আইসিসকে সাহায্য করেছিল তাঁরি বোন নেপ্‌থি আর মহামন্ত্রী থথ্।

স্বামীর দেহ সংরক্ষিত করার ব্যবস্থাটা সম্পূর্ণ করে আইসিস যখন খুবি সন্তুষ্ট, তখন একদিন শেট তাঁকেই সজোরে টেনে নিয়ে ফেলে রাখল বন্দীশালায়। বিশেষ করে সে ক্রুদ্ধ হয়েছিল ওসিরিসের দেহখণ্ডগুলিকে সসম্মানে ও বিধিমতো সমাধিস্থ করার জন্যেই। কিন্তু সে এটা জানতে পারল না যে ওসিরিসের দেহকে অখণ্ড অবস্থায় সংরক্ষিত করে বিধিমতোই পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে পরলোকে। শেট আর একটা গুরুতর সংবাদও জানত না যে আইসিসের গর্ভেই বড় হচ্ছে ওসিরিসের সন্তান—রাজ্যের ভাবী অধীশ্বর।

তারপর রাজ্যের মহামন্ত্রী থথের—মহারানী আইসিসের প্রণয়ী থথের সাহায্যেই আইসিস একদিন পালিয়ে গেলেন কারাগার থেকে।

এবারেও বুটোর জলাজঙ্গলে এসে আশ্রয় নিলেন আইসিস, সঙ্গে তার রক্ষক হিসাবে সাতটি অনুগত নাগ—সাতটি সর্পদেবতা। আর এখানেই সাতটি সাপের প্রহরায় জন্ম নিল আইসিসের পুত্র-সন্তান হোরাস। আহা, আইসিসের সেদিন কি আনন্দ—শেষ পর্যন্ত তিনি জন্ম দিতে পেরেছেন ওরিসিসের বংশধরকে। এবং এরপর তো নায্য অধিকারেই লাভ করবে সে পিতার সিংহাসন।

কিন্তু আইসিস ও তাঁর নবজাত ছেলে বাঁচবে কী ক'রে—কী খাবে? আইসিস তাই এখন ভিক্ষেয় বেরোন। একবার যখন তিনি সারাটা দিন বাইরে, শিশু হোরাসকে লুকিয়ে রেখে গেছেন হোগলা বনে, ফিরে এসে দেখেন—এ কি সর্বনাশ! কুঁকড়ে পড়ে আছে তাঁর প্রাণের শিশু—মৃতপ্রায়!

ব্যাপার কি, শেট যখন নিজদেহে কিছুতেই প্রবেশ করতে পারছে না ওই যোগিনী আইসিসের যাদুমন্ত্র-ঘেরা হোগলা বনে, তখন সে এক ভয়ংকর সাপের বেশ ধরেই দংশন করে গেছে শিশু হোরাসকে। ফিরে এসেই হোরাসের ওই দশা দেখে আইসিসের সেকি কান্না! হায় হায়, একি হ'ল! স্বামী কাছে

সেই, বুকের শিশু—সেও চলে গেল! মা বেঁচে নেই—তাঁর দাদা তাঁর স্বামী সেও নেই—কেউই বেঁচে নেই। আছে কেবল তাঁর দুর্দম শত্রু ছোট-ভাই শেট! আইসিস আর্তকণ্ঠে ডাকতে লাগলেন সবার উপরের যে দেবতা তাঁকেই, সাহায্য করবার জন্যে করুণ আবেদন জানাতে লাগলেন সমস্ত জগতের কাছে। তাঁর ঐ আহ্বান শুনে একে একে এসে জড়ো হতে লাগল জলাজঙ্গলের অধিবাসীরা—সকল জেলেছেলেরা। সকলেই ব্যাকুলভাবে সাহায্য করতে চায় এই সতী নারীকে—এই মাকে, কিন্তু কেউই তো জানে না কী করে বাঁচাতে হবে শিশু হোরাসকে—কী করে বাঁচাবে তারা সন্তানপ্রাণা মাকে। একটি-মাত্রই নাকি যাদুবিদ্যা আছে সাপে-কাটাকে বাঁচাবার, কিন্তু তারা তো জানে না সেটা কী?

আইসিস স্থিরভাবেই বুঝে নিলেন—যত নষ্টের গোড়ায় হল শেট। কিন্তু চোখের সামনেই যে মৃত শিশুর ছোট্ট দেহটি ফুলে উঠেছে বিষক্রিয়ায়! আর আইসিস তাই দেখতে দেখতে কঠিন হয়ে উঠছেন এক ভাব-ভাবনায়ঃ তবে কি পাপের আর শয়তানের শক্তিই বড় হয়ে উঠবে—জয়ী হবে পুণ্যের উপরে, স্থান নেবে পবিত্রতারও উপরে? এবং মৃত্যু হবে নিরীহ নিরপরাধ শিশুর? না, না। তা হতে দেবেন না দেবী আইসিস।

আইসিস আর্ত আবেদন জানালেন দেবতাদের সর্বোচ্চ শক্তির কাছে—সাহায্য চাইলেন তাঁর। মহাকালের মন্দিরে পেঁছিল গিয়ে সতীমাতার আকুল আহ্বান। মহাকাল-স্রোতে তখন ভেসে চলছিল থথের নৌকো, নৌকো থেকে নেমে এসে থথ্ কথা বললেন আইসিসের সঙ্গে, বিস্ময় প্রকাশ করলেন—আইসিস নিজেই তো মহাশক্তি মহাদেবী, তিনি তাঁর যাদুশক্তি দিয়েও ছেলেকে রোগমুক্ত করতে পারলেন না? হ্যাঁ ঠিক আছে, থথ্ আশ্বাস দিয়ে গেলেন—এ ব্যাপারে দেবাদিদেব সূর্যদেব 'রা' যাতে সাহায্য করেন তার ব্যবস্থা করছেন।

অমনি 'রা'-এর বাহন সূর্যতরণী চলতে চলতে থেমে গেল হঠাৎ—নিভে গেল আলো, অন্ধকারে ঢেকে গেল চতুর্দিক। থথ্ বলে উঠলেন আদেশের মতোই—'হোরাস রোগমুক্ত না হলে চিরকালই থেকে যাবে এই অন্ধকার!'

আইসিস সবি দেখছেন, কিন্তু বুঝে উঠছেন না—শেষ পর্যন্ত থথ্ কি সফল হতে পারবে? তবু থথ্ ও আইসিস দুজনেই তো জানেন—হোরাস বিষমুক্ত না হওয়ার অর্থ তো স্তব্ধ হয়ে যাওয়া রা-য়ের ধর্মরাজত্ব, স্তব্ধ হয়ে যাওয়া দেবতার শাসন! আর, তখন তো থেমে যাবে সৃষ্টি, থেমে যাবে জীবন, ধ্বংস হয়ে যাবে যা-কিছু সৎ। আর সেখানেই কিনা রাজত্ব করবে দুর্নীতি ও দুর্গতি! বিজয়ী হবে শেট, কায়েম হবে তার রাজত্ব? না, না, এর আগেই যেন আইসিস মরে যান।

থথ্ তখন উচ্চকণ্ঠেই গ্রহণ করলেন এক ভীষণ প্রতিজ্ঞা : হোরাস যদি বেঁচে না ওঠে তো মধ্য-আকাশে থেমে যাক সূর্যতরণী, জলেপুড়ে খাক হয়ে যাক খাদ্যশস্য, মরে যাক গাছপালা শাকশব্জী, বন্ধ হয়ে যাক মন্দিরের দরজা, ভেঙ্গে পড়ুক গম্বুজ, হাহাকারে পরিপূর্ণ হক সারাটা পৃথিবী, শুকিয়ে যাক কুয়ো কি পুকুর, সবকিছু ডুবে যাক গাঢ় গভীর অন্ধকারে···

—এই বলেই থথ্ হোরাসের শিশুদেহটি থেকে ঝেড়ে ফেললেন সমস্ত বিষ। সূর্যদেবতা রা-য়ের মহাশক্তিই যাদুবলে আকর্ষণ করে আনলেন থথ্—হার মানল বিষের শক্তি, দুর্নীতির যত কেরামতি। আনন্দে কলরব করে উঠল জলাজঙ্গলের সেই জেলেরা। থথ্ এবারে সেইসব জেলেদের ডেকে বললেন—'তোমাদের হাতেই তুলে দিলাম এই শিশু হোরাসের ভার, তোমরাই এই শিশুকে প্রতিষ্ঠিত করবে মর্তজীবনে। আর, রা ও ওসিরিস দুজনেই উর্ধ্বলোক থেকে সুদৃষ্টি রাখবে এই শিশুর উপরে। আর, দেবীমাতা আইসিস প্রচার করবে তাঁর পুত্র হোরাসের শক্তিলীলা, হোরাসকে করে তুলবে সকলেরি শ্রদ্ধার ও সমাদরের পাত্র।'

ঝাকড়মাকড় ও একথলে গম

ঝাকড়মাকড় হল সমস্ত প্রাণীদের মধ্যেই সবচেয়ে চালাক চতুর—এমনকি হয়েছে সে ভগবানেরই প্রধানমন্ত্রী। একদিন ঐ ঝাকড়মাকড় কিনা ভগবানের কাছেই বাহাদুরী দেখিয়ে বলে—'দিন না আমাকে মাত্র ছোট্ট একথলে গম, আমি তার বদলেই আপনাকে দিয়ে দেব একশ অনুচর!'

ভগবান তাই শুনে হাসলেন, কিন্তু ও যা চায় দিয়ে দিলেন। প্রধানমন্ত্রী ঝাকড়মাকড় অমনি নেমে এল মর্তে, একগাঁয়ে এসে চাইল রাতটা কাটাবার মতো একটুখানি জায়গা। শোবার আগে গ্রামের মোড়লকে বলল—'এই থলেটা রাখতে হবে এক নিরাপদ জায়গায়। এটা কিন্তু ভগবানের জিনিস, কিছুতেই যেন খোয়া না যায়।'

গ্রামের মোড়ল তখন দেখিয়ে দিল তার বাড়ীর সবচেয়ে নিরাপদ একটা জায়গা—মাচাংয়ের উপরে। তারপর শুতে গেল সবাই। কিন্তু রাত দুপুরে উঠে পড়ল ঝাকড়মাকড়—দানাগুলি ছড়িয়ে ছড়িয়ে সবটাই খেতে দিল বাড়ীর মোরগ-মুরগীদের। সকালবেলায় ঘুম থেকে উঠেই বাড়ীর কর্তার কাছে চাইল সে দানাভর্তি থলেটা। কিন্তু দানা তো নাই-ই, থলেটাও উধাও। তখন সে এমন একখানা সোরগোল তুলল যে বাড়ীর কর্তা সেই গ্রাম-প্রধান তাড়াতাড়ি তার হাতে মস্তো এক বস্তা গম তুলে দিয়ে তবেই শান্ত করে।

ঝাকড়মাকড় মস্তো সেই গমের বস্তা নিয়ে চলতে শুরু করল, চলতে চলতে বিশ্রাম নেবার জন্যে পথের পাশে বসে পড়ল একবার। বস্তাটা যা ভারী, আর তো বয়ে নেওয়া যাচ্ছে না।

ঐ পথ ধরেই আসছিল একটা লোক, হাতে একটা মুরগীর বাচ্চা। ঝাকড়-মাকড় লোকটার কাছে নিজেই এগিয়ে গিয়ে বলে—'আমাকে ওই মুরগীটা দেবে, ভাই? ওর বদলে আমি তোমাকে দিয়ে দেব আমার এই গমভরা বস্তাটা।'

বলাই বাহুল্য, লোকটি সানন্দেই রাজি হয়ে গেল। ঝাকড়মাকড়ও খুশি-মনে এগিয়ে এল সামনের এক গাঁয়ে, মোড়লের বাড়িতে গিয়ে উঠল—রাতে থাকবার মতো একটু আশ্রয় চায়, তবে কিনা তার ওই মুরগীর বাচ্চাটাকে

রাখতে হবে খুব সাবধানে। ওটা ভগবানের জিনিষ—ভগবানই দিয়েছে তাকে।

মুরগীঘরের মাচাতে মুরগীটাকে রাখা হল সযত্নে, তারপর শুতে গেল সবাই। বাড়ীর সবাই ঘুমে বিভোর, চারদিক নিস্তব্ধ। ঝাকড়মাকড় করল কি নিঃশব্দে উঠে প'ড়ল, মুরগীটাকে ক্যাঁক ক'রে ধ'রে গলাটা ছিঁড়ে ফেলল—রক্ত ছড়িয়ে দিল মোড়লের ঘরের দরজায়, বাইরে বারান্দার মেঝেতে। ছড়িয়ে রাখল পালকগুলি। ভোর হতেই ঝাকড়মাকড় শুরু করল সে কী কান্না, সে কী আর্তনাদ—হায় হায় আমার এখন কী হবে! ভগবানের জিনিষ এমনভাবে মারা পড়ল। এরপর তো তাকে কঠিন শাস্তি পেতে হবে ভগবানের হাতে, ভগবানের দরবারে তার যা চাকুরী সেটাও তো খোয়াতে হবে!

সবাই তো খোঁজ খোঁজ—কোথায় গেল মুরগীটা, মুরগীঘরের মাচায় তো নেই! ঝাকড়মাকড় দেখিয়ে দিয়েই হাউহাউ করে কেঁদে ওঠে—'ঐ তো, ঐ যে বাড়ীর কর্তার দরজায়ই ওটার রক্ত, পালকগুলিও ছড়ানো রয়েছে বাইরে।'

সবাই দেখে সত্যিই তো। কিন্তু ব্যাপারটা চাপা দেবার জন্যে বাড়ীর কর্তা সেই মোড়ল আর সব লোকজন বুঝিয়ে-সুঝিয়ে শান্ত করে ঝাকড়-মাকড়কে—তার হাতে তুলে দেয় দশটা ভেড়া।

ঝাকড়মাকড় এবার ভেড়াগুলো নিয়ে চলতে চলতে বসে পড়ে পথের পাশে—ভেড়াগুলো চরতে থাকে মাঠে। আর খানিকটা পরেই ওই পথ দিয়ে আসতে থাকে কয়েকজন লোক—সঙ্গে বয়ে নিয়ে চলেছে একটা মড়া। ঝাকড়-মাকড় জিজ্ঞেস করে—'কোথায় যাচ্ছ তোমরা?'

ওদের মধ্যে একজন বলল—'এই শবটা এক যুবকের, বাড়ী থেকে দূর-বিদেশে কাজ করত। কাজ করতে করতে মারা গেছে। আমরা এখন শবটা নিয়ে তার বাড়ীর দিকেই যাচ্ছি।'

ঝাকড়মাকড় অমনি বলে উঠল—সেই গাঁয়ের দিকেই তো যাচ্ছে সে, মড়াটা সে নিজেই বয়ে নিয়ে যাবে। আর এ জন্যই ওরা বরং নিয়ে যাক তার দশটা ভেড়া। মাঠের মধ্যে পথের কাছেই ভেড়া কয়টাকে দেখিয়ে দেয়। লোকগুলো তো মহাখুশি, মড়া কাঁধে বয়ে যেতে হত আরো কতদূর, তা করতে হল না—উল্টো আরো বখশিশ পাওয়া গেল দশ-দশটা জ্যান্ত ভেড়া।

ঝাকড়মাকড় মড়াটা নিয়ে হাজির হল কাছেই এক গ্রামে, গ্রাম-প্রধানকে বলল—একটা রাত সে তার আস্তানায় থাকতে চায়, তার সঙ্গেই রয়েছে ভগবান-পুত্তুর। এখন সে ঘুমে এমন বিভোর যে একেবারে অচেতনপ্রায়। ওর জন্যে চাই আলাদা একটা কুঁড়ে।

মোড়ল তখন তার সবসেরা কুটিরটিই ছেড়ে দিল ভগবান-পুত্তুরের জন্যে। তারপর, অনেক রাত ধরে চলল খুব নাচগান। তারপর শুতে গেল সবাই।

সকাল হতেই ঝাকড়মাকড় ঐ গ্রাম-প্রধানের ছেলেদের বলল ভগবান-পুত্তুরকে ঘুম থেকে জাগাতে, বুঝিয়ে বলল—'ওর ঘুম হল একেবারে মড়ার ঘুম, বুঝলে? ওকে প্রথমটায় খুব জোর ঝাঁকুনি মারতে হবে হাত-পায়ে, এমনকি দুএক ঘা লাগাতেও কসুর করবে না। ঘুমোলে আর জাগতেই চায় না—মড়ার মতো ঘুমোচ্ছে তো ঘুমোচ্ছেই।'

কিন্তু ছেলেরা কিছুতেই ওর ঘুম ভাঙাতে না পেরে জানাল এসে ঝাকড়-মাকড়কে। ঝাকড়মাকড় বলল—'এবার ওকে আচ্ছা করে মার লাগাও।' ছেলেরা তাই করল, কিন্তু তবুও তো জাগে না ভগবান-পুত্তুর।

ঝাকড়মাকড় এবার মড়াটার গায়ে জড়ানো চাদরটা ওদের সামনেই একটানে খুলে ফেলে চিৎকার করে উঠল—'মরে গেছে। ছেলেটাকে মেরে ফেলেছে!' পাগলের মতোই ঝাকড়মাকড় তখন ছুটোছুটি করছে আর বলছে—'মোড়লের ছেলেরাই পিটিয়ে পিটিয়ে খুন করেছে ভগবানের ছেলেকে। ওঃ ভগবান, ওঃ!'

সমস্ত লোকজন জড়ো হল এসে, সবাই শুনতে পেল—ভগবানের ছেলেকে মেরে ফেলেছে গ্রাম-প্রধানের ছেলেরাই। কিন্তু ভগবানের ক্রোধ থেকে এবার তো কেউই রক্ষা পাবে না—গ্রামের একটি লোকও নয়।

সবাই মিলে তখন সসম্মানে কবর দিল সেই ভগবান-পুত্তুরকে। তারপর সবাই ফিরে এলে ঝাকড়মাকড় বেশ যেন ভেবেচিন্তেই বলল—সে ভাবছিল ঘটনা যা হয়ে গেছে তো গেছেই, ভগবান-পুত্তুরকে আর তো ফিরে পাওয়া যাবে না। কিন্তু এখনো সে ভগবানের অভিশাপ থেকে এই গ্রামকে রক্ষা করতে পারে, তবে এজন্যে তার সঙ্গেই ভগবানের কাছে পাঠিয়ে দিতে হবে কমপক্ষে একশ অনুচর। সবাইকে ভগবানের দাস হিসেবে পেলে ভগবান তখন আর শাস্তি দেবেন না। আর একটা কথা, এটাই সাক্ষ্য-প্রমাণ থাকবে যে ছেলেটির মৃত্যুর জন্যে দায়ী হ'ল গ্রাম-প্রধানই, ঝাকড়মাকড় নয়।

গ্রাম-প্রধান ও তার লোকজন এই ব্যবস্থায় সানন্দেই সম্মত হল। আর, ঝাকড়মাকড়ও সোল্লাসে রওনা হল ভগবানের শত ভৃত্য সঙ্গে নিয়ে—পৌঁছল গিয়ে ভগবানপুরী স্বর্গে। ভগবানের কাছে বিবৃত করল সে সবটা কাহিনী—কী করে একথলে গম থেকেই শেষ পর্যন্ত সংগ্রহ করেছে শত অনুচর, ঠিক যেমনটা সে বলে গিয়েছিল ভগবানকে।

ভগবান সবটা শুনে খুশিই হলেন—খুশি হলেন ঝাকড়মাকড়ের বুদ্ধির দৌড় দেখে, এবং ঝাকড়মাকড়কেই তিনি দিয়ে দিলেন প্রধান সেনাপতির পদ।

লোভীর শাস্তি

একদিন এক মাকড়ঝাকড় তার বৌকে বলল—'মিঠেআলুর ঝুড়িটা বার করে দাও তো। আমি জমি চষে ওগুলো ছড়িয়ে দিচ্ছি।'

তার বৌ অমনি ঝেড়েঝুড়ে অনেকটা মিঠেআলু ঢেলে দিল ঝুড়িতে। আর মাকড়ঝাকড় তাই মাথায় আর হাতে একটা কোদাল চলে গেল মাঠে। তারপর সে তাকিয়ে দেখে মাঠভরা কী রোদ্দুর—ঝাঁ ঝাঁ করছে চারদিক। লোকটা ছিল একটু আলসে প্রকৃতির—নিজের হাতে কাজ করতে না হলেই খুশি হয়। এই চড়া দুপুরের কড়া রোদ্দুরে কাজ করতে তার মোটেই মর্জি হল না। সে করল কি, মাঠের পাশে একটা গাছের ছায়ায় বসে পড়ল। কাছেই ছিল একটা ঝর্ণা, সেখানে গিয়ে আঁজলা পুরে জল খেল খানিকটা, তারপর ছায়ায় ফিরে এসে খেতে লাগল একটার পর একটা মিঠেআলু। খেতে খেতে ঝিমুনি এলে শুয়ে পড়ল মাকড়ঝাকড়—ঘুমিয়ে পড়ল।

জেগে উঠে সে দেখে, কখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে। সে তখন করল কি, ঝর্ণার পাশটা থেকে কিছু কাদামাটি তুলে তুলে লেপটে দিল সারাটা গায়ে, এবং সেই অবস্থায়ই বাড়ী ফিরে এসে বৌকে বলল—'এই দেখো, মাঠ চষতে গিয়ে জল-কাদা নোংরা লেগেছে সারাটা গায়ে, এখন চান করতে হবে।'

পরের দিনও ঠিক ঐ ঘটনা। মাকড়ঝাকড় আর একঝুড়ি মিঠেআলু ও কোদাল নিয়ে মাঠে গেল, আর মনের সুখে গাছের ছায়ায় বসে বসে মিঠে আলু খেতে লাগল। এমনি চলল কয়েক দিন ধরেই।

এরপর একদিন এল ফসল তোলার মরসুম। বৌ বলল—সব্বাই যে যার ফসল ঘরে তুলছে। এবার সে নিজে গিয়েই কি মিঠেআলু তুলে নিয়ে আসবে?

কিন্তু মাকড়ঝাকড় রেগে ওঠে—'তোমাকে কাজ দেখাতে হবে না। যে এত কষ্ট করে বীজ পুঁততে পেরেছে ফসলও তুলতে পারবে সে-ই।'

বৌ বলে—'আচ্ছা বেশ, তাই হবে। ফসলটা নষ্ট হবার আগে ঘরে এলেই হয়।'

মাকড়ঝাকড় এবারে করল কি, রাতের অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে ঝুড়ি-ভর্তি ফসল তুলতে লাগল অন্যের জমি খুঁড়ে খুঁড়ে। 'কাঁচা পাকা সবটাই কিনা এমন বেহিসেবী তোলা—কে তুলে নিয়েছে এমন করে?'—প্রতি-বেশী জমির মালিকদের কেমন সন্দেহ হয়। নিশ্চয়ই কোনো অসৎ লোকের

কাজ। নজর রাখতে রাখতে তাদের কাছে স্পষ্ট ধরা পড়ল এ কার কাজ। ঠিকই বোঝা গেল, কখন যে সে তার চোরাকারবার করে যায় এবং কোন্ ফাঁকেই বা তাকে ধরা যায়।

মাকড়ঝাকড়কে হাতেনাতে ধরবার জন্যে ওরা সবাই মিলে চমৎকার এক ফন্দী আঁটল: রবার গাছের ঘন আর কড়া আঠা দিয়ে তৈরী করল একটা রবারের মেয়ে—দেখতে হল খুবি সুন্দরী। তা, অমাবস্যার ঘনকালো রাতে ওরা ঐ রবারের মেয়েটিকে দাঁড় করিয়ে রাখল ওদেরই ক্ষেতের পাশে। তারপর মাকড়-ঝাকড় রাতবিরেতে চুপিসারে এসে দেখে তো অবাক। বাঃ, কী সুন্দর একটা মেয়ে রাত দুপুরে দাঁড়িয়ে আছে কিনা তারি প্রতীক্ষায় একা! আহ্লাদে এগিয়ে আসে মাকড়ঝাকড়: বাঃ কী লম্বা গলাটি, আর কী উঁচু বুক! এবার আরো ঘনিয়ে এসেই একখানা হাত রাখল মেয়েটির বুকের উপর—কিন্তু আর তো সরাতে পারে না হাতখানা। এঁটে গেছে, সেঁটে ধরেছে। আর, ঐ সুন্দরী কিনা চেয়ে চেয়ে হাসছে?

'ও, তুমি বুঝি আমাকে ছাড়তে চাও না।'—এই বলেই সে আর হাত-খানাও রাখল অন্য বুকের উপর! ওই হাতটাও সেঁটে ধরল জোর। একটা হাতও তো ছাড়াতে পারছে না—কী মুশকিল। রেগে ওঠে মাকড়ঝাকড়—'ও, পুরুষ পেলেই বুঝি আটকে ধরো। বদ মেয়ে, দেখাচ্ছি তোমাকে।'—এই বলেই সে জোর এক লাথি মারল রবার-কন্যার গায়ে। আর, লাথি মারতেই কিনা রবার-কন্যা এঁটে ধরে রাখল পাটাকে, পাটা যেন পেরেক-গাঁথা হয়ে গেল! তখনো কিনা নির্লজ্জের মতো হাসছে তো হাসছেই বদমেয়েটা? 'মজা পেয়েছ—মজা?' রাগে ফুলে ওঠে মাকড়ঝাকড়, চেঁচিয়ে ওঠে—'বজ্জাতের বেটি বজ্জাত, শয়তানী।'—বলতে বলতেই এক লাথি অন্য পা দিয়েই। আর, ওই পাটাও অমনি আটকে পড়ল রবার-কন্যার গায়ে। হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল দুটোতেই—চিৎপাত। তারপর সে এক অদ্ভুত জড়াজড়ি-ধস্তাধস্তি, কিন্তু মাকড়ঝাকড়কে হাতে-পায়ে সর্বাঙ্গে এমনভাবেই এঁটে ধরেছে ওই রবারকন্যা যে নড়বার আর জো নাই। কী আর করে লোকটা, মাথা দিয়েই জোর এক গুঁতো লাগায় ওর মাথায়। অমনি কিনা মাথাটাও আটকে গেল রবারসুন্দরীর মাথার সঙ্গে।

গাঁয়ের প্রতিবেশীরা লুকিয়ে থেকে দেখছিল মজার কাণ্ডটা—বাঃ বাঃ, রবারকন্যার সর্বাঙ্গে মাকড়ঝাকড় সেঁটে আছে কী কঠিন বাঁধনে। এবার ওরা এক পেয়ারা গাছের ডাল কেটে আনল—দুই পাশের ছোট ছোট ডালগুলি কিছুটা ছেঁটে উঁচিয়ে রাখল কাঁটার মতো, তারপর সমানে পেটাতে লাগল মাকড়ঝাকড়কে। পিটুনির চোটে রক্তারক্তি হাঁসফাঁস আর চীৎকার। তারপর

ওরা মাকড়খাকড়কে ছাড়িয়ে আনল কষ্টেসৃষ্টে, এবং শেষবারের মতো শাসিয়ে দিল—'ফের যদি কখনো কারো কিছুতে হাত দাও তো মেরেই ফেলব।'

এরপর কখনোই সে আর চুরি করেনি, আর ঐ মারের পরে নিজের বৌয়ের কাছে যা খিঁচুনি খেয়েছে তাও আর ভোলেনি কখনো।

বুনো ছাগল কি করে বনছাড়া হল

একসময় সমস্ত প্রাণীরাই জল খেত একই পুকুর থেকে, আর বছরে একটিবার পুকুরটাকে পরিষ্কার করার কাজে হাত লাগাত সবাই। কেউ যদি এই কাজে ফাঁকি দিত তবে তাকে মেরেই ফেলা হত—এই নিয়মই বহাল ছিল বরাবর।

কিন্তু একবার ঐ বিশেষ কাজে হাজির হল না এক ছাগল। সে বলে পাঠাল তার যাওয়াটা তো এসময় একেবারেই সম্ভব নয়—তার একটি বাচ্চা হয়েছে, তাকে সে কারুর কাছেই রেখে যেতে চায় না।

অন্যসব প্রাণীরা এক দূত পাঠাল—তাহলে, ব্যাপার কি? ছাগলদিদি হাজিরা দেয়নি কেন? ছাগলদিদি এটা-সেটা বলে বলে একটা অজুহাত খাড়া করে। কিন্তু সেকথা বিশ্বাস করে না সবাই। ডালপালা-শিং হরিণ সোজা এসে জানতে চায়—আসল ব্যাপারটা কী? ছাগলদিদি সরাসরি বলে—তার একটি বাচ্চা হয়েছে। হরিণ তখন জানতে চায়—মেয়ে, না ছেলে?

এখন, চতুরা ছাগলদিদি জানে—এই কিছুদিন আগেই মারা গেছে হরিণটার মা, তাই সে বলল—তার মেয়ে হয়েছে।

হরিণ তখন আরো জানতে চায়—'কবে আমার মা এখানে জন্ম নিল?'

ছাগলদিদি অমনি বলে ওঠে—'তোমার মরা মা এই তো এসে জন্ম নিয়েছে।'

তারপর ছাগলদিদির কাছে জানতে এল এক নীলগাই, জানতে এল—'কেন তুমি হাজিরা দেওনি? ঠিক ঠিক বলতে হবে।'

ছাগলদিদি কিন্তু হাসিমুখেই জবাব দেয়—'কী করে যাব, বলো ভাই! এই তো আমার এক ছেলে হয়েছে, সবে আজ তিনদিন হল!'

নীলগাই জানতে চায়—'কার বাবা জন্ম নিল তোমার ঘরে?'

ছাগলদিদি বলে ওঠে—'তোমার বাবা।' কারণ সে জানে ক'দিন আগেই মারা গেছে নীলগাই-এর বাবা।

কিন্তু নীলগাইর কী রকম গোলমেলে মনে হয় ছাগলদিদির কথাবার্তা—সন্দেহ হয়। একে একে সবাই এসে সঠিক ব্যাপার বুঝে নিতে চায়— বড় কি

ছোট সব প্রাণীই। একের পর একেকে ছাগলদিদি স্পষ্টই বলে যায় স্রেফ মিথ্যে কথা। তবে এবারে বুদ্ধি করে বলে—বাবা বা মায়েদের কথা নয়, বলে—তাদের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়রাই মরার পরে নতুন করে জন্ম নিয়েছে তার ঘরে।

সকলেই কিন্তু বিশ্বাস করে ছাগলদিদির সরল কথা। কিন্তু এতে কেমন সন্দেহ হল চিতাবাঘের। সে বুঝে দেখল—এটা কী করে হয়? ছাগলদিদি কিনা কাউকে বলছে মেয়ে হয়েছে, কাউকে বলেছে—ছেলে! আবার কাউকে বলছে তার মরা-মা এসে জন্ম নিয়েছে, কাউকে বলছে তার মরা-বাপ; আবার কাউকে বলছে—তার কোনো আত্মীয়। চিতাবাঘটা তাই রেগেমেগে হাজির হয় ছাগলদিদির সামনে, জানতেও চায় কর্কশ স্বরে—'বলো তো ঠিক ক'রে, কে জন্ম নিল তোমার ঘরে?'

ছাগলদিদি অমনি বলে ফেলে—'তোমার মা!' তা, ছাগলদিদির ঠিক ঠাহর ছিল না—চিতাবাঘের মা মারা গেছে সে তো বহুকাল আগের কথা।

চিতাবাঘ অমনি চেপে ধরে—'কেন, আমার বাবাও তো জন্ম নিতে পারে? সে তো মারা গেছে কিছু আগেই—আর, বাবাকেই আমি ভালোবাসতাম সবচেয়ে বেশি।'

ছাগলদিদি অমনি কিনা পালটে দেয় তার কথা—'হ্যাঁ হ্যাঁ, তাই তো! হঠাৎ ভুল করে ফেলেছি। হ্যাঁ হ্যাঁ, সে তো তোমার বাবাই।'

কিন্তু সঙ্গেসঙ্গেই গর্জে উঠল চিতাবাঘ, ঝাঁপিয়ে পড়তে গেল ছাগলদিদির উপরে। ছাগলদিদি কি আর দাঁড়িয়ে থাকে? দৌড় দৌড়—মরিবাঁচি ভোঁ দৌড়। পিছু পিছু চিতাবাঘ—দৌড়োতে দৌড়োতে থেমে পড়ল গাঁয়ে ঢুকবার মুখে। গাঁয়ে ঢোকা নিরাপদ নয় ভেবে চিতাবাঘ ফিরে এল বনে।

সেই থেকেই ছাগল বাস করছে মানুষের মধ্যে। আর ছাগলকে বনের মধ্যে বা ধারেকাছে দেখলেই ঝাঁপিয়ে পড়ে চিতাবাঘ।

প্রাচীন সাহিত্য : লোকগাথা

যে শিকারী কখনোই আর শিকার করে না

গাঁয়ের সেই বিখ্যাত শিকারী বলতে লাগল :

তোমরা তো সবাই জানো আমি হত্যা করেছি অনেক অনেক পশুপ্রাণী। আমার বাড়ীর দরজায় ওদের সবগুলির মাথাটা সাজানো রয়েছে একের পর এক— তোমরা তা দেখোনি। কিন্তু আমি এখন আর বনজঙ্গলে যাই না শিকার করতে, তার কারণ আমি ভয়াবহ কিছু দেখেছি। সব শিকারীরাই অদ্ভুত রকমের অনেক কিছুই দেখে থাকে, কিন্তু আমি নিজে আগে যা দেখেছি বা অন্যের মুখে শুনেছি—তার সবকিছুর চেয়েও ভয়ংকর এই আমার ব্যাপারটা।

সেদিন আমি শিকার করলাম মস্তো বড়ো একটা হরিণ। আমার গুলি লাগতেই সেটা ছুটে চলল—আমিও ছুটলাম রক্তচিহ্ন ধ'রে ধ'রে, এবং এসে পড়লাম অতিকায় একটা বাওবাব গাছের কাছে। রক্তধারা ওখানেই শেষ হয়ে গেছে, কিন্তু আমি আর কোনো চিহ্নই দেখতে পাচ্ছি না। অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছি, তাই বিশ্রাম নেবার জন্যে একটা গাছের তলায় বসলাম। ওখানে বসে আছি, এমন সময় দেখি এগিয়ে আসছে এক বুড়ো।

মাথায় বয়ে নিয়ে আসছে সে আস্ত একটা ভুঁইফোড়ের ঢিবি। বুড়ো আমার কাছে এসেই জিজ্ঞেস করল—আমি বসে আছি কেন। আমি বললাম প্রকাণ্ড একটা হরিণকে গুলি করেছিলাম, আর তার পিছুপিছু ছুটতে ছুটতে এসে দেখি অতিকায় বাওবাব গাছটার কাছেই নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে রক্তধারা। সে আমাকে তখন বলল যে তাই তো হবার কথা, আর আমি যদি তার সঙ্গেসঙ্গে যাই তো সে আমাকে দেখবার মতো কিছু দেখাবে।

আমাকে সে বন্দুকটা রেখে যেতে বলল গাছটার পাশে, তারপর গাছের মধ্য দিয়েই এগিয়ে নিল বেশ লম্বা একটা অন্ধকার সুড়ঙ্গ-পথে। বাইরে বেরুতেই দেখি আমরা এসে পড়েছি এক গাঁয়ে—নামটা তার কুলপাগা। খুবি ধনী লোকের জায়গা, ঘরবাড়ীও আমাদের সব ঘরবাড়ীর চেয়ে ঢের ঢের বড়, আর খুবি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, লোকজনের পোষাক-পরিচ্ছদও খুবি দামী-দামী। কিন্তু কাছাকাছি আসতেই আমরা শুনতে পেলাম বহু লোকজনের কান্নাকাটি, জানতে পেলাম—গ্রামের মোড়লের বড় ছেলেটি মারা যাচ্ছে।

গ্রামের মোড়লের বাড়ী ঢুকে দেখতে পেলাম বাড়ীর বড়ছেলেকে—এক মৃত্যু-শয্যাশায়ী যুবককে। কী সুন্দর চেহারা তার, বুকে যা আঘাত লেগেছে—বাঁচবার আর আশা নেই। জানতে চাইলাম—কি করে দুর্ঘটনাটা হল ? আমি তখন শুনতে পেলাম—আমাদের গাঁয়েরই কোনো এক শিকারী দিনের পর দিন হত্যা করে যাচ্ছে এই সুন্দর দেশের তরুণদের, তাই এখানকার সকলেই তাকে বড় ভয় করে। তারা আমাকে আরো বলল—তারা তো তার বিরুদ্ধে কখনোই কোনো অন্যায় করেনি। তবু সে যে কেন তাদের হত্যা করে চলেছে—এটা তারা বুঝে উঠছে না। তখন আমি বুঝলাম, তারা আমার কথাই বলছে। তারপর মারা গেল সেই যুবকটি। আর, আমার বন্ধু সেই বুড়োও আমাকে চলে আসতে বলল তার সঙ্গেসঙ্গে। ঐ পথ ধরে ফিরে বাওবাব গাছটার মধ্য দিয়ে বেরিয়ে এলাম, বুড়োও চলে গেল। এবং তখন সামনেই দেখি সেই বড় হরিণটা—বুকে বেঁধা আমার গুলি !

সেইদিন থেকেই আর শিকার করিনি কখনোই। তা, আমি তোমাদের যা বললাম ঠিক তেমনিই দেখেছে আরো অনেক শিকারী। সেকথা তারা নিজ-মুখেই বলেছে।

কোনিয়েকির মা ও তিনছেলে

একসময় এক নরখাদকের সঙ্গেই বিয়ে হয়ে গেল কেনিয়া দেশের এক গিয়কু মেয়ের। মেয়েটি তো জানত না তার বর আসলে একটা রাক্ষস। বিয়ে হয়ে যাবার পরেই সে জানতে পেল তার বিয়ে হয়েছে কিনা একটা নরখাদকের সঙ্গে—ছদ্মবেশী এক রাক্ষসের সঙ্গে। কিন্তু এখন সে যে তাকে ছেড়ে চলে যাবে তারো উপায় নাই ঃ পালিয়ে যাবার একটুও চেষ্টা করেছে কি, কিংবা কাউকে কিছু বলেছে কি, রাক্ষসটা তাকে শাসিয়েছে—তাকে মেরেই খেয়ে ফেলবে। তাই তার জীবন হয়ে উঠল এক ভয়াবহ জীবন, এক দুঃসহ জীবন।

তারপর একদিন মেয়েটির একটা ছেলে হ'ল। ছেলের নাম রাখা হল কোনিয়েকি। কোনিয়েকি বড় হতে না হতেই তার আচারব্যবহার ও ধরণ-ধারণ হয়ে উঠল তার বাবার মতোই—সেও হয়ে দাঁড়াল এক ভয়ঙ্কর রাক্ষস। কোনিয়েকি তার বাবার সঙ্গেই শিকার করতে যেত বনে, যে জীবজন্তুই পেত ধরে আনত নির্বিচারে—বাড়ীতে আনত রান্না করার জন্যে। এদের শিকার-করা কোনো প্রাণীরই মাংস খেত না কোনিয়েকির মা, সে ছিল নিরামিষ-ভোজী।

তারপর একদিন এল কোনিয়েকির মাসী—মায়ের বোন, এসেছে দিদিকে দেখতে। কোনিয়েকি ও তার বাবা কিন্তু স্থির করল রাতেই ওকে মেরে খেয়ে ফেলবে। কোনিয়েকির মা বুঝল এমনটা ঘটবেই, বোনকে তাই বলল—আর দেরী না ক'রে পালিয়ে যেতে। তার বোনকে ঠিকঠিক বলল না কেন তাকে বাড়ীতে রাখা সম্ভব নয়, কেবল একান্ত অন্তরঙ্গের মতোই পরামর্শ দিল তাড়াতাড়ি বাড়ী ছেড়ে যাবার জন্যে।

কোনিয়েকির মাসী ছিল ভারী সন্দেহপ্রবণ, ওই পরামর্শটাতে কেমন সন্দেহই হল তার। তাই সে স্থির করল বনের ভিতর লুকিয়ে থেকে সে বুঝে নেবে আসলে ব্যাপারটা কী। সে উঠে পড়ল খুবি কাছের একটা গাছে—বসে রইল একেবারে মগডালে। কোনিয়েকি আর তার বাবা ঐ গাছটার তলা দিয়ে যেতেই কোনিয়েকি বলল—সে মানুষের গন্ধ পাচ্ছে, আর উপরে তাকাতেই দেখতে পেল এক মেয়েছেলেকে। সঙ্গেসঙ্গেই ব্যাপারটা সে তার বাবার নজরে আনবার চেষ্টা করল, কিন্তু কোনোই কাজ হল না। ওর বাবা বলল—'এখন আর দেরী করার সময় নয়, তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরতে হবে।' কোনিয়েকি কিন্তু সে কথা না শুনে গাছে উঠতে লাগল। এবার সে দেখে কি, ঐ তো তার সেই মাসী—রাতেই যাকে মেরে খাওয়ার কথা। কোনিয়েকি অমনি বলে ওঠে—'আজ রাতেই তো আমরা তোমাকে মেরে খেয়ে ফেলতাম। এখন তুমি যদি তোমার পায়ের আঙুলগুলো খেতে দাও তো আমি তোমাকে ছেড়ে দেব, বাবাকেও কিছু বলব না।'

কি আর করে, কোনিয়েকির মাসী পায়ের আঙুলগুলো খেতে দিল। সঙ্গেসঙ্গেই সে চাইল তার হাতের আঙুলগুলোও। কিন্তু ওগুলো চলে যেতেই সে বড় অসহায় হয়ে পড়ল—কি দিয়ে ধরে রাখবে গাছটা? যন্ত্রণায় দিশাহারা—পড়ে গেল গাছ থেকে। কোনিয়েকি তার বাবাকে ডাক দিল—'ধরেছি বাবা, ধরেছি ওটাকে। দেখো, এসে দেখে যাও।' তার বাবা এলে দুজনে মিলে খুন করল ঐ মেয়েছেলেটিকে। কিন্তু পেটের ভিতরে পেয়ে গেল—তিন তিনটি বাচ্চা। তিনটিই ছেলে। কোনিয়েকি ওদের নিয়ে গিয়ে তুলে দিল মায়ের হাতে—বাচ্চা তিনটির মাংস রেঁধে দেবে। কোনিয়েকির মা দেখে—বাচ্চা তিনটি তখনো বেশ জ্যান্তই আছে। সঙ্গেসঙ্গেই সে বুঝতে পারল ঘটনাটা। সে জানত তার বোনের ছেলেপিলে হবার কথা—একেবারে ভরা মাস।

বাচ্চাদের সে লুকিয়ে রেখে লালনপালন করতে লাগল। আর, ওদের না মেরে রান্না করে রাখল ধেড়ে ধেড়ে কতকগুলো মেঠো ইঁদুর। কোনিয়েকি সন্ধ্যেবেলা ঘরে ফিরে এসেই রান্না-করা নতুন মাংস খেতে চাইল—কোনিয়েকির মাও এগিয়ে দিল সেই মেঠো ইঁদুরের মাংস। তখন একে অন্ধকার

রাত আর খিদেও পেয়েছে ভয়ানক, কোনিয়েকি তাই মাংসটা অত নজর না করেই খেয়ে ফেলল তাড়াতাড়ি। তবে খেতে খেতে গজগজ করছিল—'মা, মাংসটা খেতে ভালো লাগছে না কেন?' ওর মা বলল—এসব ভয়ানক ধরনের মাংস খেতে কীরকম জানে না সে, কখনো তো খায়নি। কোনিয়েকি তার বাবার কাছেও অভিযোগ করছিল খাবারটা নিয়ে, কিন্তু ওর বাবাও ওদিকে বিশেষ কোনো নজর দিল না। খাবার প্রসঙ্গে ওর বাবা ওর মাকে বিশ্বাস করত।

এদিকে কোনিয়েকির মা খুব সযত্নে মানুষ করতে লাগল বোনের বাচ্চা তিনটিকে, নিজের বুকের দুধ খাওয়াত, নিজে রান্না করে খাওয়াত ভালো ভালো খাবার। তাই খুব তাড়াতাড়িই বড় হয়ে উঠল তারা—হল বেশ হৃষ্টপুষ্ট বলিষ্ঠ। ভগবানের কাছে ওদের এই নতুন মা কেবলি প্রার্থনা জানাত—ভগবান যেন তাকে ও তার এই বাচ্চাদের রক্ষা করেন। ভগবান তার প্রার্থনা শুনলেন। সত্যিই সে এক আশ্চর্য ঘটনা—শিশু তিনটির কেউই তাদের শিশুকালেও কাঁদত না কখনোই। আর তাই কোনিয়েকি কিংবা তার বাবাও জানতে পেল না যে তাদের ঘরেই বড় হয়ে উঠছে তিন-তিনটা ছেলে।

ছেলে তিনটি বেশ বড়সড় হয়ে উঠলে একদিন তাদের মা বলল যে তাদের জীবনে বিষম বিপদ উপস্থিত, আর তাই নিরাপদ থাকতে হলে তার পরামর্শ মতো মিলেমিশে এগোতে হবে। আর একটু বড় হলে এবং বেশ শক্ত সমর্থ হলে তাদের হাতেই তুলে দেওয়া হবে তলোয়ার বর্শা এবং তীরধনুক। এসব দিয়ে তারা যুদ্ধ করবে বাড়ীরই ঐ ভয়ংকর দুটো রাক্ষসের বিরুদ্ধে। ছেলে তিনটি বুঝল তাদের মা (ছেলেরা তাকে মা বলত) বাস করছে কী বিষম পরিস্থিতির মধ্যে। অনেকটা সময়ই তারা শিক্ষা করত তলোয়ার চালানো, তীর ছোঁড়া আর বর্শা ছোঁড়া। যখন তাদের নিশ্চিত বিশ্বাস হল যে তারা যুদ্ধবিদ্যাটা ঠিকমতোই আয়ত্ত করেছে, তখন একদিন মায়ের কাছে সম্মতি চাইল—কোনিয়েকি ও তার বাবার সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্যে।

কোনিয়েকি কিন্তু তার বাবাকে প্রায়ই বলত, তাদের বাড়ীতে এত বেশী-বেশী পায়ের ছাপ দেখা যাচ্ছে কেন, বিশেষ করে দিনের শেষে সন্ধ্যাবেলায়। তার সন্দেহ হচ্ছে—বাড়ীতেই অন্যলোক আছে, নয়তো বাইরে থেকেই বাড়ীর ভিতর লোক আসছে। কোনিয়েকির বাবা কিন্তু এসব কথা কানেই তুলত না। সে ভাবত তার ছেলে মজা করবার জন্যেই বলছে। কোনিয়েকির ঔৎসুক্য কিন্তু দমে না, মাকে গিয়ে জিজ্ঞেস করে—'বাড়ীতে এত সব পায়ের ছাপ দেখা যাচ্ছে কেন—বিশেষ করে বিকেলে ও সন্ধ্যায়।' মা বুঝল

কোনিয়েকি ও তার বাবার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাটা থেকে তিন ভাইকে এখনো ঠেকিয়ে রাখলে বিপদই হবে।

মা তিনভাইর জন্যে যোগাড় করে দিল ভালো ভালো বর্শা তলোয়ার আর তীরধনুক, নির্দেশ দিল সন্ধ্যেবেলায় আক্রমণ করবার জন্যে—ঠিক যখন ওরা বাইরে থেকে এসে ঘরে ঢুকতে যাবে। ছেলেরা প্রস্তুত হয়েই ফটকের পাশে অপেক্ষা করতে লাগল। কোনিয়েকি ও তার বাবা ফিরেছে সেদিন খুবি ক্লান্ত-শ্রান্ত— দেহ একেবারে ভেঙ্গে পড়েছে ; বহুদূরে এক জঙ্গলের গভীরে গিয়ে হত্যা করে এনেছে একটা প্রকাণ্ড বুনো মোষ। তারপর বাড়ীতে ঢুকতেই তিন ভাই একসঙ্গে আক্রমণ করল কোনিয়েকি ও তার বাবাকে—সহজেই হত্যা করল। কারণ ওদের অবস্থা তখন এমন যে সমানে লড়াই করা আর সম্ভবই ছিল না। কোনিয়েকি তার বাবাকে কিন্তু মরতে মরতেই বলছিল— 'আমি তোমাকে আগেই বলেছিলাম বাবা, বাড়ীতে পায়ের ছাপ দেখেছিলাম। মনে করে দেখো, বলেছিলাম রান্না মাংসটা ভালো ছিল না—মা ওই বাচ্চাদের মাংস রান্নাই করেনি !'

কথা শেষ করতে না করতেই তীক্ষ্ণ তলোয়ারের এক কোপে খণ্ড হয়ে গেল কোনিয়েকির ঘাড়টা। তারপর তিনভাই মিলে ওদের দুজনের দেহটা পুড়িয়ে ছাই করে দিয়ে মাকে নিয়ে ফিরে গেল মায়ের বাড়ীতে।

সমস্ত গ্রামবাসীরা মিলে বড় আনন্দে আপন করে পেল মা ও তিন ছেলেকে। তারপর তাদের মুখে সবাই শুনল কোনিয়েকিকে ও তার বাবাকে হত্যা করার কাহিনী।

তিনভাইকে বরণ করা হল তাদের জাতির মহাযোদ্ধারূপে— স্থান দেওয়া হল মহাসম্মানের আসনে।

প্রাচীন সাহিত্য ঃ লোকগাথা-রূপকথা

ফুলকুঁড়ি জ্যোছনারাণী

আফ্রিকার অনেক লোকগাথায়ই শোনা যায় জ্যোছনা-সঞ্চারিণী কন্যার আশ্চর্য এক অলৌকিক কাহিনী। এবারে সেই কাহিনীটিই বলছি ঃ

একসময়ে ছিল এক খুব ধনীলোক, আর ছিল তার অনেক স্ত্রী। আর এই স্ত্রীদের মধ্যেই একজন ছিল খুবি সুন্দরী। আর স্বামীও তাকে ভালেবাসত প্রাণের মতো। এজন্যে ঈর্ষার জ্বালায় জ্বলত বাড়ীর অন্যসব বড় বউরা। কিন্তু দুঃখের ব্যাপার হল ওই ছোটবউরই কোলে এল না কোনো সন্তান, এবং কয়েক বছরের মধ্যেই সে হয়ে উঠল স্বামীর কাছেও অনাদরের বৌ—আগে ছিল সুয়োরাণী এখন দুয়োরাণী। আর অন্য সতীনেরাও বেশ মজা পেয়ে দিনরাত ঠাট্টা কাটতে লাগল তার আগের সোহাগের কথা নিয়ে। তারপর ওরা সকলেই কথা বন্ধ করে দিল ছোটবউর সঙ্গে, পা বাড়াত না তার আঙিনায়।

বড় বউয়েরা সবাই মিলে মাঠে যেত চাষবাসের কাজে—হাতে হাতে সাহায্য করত এ-ওকে, আর দুখিনী ছোটবউ তার জমিটুকুতে একা-একা খাটত সকাল থেকে সন্ধ্যা—দুমুঠো দিতে হবে তো পোড়া পেটে। বাড়ীতে তার ঘর ছিল বেশ দূরেই। রাতের বেলা সে মাদুর বুনতে বুনতে চোখের জল ফেলত। কী তার অপরাধ? স্বামীকে সে দিতে পারেনি কোনো সন্তান, বাঁজা সে। জ্যোছনারাতে বড় কষ্ট হত—মন কেমন উতলা হত স্বামীকে একটিবার দেখবার জন্যে, একটুখানি কাছে পাবার জন্যে, কিন্তু স্বামী কখনোই বড় একটা এ-মুখো হত না।

তারপর একদিন জমি চাষ করার পর নিড়ানি দিয়ে ঘাস বেছে ফেলছে তো ঘাস বেছে ফেলছে। এদিকে সন্ধ্যা হয়ে আসছে, ক্লান্তিতে ভেঙে পড়ছে সারাটা শরীর। ছোটবৌ মাঠের মধ্যেই এক গাছতলায় বসে কাঁদতে থাকে নিঃশব্দে, কেউ না শোনে। নীরবে ঝরতে থাকে চোখের জল।

'কাঁদছ কেন, বৌ? কিসের এত দুঃখ তোমার?' ছোটবৌ উপরদিকে তাকিয়ে দেখে দুটো ঘুঘু কখন এসে বসেছে একটা ডালে।

'আমি কাঁদছি, আমার যে দুঃখ হচ্ছে। আমার দুঃখ হচ্ছে, আমার স্বামী যে আমাকে আর ভালোবাসে না। আমাকে ভালোবাসে না, আমার যে ছেলেপুলে হয়নি, আমার যে ছেলেপুলে হয়নি। আমার যে ছেলেপুলে হবে না।'

এই শুনেই ঝটপট উড়ে চলল ঘুঘুজোড়া, খানিকটা পরেই ফিরে এল ঠোঁটে ঠোঁটে দু'দুটো বড়ি।

'এই বড়ি দুটো নাও, ছোটবউ? এখুনি খেয়ে ফেলো, দেখো সময়-মতোই সন্তান হবে তোমার।'

মেয়েটি সঙ্গেসঙ্গেই খেয়ে ফেলল বড়ি দুটো। এতদিন পর একটু দরদী ব্যবহার পেয়ে কৃতজ্ঞতায় ভরে উঠল তার মন, পাখী দুটোর জন্যে এগিয়ে দিল কিছু শস্যদানা।

ওরা বলল—'না, আমাদের কাজের জন্য কোনো ইনাম চাই না আমরা। তুমি আমাদের দুজনকে ছোট্ট দুটি নুড়ি দাও, ওতেই আমরা খুব খুশি হব।'

ছোটবউ সুন্দর দুটি নুড়ি দিল ওদেরকে।

আর সত্যিই, তারপর কয়েকটি পূর্ণিমা যেতেই ছোটবউর মনে হল তার বাচ্চা হবে। খুশিতে ভরে উঠল তার দেহ মন, কিন্তু মনে মনে প্রতিজ্ঞা—একথা জানাবে না কাউকেই, স্বামীকেও নয়। তারপর একরাতে নিঃসঙ্গ ঘরে তার মেয়ে হল একটি। সারাটা আঁধার ঘরে অমনি ফুটে উঠল শতশত চাঁদের আলো। কী যে সুন্দর সেই মেয়েটি তা আর ভাষার প্রকাশ করা যায় না। মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে আনন্দে আর গরবে ভরে উঠল ছোটবউর সারাটা বুক। কিন্তু যে স্বামী তাকে ঠেলে ফেলেছে অনাদরে, অমন স্বামীকে সে কিছুই জানাতে পারবে না। সে তো কোনো খোঁজখবরই নেয় না তার—কখনো না, একটিবারো নয়। মেয়ের নাম রাখল সে থাঙ্গা-লিম্‌লিবো—ফুলকুঁড়ি। দিনের বেলা কখনোই সে লিম্‌লিবোকে নিয়ে বাইরে যায় না—তার ঘরের সামনের উঠানেও নয়। কেবল রাতের বেলায়ই মেয়ে-টিকে নিয়ে বাইরে আসে—গায়ে মাথায় রাতের আঁধার লাগায়, আর আলো হাওয়া খাওয়ায়। এমনটাই চলতে থাকল বছরের পর বছর, তারপর দুটি কুঁড়ি দেখা দিল লিম্‌লিবোর বুকে। আর, তখন থেকেই মা তার মেয়েকে এটা সেটা ছোটখাট কাজ করতে পাঠায় আঙ্গিনায়—দিনের বেলায়ই। এখন বড় সুখে আছে মা ও মেয়ে। মায়ের দেহেও আবার ফিরে এসেছে আগেকার মনভোলানো রূপ।

একদিন সকাল বেলা। লিম্‌লিবো—সেই ফুলকুঁড়ি আঙ্গিনায় নেমে ঘরের সামনেটা ঝাঁট দিয়ে দিয়ে সব সাফসাফাই করছিল। তখনি লোকজনে দেখতে

পেল সেই প্রথম। আর, সেই আশ্চর্য রূপ দেখে তো তারা সকলেই একেবারে মুগ্ধ—রূপের ইন্দ্রজালে বাঁধা পড়েই যেন দাঁড়িয়ে রইল তারা নীরব নিশ্চল, কেবল অপলক দুচোখে দেখতে লাগল ফুলকুঁড়ির অলৌকিক সৌন্দর্য। দেখছে তো দেখছেই,—কেউই তো যেতে পারছে না যে যার কাজে। দর্শকদের মধ্যে যারা শিকারী যেতে পারছে না শিকার করতে, মায়েরা যেতে পারছে না চাষের কাজে। মেয়েরা যেতে পারছে না ঝর্ণা কি নদী থেকে জল আনতে, রাখাল-ছেলেরা যেতে পারছে না গরু কি ছাগল মাঠে চরাতে—এমনকি ওই প্রাণী-গুলিও নড়ছে না,—যেতে চাইছে না এ জায়গা ছেড়ে।

সকালে সেদিন গৃহকর্তা বাড়ী ছিল না—ফিরতে ফিরতে লোকজনের মুখে শুনল তাঁর বাড়ীতেই এক আশ্চর্য সুন্দরীর আশ্চর্য কথা। সঙ্গে সঙ্গেই উপস্থিত হল বাড়ীর একেবারে কিনারায় তার ছোটবউর কুঁড়েঘরে। আঙিনাতেই তাকে দেখতে পেল—অবাক হল ছোটবউকে সেই আগের মতোই রূপবতী দেখে। আলগোছে আলিঙ্গন করে জানতে চায় সবকথা। ছোটবউ তাকে ভিতরে আনতেই সে তো আর চোখের পাতা নামাতে পারে না। তার সামনেই দাঁড়িয়ে একি কোনো দেবকন্যা, না মোহিনী মায়া। মানুষ তো কখনো এত সুন্দরী হতে পারে না—স্বপ্নেও নয়। ছোটবউ পরিচয় করিয়ে দিল—এ তোমার মেয়ে। এতদিন জানাইনি কিছুই—দুঃখে আর অভিমানে।

বড় আনন্দ হল মেয়ের বাবার—বড় আনন্দ হল ছোটবউর স্বামীর। আনন্দে সে জড়িয়ে ধরল মেয়েকে, জড়িয়ে ধরল ছোটবউকে : ছোটবউকে ছেড়ে আবার জড়িয়ে ধরল মেয়েকে, আবার মেয়েকে ছেড়ে ছোটবউকে। আর প্রতিজ্ঞা করল—জীবনে কখনো সে আর ওদের ছেড়ে থাকবে না। আর তার পরে তার মেয়ের কল্যাণে আয়োজন করল সে বিরাট এক ভোজের আর নাচগানের।

ফুলকুঁড়িকে তার বাবার নজরেই যখন আনা গেল, তখন তাকে আর আগের মতোই আড়াল করে রাখতে হবে না—মা বুঝে নিল এবার। কিন্তু দিনের বেলা যেই তার বাইরে আসা, থমকে দাঁড়ায় সব কাজকর্ম—সবাই ঘিরে থাকে তাকে। সে ভিতর ঘরে গেলে তবেই যেন ছাড়া পায় সবাই। কিন্তু এতে যে সব কাজকর্মই পণ্ড হবার জোগাড়! তাই সমাজপ্রধান অর্থাৎ দেশের সর্দার আইন জারি করলেন : না, দিনের বেলায় কখনো সে বাইরে লোক-জনের চোখের সামনে আসতে পারবে না। তাই ফুলকুঁড়ি বাইরের কাজে বেরোয় জোৎস্না রাতেই শুধু, কলসী কাঁখে জল আনে দূরের ঝর্ণা থেকে, মাঠের কাজও করে জ্যোছনারাতে। লোকজনও তাই কাজের শেষে সন্ধ্যেরাতেই

ফুলকুঁড়িকে দেখতে পায়। তবে কেবলমাত্র জ্যোছনাতেই ঘুরে বেড়ায় বলে ফুলকুঁড়িকে সবাই বলত জ্যোছনা-রাণী।

তারপর এল এক আনন্দ-উৎসবের দিন। ইতিমধ্যে চারদিকের সব গাঁয়েও রাষ্ট্র হয়ে গেছে জ্যোছনারাণীর সেই রূপের কথা, আর জ্যোছনারাতে চলাফেরার আশ্চর্য কাহিনী। উৎসবও চলল জ্যোছনারাতেই, খাওয়া-দাওয়াও জ্যোছনায়। আর তারপরের দিন সকাল হতেই বাড়ী লোকে লোকারণ্য—একটিবার শুধু দেখবে জ্যোছনারাণীকে। এরকম লোকের মেলা কেউ কখনোই দেখেনি জীবনে—বুড়োবুড়ীরাও নয়। উৎসব শেষ হল, রাতও ভোর হল। কিন্তু কেউই তো ছেড়ে যেতে পারছে না এ বাড়ী, বুড়োবুড়ীরাও এগোতে চায় তরুণ-তরুণীদের ঠেলেঠুলে। জ্যোছনারাণীকে তখন নিয়ে আসা হল ভিতর-ঘরে—কেউ আর দেখতে না পায়।

এর কয়েকদিনের মধ্যেই জানা গেল জ্যোছনারাণীর সঙ্গে বিয়ে হচ্ছে এক যুবকের, উৎসবের সময়েই দুজনের দেখা—দৃষ্টি বিনিময় এবং মন দেওয়া-নেওয়া। সমবেত তরুণদের মধ্যে অবশ্য এমন একজনও ছিল না—জ্যোছনা-রাণীকে বিয়ে করার জন্য উতলা নয়। কিন্তু জ্যোছনারাণীর পছন্দ কেবল ওই যুবকটিকেই। খুবি বড়ঘরের ছেলে, দেখতেও খুব সুন্দর; তবে বাড়ী তার বেশ খানিকটা দূরেই, এখান থেকে তিনদিনের পথ। মহা ধুমধামে বিয়ে হয়ে গেল জ্যোছনারাণীর, এবং তা জ্যোছনারাতেই। বরপক্ষ এবার কনেকে নিয়ে যাচ্ছে বরের বাড়ী, বরের বাড়ী যাবার আগে বরের আত্মীয়-স্বজনকে বিশেষ করে জানিয়ে দেওয়া হল—কনেকে অর্থাৎ তাদের বৌরাণীকে কখনো কোনো কারণেই যেন দিনের বেলা বাইরে যেতে না দেওয়া হয়। তা, ঘরের যে কোনো কাজেই হক না। জল তোলার কি মাঠের কাজ, কিংবা অন্য যে কাজই হক করবে সে একমাত্র জ্যোছনারাতেই। জ্যোছনারাণীর বরের দেশের লোকজনও তাই সন্ধ্যা ঘনিয়ে উঠতেই জড়ো হত পথে পথে—দেখত আর দেখত জ্যোছনাকে, পথ ছেড়ে যেতেই পারত না। তারপর জ্যোছনার খুকী হল একটি। খুকীকে দেখাশোনার জন্যে রাখা হল একটি শিশুধাই।

সারাটা দিন বাড়ীর সবাই যেত মাঠের কাজে, বা বনের কাজে, আর এই ঘরে থাকত মা, খুকী আর ধাই-শিশুটি। হ্যাঁ, বাড়ীতে আর ছিল কর্তার মা—জ্যোছনারাণীর শ্বশুরমশাইর মা—দিদিশাশুড়ী থুরথুরি এক বুড়ী।

বাড়ীতে ওরা কেউই নেই, যে যখন থাকে তাকেই সাহায্য করতে হয়, ফাই-ফরমাস খাটতে হয়। তখন কড়া দুপুর, বুড়ীর তেষ্টা পেয়ে গেছে খুব—'এক্ষুনি জল দাও, এক্ষুনি।' বুড়ী বেশ রাগী আর জেদীও। বৌ হাঁড়ি

থেকে জল এনে দেয়। কিন্তু ও জল খাবে না বুড়ী, বলে—'ওটা পুরানো, গন্ধ ছাড়ছে। নতুন জল এনে দাও এক্ষুনি, ঝর্ণা থেকে।'

বৌ বলে—'বাড়ীতে তো আর কেউই নেই। ওই জলটাই খান না, খারাপ কিছু তো নয়।'

কিন্তু ঝাঁঝিয়ে উঠে বুড়ী—'ঘরে সোমত্ত বৌ থাকতে কিনা দুর্গন্ধ জল খাব?'

কী আর করে জ্যোছনারাণী? কেবলমাত্র রাতেই যে বাইরে বেরোয়—সেই মেয়েই ঝাঁঝাঁ দুপুরে চলল কলসী কাঁখে সেই দূরে ঝর্ণার পাশের পুকুরের দিকে। তা, খুবি কণ্ট হচ্ছে তার। চোখ মেলে তাকাতেও পারছে না ঝাঁঝাঁ রোদে, চোখ দিয়ে জল নামছে। আর এক বিপদ, রাতেই সে এসেছে পুকুরটা থেকে ঝর্ণার জল আনতে—এসেছেও বহুবার। তখন সবি মনে হয়েছে চেনা, কিন্তু এখন সবি তার কাছে কেমন যেন নতুন—অস্পণ্ট অচেনা। তাড়াতাড়ি যেতে হুচোট খেয়ে পড়ল—হুমড়ি খেয়ে পড়ল কাঁটাঝোপের গায়ে, আঁচড়ে গেল হাত মুখ পা। তবে শেষ পর্যন্ত সে পেঁছিল এসে সেই পুকুরে—ঝর্ণার কাছেই। এ জায়গা থেকেও সে জল নিয়েছে কয়েকবার, তবে রাতের বেলায় জ্যোছনায়। জলের মধ্যে তার কলসীটা ডুবিয়ে জল তুলতে যাচ্ছে, কে যেন জলের তলা থেকেই টেনে নিয়ে গেল তার কলসীটা। হতভম্ব জ্যোছনা তখন তার ঘটিটা ডুবিয়ে দিল, কিন্তু সেটাও টেনে নিয়ে গেল কোন সে অদৃশ্য শক্তি। জ্যোৎস্না এখন কী করে? সে ভাবল, দুই হাতের আঁজল পুরে যতটা জল নেওয়া যায়। কিন্তু হাত দুটি জলে ডুবিয়েছে কি, তাকে জলের তলায় টেনে নিয়ে গেল কোন সে অদৃশ্য শক্তি—কে সে!

সারাদিন খাটুনির পর মাঠ থেকে ফিরেছে সবাই ক্লান্তশ্রান্ত, এসেই দেখে জ্যোছনা ঘরে নেই। জল আনতে গেছে সেই দুপুরবেলা, ফেরেনি এখনো! তখন কি আর করা যায়, ধাই-শিশুটিকেই কিনা পাঠানো হল খোঁজে। পুকুরটার পাশে এসে কত সে ডাকল কত কাঁদল, কিন্তু সাড়া মিলল না কোনো। ফিরে এসে জানাল সেকথা। বাড়ীর সবাই তখন ছুটে গেল দল বেঁধে, জলের কিনারায় দেখতে পেল পায়ের দাগ, বুঝল নিশ্চয়ই মারা গেছে জলে ডুবে। কিন্তু শত চেণ্টায়ও কেউ খুঁজে পেল না সুন্দরী জ্যোছনার মৃতদেহটি। ওরা ফিরে আসতে দেরী হচ্ছে, বাচ্চাখুকী এদিকে মায়ের দুধ খাবার জন্যে কাঁদছে, তাকে থামানোই যাচ্ছে না। তারপর চাঁদ উঠতেই জ্যোছনা ফুটল, ধাই-শিশুটিও রওনা হল বাচ্চাটিকে নিয়ে সেই পুকুরধারে। যাবার সময় কাউকেই কিছুটি বলল না। ওখানে বসে সে কেঁদে কেঁদে গান করে করে ডাকতে লাগল শিশুটির মাকে, বুকের দুধ খাওয়ানোর জন্যে ডাকতে লাগল আকুল সুরে—

ও যে কাঁদছে ও যে কাঁদছে,
জ্যোছনারাণী মা !
ও যে কাঁদছে ও যে কাঁদছে
তোমার বাচ্চাটা।
উঠে এসো—দুধ খাওয়াও গো,
জ্যোছনারাণী মা !

আর, তখনি এক আলোড়ন দেখা দিল গভীর সেই জলাশয়ের বুকে, দেখা দিল মায়ের মাথাটি ও মুখখানি। জলের মধ্যে বুক অবধি জেগে উঠে বলতে লাগল জ্যোছনারাণী মা—

এটা তো ওদেরি ফন্দী
ওদের ফন্দী গো—
ওরা কারা বলব নাকো, না :
জল আনতে পাঠাল গো
ঝাঁ ঝাঁ দুপুরে !
ঘটি দিয়ে জল ভরি
ঘটি ডুবে যায়,
কলসী ভরার চেণ্টা করি
কলসী ডুবে যায়,
হাতা দিয়ে চেণ্টা করি
হাতা ডুবে যায়,
আঁজল পুরে আনতে গিয়ে
জলেই ডুবে যাই।

কেঁদে কেঁদে গান গাইতে গাইতে জ্যোছনা-রানীমা উঠে এল জল থেকে, বাচ্চাকে দুই বাহুর মধ্যে নিয়ে বুকের দুধ খাওয়াতে খাওয়াতে দোল দিতে লাগল। তারপর দুধ খাওয়ানো শেষ হতেই একটি কথাও না বলে বাচ্চাকে ফিরিয়ে দিল তার ধাই-শিশুটির কাছে। ধাই-শিশুটি ঘরে ফিরে এসে বাচ্চাকে ঘুম পাড়িয়ে দিল বিছানায়। এমনি চলতে লাগল দিনের পর দিন—সবার অগোচরে। তারপর বাড়ীর লোকজনের কেমন সন্দেহ হয়, জানতে পারে রোজরাতেই কি ঘটে জলাশয়ের ওখানে। সবাই স্থির করে—সময়মতো গিয়ে ঠিকঠিক ধরে ফেলবে জ্যোছনাকে।

সেদিন রাতে ওরা সবাই ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে লুকিয়ে দেখতে পায়—ঐ যে উঠে আসছে জ্যোছনা গভীর জল থেকে, উঠে এসে ধাইটির কোল থেকে বাচ্চাটাকে নিয়ে দুধ খাওয়াচ্ছে ! তারপর দুধ খাওয়ানো হলে যেই বাচ্চাটাকে

ফিরিয়ে দিতে যাচ্ছে, চারদিক থেকে ঘিরে ধরল সবাই, ধরাধরি করে নিয়ে চলল বাড়ীর দিকে। কিন্তু পিছু পিছু ফেনিল ক্রোধে ছুটে আসতে লাগল ঝর্ণা-স্রোতটা—বয়ে চলল মাঠ আর বন ভাসিয়ে। তবুও তো তারা ছেড়ে দেয় না জ্যোছনাকে। এবারে গাঁয়ের পাশে আসতেই নদী হয়ে উঠল রক্তনদী—কী ভয়নাক রক্তরাঙা জল! ভয়ে সবাই জ্যোছনাকে ছেড়ে দিয়ে ফিরে আসতেই কিনা সরে যেতে লাগল রক্তনদী, পালটে গেল তার রঙ।

কেউই তো বুঝে উঠছে না—ব্যাপার কী, ভাবছে কত কী। আর ঠিক তখনি উড়তে-উড়তে উড়তে-উড়তে দেখা দিল সেই ঘুঘু দুটি, ঘুরতে লাগল বাড়ীর পাশে। ছেলেরা ঢিল ছুঁড়ে মারতেই ওরা গেয়ে উঠল—

ঘুঘু নই গো ঘুঘু নই,
মারছ কেন গো;
এসেছি তো খবর দিতে
জ্যোৎস্নারাণী মার।
ডুবিয়ে দিল কলসী কাঁখের
কলসী ডুবে গেল,
ডুবিয়ে দিল জলের বাটি,
বাটিই ডুবে গেল।
ডুবিয়ে দিল হাতাখানি,
তাও ডুবে গেল;
ডুবিয়ে দিল হাত দুটি তার,
নিজেই ডুবে গেল।

জ্যোছনার বাবা-মা ওইকথা শুনে পাখী দুটিকে ডেকে খেতে দিল ভালো ভালো খাবার, তারপর তাদের বলল জ্যোছনার বরের বাড়ীতে উড়ে যেতে, তাদের বলতে—তারা যেন বিয়ের যৌতুক সেই লালরঙের বলদটাকে মেরে তার কঙ্কালটা ফেলে দেয় ওই জলাশয়টার মধ্যে—সন্ধ্যার পরে বেশ রাত হ'লে। ঘুঘু দুটি অমনি উড়তে-উড়তে উড়তে-উড়তে চলে এল ঠিক বাড়ীটিতে, গান গেয়ে গেয়ে বলতে লাগল সঠিক সেই বাবস্থাটার কথা। আর সেই বাড়ীর লোকজনও তা শুনে কাজ করে গেল কথামতোই।

সেদিন সন্ধ্যায় চাঁদ উঠতেই ধাই-শিশুটি যখন জলের কিনারায় দাঁড়িয়ে, গাঁয়ের সব লোকজনও এগিয়ে এসেছে তার পিছু পিছু। সবাই দেখছে ধাই-শিশুটি করুণ সুরে ডাকতেই জ্যোছনারাণী উঠে এল, জলের মধ্যে দাঁড়িয়ে রইল বুক অবধি উঁচিয়ে, শুনতে লাগল ধাই-শিশুটির করুণ গান। তারপর সে উঠে এল পারে, তার বাচ্চাকে দুধ খাইয়ে দুই হাতে আদর করে

দোলা দিতে লাগল। কিন্তু এবারে সে তার খুকীকে তুলে দিল না ধাই-শিশুর হাতে, দুই বাহু দিয়ে আদরে জড়িয়ে রাখল বুকে। তারপর সে চলতে লাগল গাঁয়ের দিকে বাড়ীতে। পথে পথে যত লোকজন তো দেখে আর দেখে, চোখে আর পলক পড়ে না।

সোহাগীর মাথার বান্দানা

একসময়ে ছিল নিয়েঙ্গেবুল নামে একটি লোক, আর তার ছিল দুজন বো। কিন্তু স্বামীর সংসারে ছেলেপুলে এনে দিতে পারল একমাত্র বড়বো। ছোটবো স্বামী-সোহাগিনী হলে হবে কি, তার কোনো সন্তান হল না। তবে, বয়সে সে তরুণী, হাসিখুশি খুবি, খুবি মন কাড়বার মতো চেহারা—বড়বো ওর কাছে দাঁড়াবার মতোই নয়। নিয়েঙ্গেবুল তাই খুবি ভালোবাসত তার ছোটবোকে। আর ছোটবোয়ের বাপের বাড়ীর সবাইও বড়ই পছন্দ করত নিয়েঙ্গেবুলকে—হ্যাঁ তারা সক্কলেই। নিয়েঙ্গেবুল ছিল সত্যিই ভালোমানুষ, আর ভালোবাসত সে সবাইকেই। সে যখন ছোটবউর বাপের বাড়ীতে যেত—তার শ্বশুরবাড়ীতে তখন সারাটা পরিবারেই যেন উৎসব লেগে যেত। শ্যালিকারা ও শ্যালকদের বৌয়েরা মিলে ওকে জেঁকে ধরত,—ঠাট্টা মস্করায় ও হৈ-হুল্লোড়ে কয়েকটা দিন কেটে যেত চমৎকার। আর, নিয়েঙ্গে-বুলও তার সোহাগী বৌয়ের বাপের বাড়ীতে গেলে খালি হাতে যেত না কখনোই, শ্যালিকাদের ও শ্যালকদের বউদের প্রত্যেকের হাতে তুলে দেবার জন্যে কিছু-না-কিছু উপহার নিয়ে যেতই। তবে গিয়েই সরাসরি দিয়ে দিত না, ভারী মজা করত খানিকটা—'তাই তো, আসবার সময়ে ভুলেই গেছি উপহারগুলো আনতে।' কিংবা 'নানা কাজে বাইরে বাইরে ঘুরে বাড়ী ফিরেই আসতে হল। তাই আর কি, খালি হাতেই এসে পড়েছি হঠাং।' এসব কথা বলার সময় মুখখানায় কাঁচুমাচু ভাব দেখাত অপরাধীর মতো, আর উপহারগুলি লুকিয়ে রেখে মনে মনে হাসত। ওরাও জানে জামাইবাবুর মজাদার স্বভাব—এদিক ওদিক খুঁজত, হাত ধরে টানাটানি করত। আর, তারপর সে হঠাৎ সকলের হাতে একে একে তুলে দিতে থাকত সুন্দর সুন্দর সৌখীন জিনিস। তবে তারো আগে জামাইবাবু সেজে যেন অভিনয়ই করত খানিকটা—বসেই থাকত নিয়েঙ্গেবুল—বেশ গম্ভীর মুখে। আর শ্যালিকা-শালাবৌয়েরা মিলে একে একে বলতে থাকত নানারকমের রঙ্গের কথা, নানারকমের খোসামোদের কথা, নানারকমে জামাইবাবুর গুণগানের কথা। হ্যাঁ, তার পরেই সে খোসমেজাজে

ফেটে পড়ত মজাদার হাসিতে, এবং এক একজনের হাতে উপহারগুলি তুলে দেবার সময় বলতে থাকত এক-এক রকমের রসের কথা বা রঙে-ঢঙের কবিতা। নিয়েঙ্গেবুলকে সকলেই পছন্দ করত তার মধুর ব্যবহার ও মধুর ভাষার জন্যে। কেবল শ্বশুরবাড়ীর ছোটরাই নয়, শ্বশুর-শাশুড়ী কি পাড়া-পড়শীরাও। শুধু তার খোসমেজাজী গল্পেরই নয়, তার গানের আর নাচের প্রশংসায়ও সকলেই ছিল পঞ্চমুখ। গানে আর নাচে তার জুড়ি ছিল না। শ্বশুরবাড়ীতে এসে জামাইবাবু তাই সকলকেই জমিয়ে রাখত নানাভাবে। সোহাগিনী ছোটবৌকে ছেড়ে একা আসত না সে কখনোই—কোনোবারেই নয়। নিয়েঙ্গেবুল আবার কখন তার শ্বশুরের গাঁয়ে আসবে—গ্রামবাসীরা সবাই প্রতীক্ষায় থাকত।

কিন্তু একটা ব্যাপারে শ্বশুরবাড়ীর সবাই বড় কষ্ট পেত—নিয়েঙ্গেবুলের এই বৌয়ের কোনো ছেলেপুলে হল না এখনো—কোল খালিই রয়ে গেল। সবাই শেষবুঝ বুঝল—ছোটবউ কখনোই যে মা হবে না তা সুনিশ্চিত। নিয়েঙ্গেবুলকে এবার তারা বলতে লাগল আবার বিয়ে করতে। ঐ বৌয়ের ছোটবোনদের অর্থাৎ কিনা শ্যালিকাদের মধ্যের কাউকে বিয়ে করলেই তো হয়। আর, শ্বশুরবাড়িতে একবার যখন খাজি (যৌতুক) দেওয়া হয়েই গেছে তাদেরই এক বন্ধ্যা মেয়ের জন্যে, তখন তার অন্যবোনকে বিয়ে করতে যৌতুক দিতে হবে না। কিন্তু নিয়েঙ্গেবুল রাজি হয় না—তার বড়বউকে দিয়ে তো অনেক ছেলেমেয়েই পেয়েছে। আর তাছাড়া, ছোটবউকে সে খুবি ভালো-বাসে, তার জায়গায় অন্য কারো দরকারই নেই তার। কিন্তু এসব কথা বলে সে নিজেদের পরিবারের ও গ্রামবাসীদের মধ্যেই। শ্বশুরবাড়ীতে তো সরাসরি প্রত্যাখ্যান করা যায় না নতুন বিয়ের প্রস্তাব, তাদের বলে—ভেবে দেখবার জন্যে কিছুটা সময় চায়। কিন্তু শ্যালক ও শ্যালক-বৌয়েরা ছাড়ে না—একটা বোনকে বিয়ে করতেই হবে। নিয়েঙ্গেবুলও হাসতে হাসতে জবাব দেয় —'দেখি, এদের কোন্‌টি তার পছন্দ। বুঝেসুঝে নিতে হবে তো, ছোট বৌয়ের সতীন হিসেবে মানাবে কোনটিকে? এতে একটু সময় লাগবে বেশিই।' সময়ের পর সময় চলে যেতে সবাই বুঝল তার সোহাগের ছোটবৌর কাছে নতুন কাউকেই পছন্দ নয়।

তারপর শ্বশুরবাড়ী থেকে শিগগির একদিন আমন্ত্রণ এল—নিয়েঙ্গেবুল অবশ্যি যেন তার ছোটবৌকে নিয়ে শ্বশুরবাড়ীতে চলে আসে। বাড়ীতে বড়রকমের এক উৎসব হচ্ছে—আত্মীয়স্বজন সকলেই আসছে।

কয়েকদিন আগে থেকেই নিয়েঙ্গেবুল আর তার ছোটবৌ সোহাগী মহা আনন্দে যোগাড়যন্ত্র করতে লাগল যাত্রা করবার জন্যে। কিন্তু কিছুদিন

তো বাইরে থাকতে হচ্ছে, রান্নাঘরের লকড়িও ফুরিয়ে আসছে, নতুন কেটে রাখতে হবে দুয়েক বোঝা। বড়বৌয়ের সঙ্গে ছোটবৌও তাই বনে গেল কাঠ কাটতে। কাঠ যোগাড় করতে করতে ঢুকে গেল বনের গভীরে—এ এদিকে, ও ওদিকে। মাঝে মাঝে হাঁক দিচ্ছে যোগ রক্ষার জন্যে, হদিশ না হারায় তাই। তারপর দুজনেই দুই বড় বড় বোঝা মাথায় নিয়ে বসল এসে বড় একটা গাছের তলায় ঘন ছায়ায়। তখন ভরা দুপুর।

ওখানে ওরা দুজন যখন বসে বসে বিশ্রাম করছে, ঐ যে এক মৌটুসী পাখী ডাকছে—চিরুর চিরুর! প্রথমে শুনতে পেয়েছে সোহাগীই, শোনামাত্রই বুঝতে পেরেছে কাছেই কোথাও মৌচাক আছে। ঐ যে আবার ডাকছে! সত্যিই মৌটুসীটা ডাকতে ডাকতে একবার ছোটবৌর কাছে আসছে, আবার পিছিয়ে গিয়েই ফিরে আসছে ঃ সঙ্গে যেতে বলছে। ছোটবউ তড়াক করে লাফিয়ে উঠেই ছুটতে লাগল পিছু পিছু, বড়বৌকে বলল—'মৌচাক আছে কাছেই। জল্দি জল্দি এস।'

দুজনেই পাখীটার পিছু পিছু এসে পেয়ে গেল ছোট ছোট অনেক মৌচাক। তুলে এনে এনে জড়ো করে রাখল দুজনে দুইভাগ, বসে বসে খেতে লাগল আরাম ক'রে। আর মৌটুসীটা চিড়িক চিড়িক ডাকতে ডাকতে ঘুরতে লাগল ওদের মাথার উপরে।

বড়বৌ তার ভাগ থেকে খেতে খেতে বারবার খানিকটা করে রেখে দিচ্ছিল বড় একটা পাতায়, শেষটায় খানিকটা রেখে দিল পাখীটার জন্যে। বড়বৌ উঠে পড়ে তার মউটা ভালো ক'রে পাতার ঠোঙায় নিয়ে নিচ্ছে, তাই দেখে ছোটবউর হঠাৎ টনক নড়ে। সে বলে ওঠে—'কৈ দিদিভাই, তুমি তো আমাকে কিছুটা তুলে রাখতে বললে না? আমার তো মনেই ছিল না।'

'কেন মনে ছিল না তুমিও ভালোই জানো, ছেলেপুলে নেই তো তাই কাদের জন্যে আর নিয়ে যাবে?'—বলতে থাকে বড়বৌ, 'যার কাচ্চাবাচ্চা আছে তার তো খেতে খেতে ওদের জন্যেও কিছুটা নিয়ে যাবার কথা মনে থাকবেই।'

ছোটবৌ এতে আর কথা বলল না কোনো। যার যার বোঝা মাথায় তুলে চলতে লাগল দুজনেই বাড়ীর দিকে।

সারাটা দিন নিয়েঙ্গেবুল এদিকে নানাকাজে ব্যস্ত, জিনিসপত্র ভাগে ভাগে সব গোছানো হয়ে গেছে—বাঁধাছাঁদাও শেষ। এমনকি প্রথামতোই মোটাসোটা থলথলে চর্বি'ওয়ালা যে ছাগলটিকে সে উৎসবে জামাইয়ের ভেট দেবে—সেই ছাগলটাকেও এগিয়ে নিয়ে বেঁধে রেখেছে ফটকের সঙ্গে। এবার সে অপেক্ষা করছে বৌদের ফিরে আসার জন্যে, ফিরে এলেই বড়বৌকে জানিয়ে দিতে হবে—কাল ভোরে মোরগ ডাকার সঙ্গেসঙ্গেই রওনা হতে হবে ছোটবৌকে

নিয়ে তার বাপের বাড়ীর উৎসবে যোগ দিতে, আর বড়বৌ তার অনুপস্থিতির সময় ছেলেদের কাকে দিয়ে কি কি কাজ করাবে তাও বলে দেবে।

বড়বৌ ও ছোটবউ সারাদিনের পর যার যার ঘরে গিয়ে অগোছালো যা-কিছু সাজিয়ে গুছিয়ে রাখল। আর তখন নিয়েঙ্গেবুল বড়বউর ঘরে এসে বসল, বলল তার ছোটবৌকে নিয়ে তার বাপের বাড়ীর উৎসবে যাওয়ার কথাটা, আর সেই কটা দিন ছেলেদের কাকে দিয়ে কি কি কাজ করাতে হবে সে কথাও। এসব নির্দেশের কথা শুনেই বড়বৌ তার এক এক ছেলেকে ধরে ধরে বুঝিয়ে দিল কাকে কি কি কাজ করতে হবে—তাদের বাবার বাইরে থাকার কটাদিন। 'এই যে, তুই শুনলি তো কটাদিন বাড়ী থাকছে না তোর বাবা। আর তখন তোকেই করতে হবে এই এই কাজ।' 'আর এই যে, তুইও শুনলি তো কটাদিন বাড়ী থাকছে না তোর বাবা। তখন তোকেই করতে হবে এই এই কাজ।'

বড়বৌ এবার মৌয়ের পাত্রটা বার করে আনে, পোড়ামাটির একটা পাত্রে রাখে মৌচাকের কয়েকটা মধুখান্ডা, বাকীটা দেয় ছেলেদের হাতে।

নিয়েঙ্গেবুল সানন্দে মধুখান্ডা খেতে গিয়ে বলে—'তাহলে তোমরা দুই বউ মিলে আজ চমৎকার এই মৌ জোগাড় করে আনলে?'

'তা, ছোটবউই তো প্রথমে দেখল মৌটুসীটাকে—ছুটে গেল পিছু পিছু। আমাকেও ডেকে নিল।'

'বাঃ, ভারী সুন্দর! তা, তুমিও কিছুটা খাও।'

'না, আমি অনেকটাই খেয়ে এসেছি—বনের মধ্যেই।'

নিয়েঙ্গেবুল সবটা খেয়ে খুবি খোসমেজাজে ঢুকল এসে ছোটবউর ঘরে। এবারে এখানে হবে ভুরিভোজ। বড়বউই যদি এতটা দিয়েছে, তার সোহাগী ছোটবউ তো মৌ দেবে একেবারে ভরাপাত্র! তা, মৌচাক তো খুঁজে পেয়েছে সে নিজেই, আর ছেলেগুলোকে দেবার ব্যাপারও নেই তার। শুধু দুজনে একত্রে বসে খাওয়া যাবে আরাম ক'রে—সে আর তার সোহাগী। শুধু দুজনে।

ছোটবউ তার কাপড়-চোপড় ও জিনিসপত্র গোছাতে আর বাঁধাছাঁদা করতেই মহাব্যস্ত। রাতের খাবার তখনো তৈরীই হয়নি। নিয়েঙ্গেবুল মধু খাওয়ার কথাটা তুলল না, ভাবল রাতের খাবারের আগেআগেই দেবে। কিন্তু রান্না শেষ হলে খাবার দেওয়া হল—তখনো মধু খাওয়ার নামগন্ধ নেই। খাওয়া শেষ হল, থালাবাটি সরিয়ে নিয়ে গেল,—জায়গাটা মুছে দেওয়া হল, বাসন-কোসন ঘসামাজা হল। হ্যাঁ, এবারে তাহলে মধুর পাত্র আসছে। কিন্তু তা নয়? ওদিকে শেষ পছন্দমতো সোহাগী বারবার দেখে দেখে থলেতে তুলে নিচ্ছে যেটা-যেটা তার বিশেষ পছন্দ, যা পরলে সবচেয়ে সুন্দর দেখাবে উৎসবে।

কিংবা যা-সব অনেকদিন পরেনি—নতুন লাগবে পরলে। একে একে বাঁধাছাদা হয়ে গেল সাজপোষাক অলঙ্কার। এসব করতে করতে রাত হল বেশ, ওবাড়ীর সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে কখন। ঘুমে নিস্তব্ধ সারাটা গাঁ।

গোছানো জিনিসপত্র সবি হয়েছে মনের মতো—তাই দেখে ছোটবউ সোহাগী এবার হাই তুলতে তুলতে বলল তার স্বামীকে—'এবার শুতে চলো, কাল উঠতে হবে সেই মোরগ-ডাকা ভোরে।'

'ঘুমোতে? তা, তুমি একটা-কিছু আমাকে দিতে ভুলেই গেছ যে!'

'একটা কিছু?'

'হ্যাঁ, আমার জন্যে যে মোখাণ্ডা এনেছ তা কোথায়?'

'তোমার জন্যে তো মোখাণ্ডা আনিনি।'

'মজা করছ, বলো?'

'না, সত্যিই আনিনি। তুমি যদি ভেবে থাকো মজা করছি—নিজেই খুঁজে দেখো না কেন? সত্যিই আমি ভুলে গিয়েছিলাম।'

'তুমি ভুলে গিয়েছিলে? তুমি ভুলে গিয়েছিলে—আমাকে? তাহলে মনে করে রেখেছিলে কোন্‌টা—আমাকেই যদি ভুলে গিয়ে থাকো?'

ছোটবউ সোহাগী একথার কোনো জবাব দেবার আগেই নিয়েঙ্গেবুল করল কি, হাতের কাছেই পেল একটা মোটালাঠি, তাই দিয়ে প্রচণ্ড জোরে আঘাত করল সোহাগীর মাথায়। মাটিতে পড়ে গেল সোহাগী—নিশ্চল দেহ নড়ে না আর, দুচোখ বোজা। দারুণ ভয় পেয়ে গেল নিয়েঙ্গেবুল। নুয়ে পড়ে বুকে ও হাতপায়ে হাত দিয়ে দেখতে লাগল। না, একদম ঠাণ্ডা দেহ। আদরের সুরে নাম ধরে ডাকতে লাগল সোহাগীকে—দুচোখ একবার খুলেই সেই যে বুজে গেল, শত ডাকেও আর খুলল না।

নিয়েঙ্গেবুল ভয়ে দৌড়ে এল বাইরে, লোকজন ডেকে আনবে ভাবল, কিন্তু তা না করে আঙুলের পায়ে ভর করে করে আস্তে আস্তে ঢুকল ঘরটায়। চারদিকের নিস্তব্ধতা ও শান্ত অবস্থার মধ্যে ভয়ানক ভয় লাগছে। ছোটবউর পাশে হাঁটু গেড়ে বসল, সারাটা শরীর স্পর্শ করে দেখতে লাগল—বুকে হাতে পায়ে। না, মরে গেছে। তার সোহাগী, তার 'ন্‌টণ্ডনেকাজি', তার ছোটবৌ মরে গেছে! এবার কী করবে সে? এখানে তো কাউকেই সে ডেকে আনতে পারছে না। ভোর হবার আগেই কবর দিতে হবে। হ্যাঁ, একাই কবর দিতে হবে। ভাগ্য ভালো বলতে হবে, সবাই জানে কাল রাতভোরেই সে চলে যাচ্ছে। রাতেই কবর দিয়ে কাল সকালেই চলে যাচ্ছে—আগেই ব্যবস্থা হয়ে রয়েছে যেমনটা। তখন তার বড়বৌ ও ছেলেপুলেরা আর পাড়াপড়শীরাও জানবে ছোটবৌ সোহাগী চলে গেছে তার সঙ্গেই।

একটা কোদাল ও শাবল নিয়ে চুপিচুপি এগিয়ে গেল সে যথাস্থানে—একটা কবর খুঁড়ে একবার দেখে নিল চারদিকটা। এবার চলে এল ঘরে, নজর করে দেখে নিল চারদিকটা। স্ত্রীর দেহটা এবার সে বয়ে নিয়ে রেখে দিল কবরের মধ্যে। ঘরে ফিরে এসে চারদিকটা দেখতে লাগল। ঐ যে রয়ে গেছে ওর বাঁধাছাদা জিনিসপত্তর—ওসবও নিল, কবরের মধ্যে রাখল মৃতদেহটির উপরে। এবারে মাটি দিয়ে ঢেকে দিল সব। কোনোকিছুই আর ধরা পড়ার যো নাই। তবে, জিনিসপত্র আনার সময় পথেই কখন যে পড়ে গেছে স্ত্রীর মাথায় বাঁধা বান্দানাটা—যেটা সন্ধ্যাবেলায়ও ছিল তার মাথায়, তা তো খেয়াল নেই।

নিয়েঙ্গেবুলে ফিরে এল ঘরে। না, ঘুমোতে নয়। কী করবে, এখন তাই ভাবছে। যদি সে ওর বাপের বাড়ীতে আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে না যায় তো তারা জানতে এগিয়ে আসবে—এমন কী ঘটনা ঘটল। যদি গিয়ে বলে যে সোহাগী অসুস্থ, তাহলে বাপের বাড়ীর লোক আসবে দেখাশোনা করতে—সেবাশুশ্রূষা করতে। শ্বশুরমশাই তো ওর ছোটবোনদের পাঠিয়ে দিয়েছেন—এমনটাই হয়েছে যখন। তখন জানাজানি হয়ে যাবে। না, তাকে যেতেই হবে। এক্ষেত্রে আর কোনোই উপায় নেই। কিন্তু একাই বা সে কী করে যায়, সোহাগীকে সঙ্গে না নিয়ে। ওকে না দেখে কী ভাববে ওরা, কী বলবে তখন? তবে না গিয়েও তো গত্যন্তর নেই। না গেলেই তো সন্দেহ বাড়বে। তা, যেতে যেতেই বরং ভেবে নেওয়া যাবে—কী করবে। গিয়ে সে এমন ভাব দেখাবে যেন কোনোকিছুই হয়নি। কিন্তু উৎসব শেষ হয়ে গেলে—তখন? তখন কী হবে? ভোর হ'ল—ঐযে ডেকে উঠল মোরগ! নিয়েঙ্গেবুল বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল, বোঝাটা কাঁধে তুলে নিল, আস্তে আস্তে এগিয়ে গিয়ে দরজাটা খুলে ফেলল, নিঃশব্দে বন্ধ করে রাখল দরজাটা। ছাগলটার দড়িটা খুলে তার গায়ে হাত চাপড়াল—ডেকে না ওঠে তাই। না, ছাগলটা ডাকল না, ছাড়া পেয়ে বরং খুশিই।

জোর পায়ে হাঁটতে লাগল নিয়েঙ্গেবুল—যেন সে ছুটে পালাচ্ছে একটা-কিছু থেকে। বিকেল নাগাদ এসে পড়ল একটা দুমুখো রাস্তায়। ডান দিকেরটা সরাসরি সংক্ষিপ্ত পথ—চলে গেছে সোহাগীর বাপের বাড়ী। ওই পথে খানিকটা এগোতেই শোনে কি, ডেকে ফিরছে একটা মৌটুসী—এই তার আগে আগে; এই তার পিছনে। পথ দেখিয়ে দেখিয়ে নিচ্ছে এগিয়ে, আর গানে গানে ওই বলছে কী?

নিয়েঙ্গেবুল খুন করেছে তার সোহাগীকে,
মৌমাছিদের পিছু পিছু খুঁজে পেয়েছিল মৌ,

সবটা মউই খেয়ে ফেলেছিল – রাখেনি স্বামীর ভাগ,
স্বামী তাকে তাই কবর দিয়েছে. সাথে উৎসব-সাজ।
দেখেনি তো চেয়ে মাথার বান্দানা পড়ে আছে পথমাঝ।

চমকে ওঠে নিয়েঙ্গেবুল : এসব কথা কি পাখীটাই বলছিল ? পাখীটা তাহলে গেল কোথায় ? সঙ্গেসঙ্গেই দেখা দিল মৌটুসীটা, ঝটপট ডানায় ঘুরতে ঘুরতে গাইতে লাগল ওই গানটা। অদৃশ্য হয়ে গেল। নিয়েঙ্গেবুল ঠিক করল আবার যদি আসে তো একটা-কিছু ছুঁড়ে মেরেই ফেলবে। সঙ্গেসঙ্গেই গান গাইতে গাইতে দেখা দিল পাখীটা, নিয়েঙ্গেবুলও ছুঁড়ে মারল লাঠি—ভেঙ্গে গেল একটা ডানা। ডানাটা ছিঁড়ে গিয়ে থরথর করে কাঁপতে লাগল শূন্যে, নিচে নেমে এসে পড়ে রইল নিয়েঙ্গেবুলের পায়ের কাছে। কিন্তু একি ! ওটা কি ? এটা তো পাখীর ডানা নয়, এটা তো তার হাতে খুন হওয়ার সময়কার সোহাগীর মাথায় ছিল !

ওইদিকে তাকিয়ে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল নিয়েঙ্গেবুল। ওটা তো তারি সোহাগীর মাথার বান্দানাটা। ওটাও তো একইসঙ্গে কবর দেওয়া উচিত ছিল। সুযোগমতো করা যাবে এবার, এখন থাক উপহার-সামগ্রীরই তলার দিকে।

তারপর নিয়েঙ্গেবুলকে আসতে দেখেই আনন্দে চিৎকার করতে করতে আর উলু-লুলু শব্দ করতে করতে এগিয়ে গেল বিবাহিতা নারীর দল। উৎসবে যখন কোনো পশুকে বলি দেবার জন্যেই ভেট আনা হয়—তখন এমনিধারা অভ্যর্থনা জানানোটাই নিয়ম। আঙ্গিনায়—'নকুন্ডলা'য় এসে পড়তেই শ্যালকেরা তার হাত থেকে নিয়ে নিল ছাগলটা, আর শ্যালকদের স্ত্রীরা মিলে নিয়েঙ্গেবুলকে তার আর সোহাগীর জন্যে নির্দিষ্ট ঘরটিতে নিয়ে আসতে লাগল, গাইতে লাগল তার পরিবারের প্রশংসার গান গানের পর— গানের ফুলঝুরি। আর, দেখতে না দেখতে এগিয়ে এল একঝাঁক শ্যালিকাসুন্দরী।

তারা জিজ্ঞেস করে—'কৈ, আমাদের বোন কোথায় ?'

'ও, তাহলে ও এখনো এসে পৌছয়নি ?'—বলে নিয়েঙ্গেবুল।

'না, এসে পেঁছয়নি তো এখনো। বাড়ী থেকে রওনা হয়েছে কখন ?'

'ছাগলটাকে নিয়ে আসতে হবে, তাই আমি একটু আগেভাগেই রওনা হয়েছিলাম। কিন্তু তখন তো ও প্রায় তৈরীই হয়ে গেছে। আমি ভেবেছি ও তো আমার আগেই এসে পেঁছে যাবে। ও আসছে সোজা পথ ধরে. আর সঙ্গেও কোনো ঝামেলা নেই আমার মতো।'

এবার কেউ এনে দেয় হাত-পা ধোয়ার জল, কেউ এনে দেয় খাবার, কেউ এনে দেয় হালকা ধরণের মদ। খোসমেজাজী জামাইবাবুকে খুশি করে সবাই।

উৎসবটা শুরু হবে সামনের দিন। বাড়ীর লোকেজন ও বন্ধুবান্ধবেরা মহাব্যস্ত আয়োজনের শেষ-পর্বটা সমাধা করতে। মেয়েরা মদ তৈরী করে রাখছে যত পরিমাণে দরকার তার চেয়েও বেশীটাই। পুরুষেরা কাঠ কাটছে চিড়ছে, আর বলি দিচ্ছে ষাঁড় ও ছাগল। উৎসবে যার যা কাজের ভার তাতেই ব্যস্তসমস্ত। তবে কাজের জন্য যত লোক দরকার লোক জমায়েৎ হয়েছে তার চেয়েও বেশী। তাই অনেকেই আগামীকালের নাচের ও গানের মহড়া দিচ্ছে —অতিথি অভ্যাগতেরা যাতে তারিফ করে—নিয়েঙ্গেবুল এসেছে দেখে তাদের সে কী উৎসাহ, হৈ হৈ করে তারা ডেকে আনতে গেল নিয়েঙ্গেবুলকে। আগে আগে ফিবারেই এর কাছ থেকে শিখে নিয়েছে নতুন নতুন নাচের কায়দাকানুন, এবারে শিখতে পাবে আরো অভিনব কিছু। কিন্তু শ্যালিকার দল ছাড়বে না তাদের প্রাণের জামাইবাবুকে—আগে তাকে প্রাণ ভরে খাওয়াবে, তারপরে জানতে চাইবে কার জন্যে এনেছে কি-কি উপহার। ওইসব সৌখীন অলংকার পরেই তো কালকের উৎসবে হাজির হবে শ্যালিকারা।

শেষপর্যন্ত শ্যালকদের মধ্যে দুজন এসে অনুরোধ করে জামাইবাবুকে— 'পায়ে পড়ি জামাইবাবু, আপনার এই শ্যালিকারা আর শ্যালক-বৌয়েরা খানিকটা পরেই না হয় উপহার নেবে। এখন চলুন ছেলেদের মধ্যে—ওরা ডাকছে।'—এই বলেই কিনা কয়েকজনে ওকে হাতে হাতে তুলে ধরে উপরে, চারদিকের বিজয়-চিৎকার হৈ হৈ আর হাসিঠাট্টার মধ্য দিয়ে বয়ে নিয়ে আসে তরুণ নাচিয়েদের আসরে। এবং সবাই নাচতে থাকে মহা তাণ্ডবে—ওকে ঘিরে ধরে। আঙ্গিনার মধ্যের অনেক মেয়েছেলেও—যাদের হাতে কাজ নেই —তারাও যোগ দিল এই আনন্দের ভাগ নিতে। দেখতে না দেখতে লোকে লোকারণ্য হয়ে গেল সমস্তটা জায়গা।

শ্যালিকারা কি আর করে, জামাইবাবুকে কাছে না পেয়ে এবারে বরং আরো উৎসুক হয়ে ওঠে—সবার জন্যে কি কি জিনিস এনেছে তাই দেখবার জন্যে। এক-এক জনে ভাবছে—এবারে কী এনেছে আমার জন্যে, আর সেটা হাতে তুলে দেবার সময় দুষ্টু-দুষ্টু কী রসের কথাই না বলবে রসিক জামাইবাবু। সত্যিই, সকলেই বড় ভালবাসে তাদের এই ছোট জামাইবাবু নিয়েঙ্গেবুলকে। ওদিকে সবাই যখন নাচের গানের মহড়ায় মশগুল, মেয়েরা খুলে খুলে দেখতে লাগল কি কি সৌখীন জিনিষ আছে ভিতরে। কিন্তু একি একেকবারে উপরেই এটা যে একটা পাখীর ডানা? আর, সেটা কিনা উড়তে লাগল ওদের মাথার উপরে চক্কর মেরে। সবাই তো আহলাদে চিৎকার করতে লাগল—কি মজা, কি মজা! জামাইবাবু এবারে তাজ্জব লাগিয়ে দিল এই কেরামতিটা দেখিয়ে। কিন্তু একী, আর তো ডানাটা নেই! এবার কী ভয়ংকর

গান গাইছে একটা পাখী। মেয়েরা আতঙ্কে দাঁড়ায় জড়াজড়ি, চোখ বড় বড় করে শুনতে থাকে ঃ

নিয়েঙ্গেবুল খুন করেছে সোহাগী বউকে,
মৌমাছিদের পিছুপিছু সে-ই খুঁজে পেয়েছিল মউ।
সবটা মউই খেয়ে ফেলেছে—রাখেনি স্বামীর ভাগ,
স্বামী তাকে তাই কবর দিয়েছে সঙ্গে উৎসব-সাজ,
দেখেনি তো বান্দানাটা পড়ে আছে পথমাঝ।

—এই শুনে কারো মুখেই কথা সরে না। তারপর দেখে কি, ঝুপ করে একটা ডানা এসে পড়ল তাদের সামনে। না, না, এটা তো পাখীর ডানা নয়। এ যে সোহাগীর মাথার বান্দানা!

ওদিকে আঙ্গিনায় তখন নাচগান আর হৈ-হুল্লোড়, আঙ্গিনায় তখন হাস্যরোল আর হাততালি। আঙ্গিনায় তখন নিয়েঙ্গেবুলের উদ্দেশে নানারকম জয়ধ্বনি ও প্রশংসা-বাণী। এখানকার এই আনন্দের আসর থেকে নিঃশব্দেই এবাড়ীর ছেলেদের একে একে যখন ডেকে নেওয়া হল ভিতরের ঘরে—কেউই তা দেখেও দেখল না। কেউ দেখল তো ভাবল উৎসবের দিনে কতরকমে প্রয়োজনেই তো ডাক পড়তে পারে।

নিয়েঙ্গেবুল তখন শেখাচ্ছিল একটা নতুন রকমের গান, আর ঠিক তখনি পড়শীদের মধ্যে দুজন বয়সীলোক এসে জানাল বাড়ীর ভিতরে তাকে ডাকছেন গুরুজনেরা। নিয়েঙ্গেবুল ভাবল এখানে এসে গুরুজনদের সঙ্গে দেখা করেনি, তাই ডেকে পাঠিয়েছেন। সে বলল—'এখুনি যাচ্ছি, আমার ঘর থেকে পোশাকটা বদলে আসি।' ও'রা বললেন—'না, তার দরকার হবে না। আগে ঐখানে যাও।'—এবং হাত এগিয়ে দেখালেন বেশ উ'চুর দিকে পাথরের একটা পুরানো বাড়ী, চারদিকটা উ'চু দেয়ালে ঘেরা। বেশ জমকালো এক ভাঙ্গা-ভাঙ্গা বাড়ী—নিয়েঙ্গেবুলের শ্বশুরের পূর্বপুরুষদেরই বাড়ী ছিল এককালে।

প্রবীণেরা তার পাশে পাশে এগিয়ে গেলেন কয়েক পা, তারপর থেমে পড়ে আবারো নির্দেশ দিলেন উ'চুতে দাঁড়িয়ে-থাকা ঐ বাড়ীটার দিকেই। কে সেখানে চাইছে তাকে? বিস্মিতই হয় নিয়েঙ্গেবুল। হয়ত তার শ্যালকেরা তার সাহায্য চাইছে ওখানে? হয়ত বা বাড়ীর মধ্যে বাড়তি অতিথিদের জায়গা দেওয়া সম্ভব নয়, তাই ব্যবস্থা হচ্ছে ওখানে থাকবার? কিন্তু ও বাড়ীটার কাছে আসতেই জায়গাটা এত ভয়ঙ্কর নির্জন মনে হ'ল যে ওখানে কারো দেখা পাওয়ার কথাই ওঠে না।

দরজাটা ঠেলে ভিতরে ঢুকল—সমস্ত শরীরের রক্ত যেন হিম হয়ে এল।

ভিতরেই অপেক্ষা করছে তার সমস্ত আত্মীয়স্বজন—তার স্ত্রীর বাবা-মা, তার বাবা-মার ভাইয়েরা ও তাদের স্ত্রীরা, তার স্ত্রীর বোনেরা ও তাদের স্বামীরা, তার স্ত্রীর মায়ের ভাইয়েরা ও তাদের স্ত্রীরা, তার স্ত্রীর মায়ের বোনেরা ও তাদের স্বামীরা, তার শ্যালকেরা ও তাদের স্ত্রীরা, তার স্ত্রীর ভাইর স্ত্রীরা ও বোনেদের স্বামীরা, তার শ্যালিকারা—সকলেই দাঁড়িয়ে আছে নিঃশব্দ গম্ভীর। বাড়িটার ঠিক মাঝখানে নতুন করে খুঁড়ে রাখা হয়েছে একটা কবর। উপরে খুঁড়ে-তোলা মাটির উপর রাখা হয়েছে সেই থলেটা—যার মধ্যে করে নিয়েঙ্গেবুল উপহার নিয়ে এসেছে তার শ্যালিকাদের জন্যে। আর, পাশেই রয়েছে মোটাসোটা সেই ছাগলটার দেহ—সেই উৎসবের প্রথামতো তার দেয় বিশেষ ভেট। নিয়েঙ্গেবুলের মুখ দিয়ে বেরুচ্ছিল ভাঙ্গা ভাঙ্গা অস্ফুট কথা, কিন্তু সে কথায় কান দিচ্ছিল না কেউই। শ্বশুর এবার আঙ্গুল তুলে কাউকে ইশারা করলেন থলেটার দিকে। তিনি শুধুমাত্র বললেন —'ওটা খোলো।'

নিয়েঙ্গেবুল থলেটা তুলে ধরল—খুলল, কিন্তু হাত-পা কাঁপাতে লাগল। থলেটা পড়ে গেল নিচে। মোটুসীটার ডানাটা অমনি উড়ে গিয়ে ঘুরতে লাগল সকলের মাথায় উপর দিয়ে—গাইতে লাগল সেই একই গান। আর গানের সেই ভয়ানক কথাগুলি শেষ হতেই পড়ে গেল নিয়েঙ্গেবুলের পায়ের পাশে—তার খুন-হওয়া বৌয়ের মাথার সেই বান্দানা। নিয়েঙ্গেবুল ওইদিকে একবারমাত্র দৃষ্টি ফেলে তার শ্বশুরের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল পরবর্তী নির্দেশের জন্যে। কিন্তু তার শ্বশুর মুখ ঘুরিয়ে নিলেন ওর দিক থেকে, ইঙ্গিত করলেন তার বড়বোনকে। উনি এগিয়ে এলেন, উপহারের থলেটা তুলে ধরে ফেলে দিলেন কবরের মধ্যে। গৃহকর্তা এবার ইঙ্গিত করলেন তার বড় দুই ছেলেকে। ওরা দুজনে এগিয়ে গিয়ে তুলে ধরল মোটাসোটা সেই ছাগলটাকে, ফেলে দিল কবরের মধ্যে।

এবারে সেই পরিবার-প্রধান—নিয়েঙ্গেবুলের সেই শ্বশুর ইঙ্গিত করলেন তাঁর ও তাঁর ভাইর সব ছেলেদের দিকে। তারা এগিয়ে এসে চারদিকে থেকে ঘিরে ধরল নিয়েঙ্গেবুলকে। মেয়েরা সবাই ঢেকে রাখল মুখ, কিন্তু পুরুষেরা সবাই তাকিয়ে রয়েছে কঠিন দৃষ্টিতে—যা ঘটতে যাচ্ছে তার প্রত্যেকটিই দেখছে চেয়ে চেয়ে। তারা সবাই ঠেসে ধরল নিয়েঙ্গেবুলকে, কিন্তু সকলেই বিস্মিত হয়ে যাচ্ছে এই দেখে যে নিয়েঙ্গেবুল একটুও বিচলিত হল না—ভয়ে কুঁকড়ে উঠল না। সবাই দেখছে নিয়েঙ্গেবুলকে যখন মাটিতে ঠেসে ধরা হচ্ছিল, তখনো সে একটুও বাধা দিল না,—এমন কি জোরাজুরিও নয়। সবাই দেখছে—কয়েকজনে তার পা দুটো বেঁধে তার উপরেই চেপে বসল, এবং আর

কয়েকজন দুটো হাত দুদিকে টেনে ধরে বসল তার উপরে। কিন্তু সে একটুও নড়ল না! সবাই দেখছে—তার দুই বড় শ্যালক একযোগে হাত বাড়িয়ে যখন তার গলাটা চেপে ধরল, তখনো সে একবারো গোঙানি দিয়ে উঠল না!

দুজন লোক এবার লাফিয়ে নামল কবরের মধ্যে—নিয়েঙ্গেবুলের নিঃসাড় দেহটাকে উপর থেকে ফেলে দিতেই ধরে ফেলল। সবাই এবার তাকিয়ে'আছে কবরের দিকে। চারজন লোক তার দেহটাকে চিৎ করে ফেলল, এবং তার পাশেই রাখল তার উপহার-সামগ্রীর থলেটা। হঠাৎ তখন সকলেই দেখে একটা পাখীর ছেঁড়া ডানা ঝটপট উড়ছে কবরের উপর! চারজন লোক তাদের কঠিন কর্তব্য সমাপন করে যেই উপরে উঠে এল, সবাই দেখে—ঐ উড়ন্ত ডানাটা ধপ্ করে পড়ল নিয়েঙ্গেবুলের বুকের উপর—বুকের উপর পড়তেই হয়ে গেল তা সোহাগীরই মাথার বান্দানা। আর, সকলেই অবাক হয়ে দেখতে থাকল—নিয়েঙ্গেবুলের হাত দুখানা তখন তার দেহের দুপাশটা থেকে উঠে আসছে আস্তে আস্তে, বান্দানাটাকে চেপে ধরে রাখছে তার বুকে—হৃৎপিণ্ডের উপর!

তার শ্যালকেরা ও শ্যালকের ভাইবোনের ছেলেরা একের পর এক কোদাল হাতে দাঁড়িয়ে গেল কবরের চারপাশে। একে একে ফেলল এক এক কোদাল মাটি। কিন্তু—তার ঐ নিশ্চল দেহটাকে মাটি দিয়ে ঢাকবার আগে একবার এক মুহূর্ত মাথা নিচু করে রাখল সকলেই। কারণ, সকলেই স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিল মৃত নিয়েঙ্গেবুলের হাত দুখানা তখনো বুকে চেপে রেখেছে তার সোহাগীর মাথার বান্দানাটা!

কার গুণ বেশী

দুজন অচেনা লোক ঢুকে পড়ল এক গাঁয়ে। সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে, প্রথামতোই গাঁয়ের সর্দার এগিয়ে এসে অভ্যর্থনা জানালে ওই লোক দুটি রাতটা কাটাবার মতো একটা আশ্রয় চাইল। সর্দার বললেন—আপনারা অতিথি আগন্তুক। আপনাদের আমি সাদর অভ্যর্থনা জানাচ্ছি। আমার অতিথিশালায় অবাধে ঘুমোতে পারবেন, কিন্তু ঘুমের মধ্যে নাক ডাকালেই মৃত্যুদণ্ড। এটা মনে রাখবেন। কারণ, নাক ডাকালে ঘুমের মধ্যেই তাকে হত্যা করা হবে।'—এই বলেই গ্রামসর্দার ওদের দুজনকে নিয়ে এলেন অতিথিশালায়, ওরাও সব দেখে রাতের মতো বিশ্রামের জন্য গা এলিয়ে দিল।

ওদের দুজনে বেশীক্ষণ ঘুমোয়নি, তার মধ্যেই একজনে নাক ডাকাতে শুরু করল—ভোঁস, ভোঁস, ভোঁস! —সঙ্গীটি অমনি ধড়ফড় করে জেগে উঠল—শুনছে ভোঁস ভোঁস ভোঁস নাকডাকার শব্দ। আর সেই সঙ্গেই শুনতে পেল ঘস্ ঘস্ ঘস্। হ্যাঁ, ও তো ছুরি শানাচ্ছে গাঁয়ের লোকেরা! সঙ্গীটি বুঝল—ওরা তো নাকডাকানো সঙ্গীটিকে খুন করবে এখুনি। বন্ধুকে কী করে বাঁচানো যায় তাড়াতাড়ি তার একটা ফন্দী এঁটে ফেলল। বন্ধুটি নাক ডাকাচ্ছে আর সঙ্গীটি গেঁথে ফেলছে একটা গান ঃ

ভোঁস ভোঁস ভোঁস
বেড়ে দিলখোশ
ভোঁস ভোঁস ভোঁস!
এসেছি সড়ক ধ'রে—
এসেছি এ শহরে,
ভোঁস ভোঁস ভোঁস!
পেয়েছি ঠাঁই ঘরে,
পেয়েছি পরিতোষ।
ভোঁস ভোঁস ভোঁস
ভোঁস ভোঁস ভোঁস!

খুবি জোরালো গলায় গেয়ে চলল সঙ্গীটি—আর সেই আওয়াজে চাপা পড়ে গেল নাকডাকানোর শব্দ। লোকজন ফেলে রাখল তাদের হাতের ছুরি —শুরু করল দল বেঁধে নাচ, বাজতে লাগল মাদল আর ঢাক। সবাই ঐ গানটিই গলায় ধরে নিয়ে গাইতে গাইতে বাইরে এল। গাঁয়ের সবাই—মেয়েরা কাচ্চাবাচ্চারা মরদেরা আর মধ্যখানে সর্দার—নাচ শুরু করে দিল সমানে।

সারাটা রাত একজন আগন্তুক কিনা নাক ডাকিয়ে চলল, আর একজন গান গেয়ে। আর, গাঁয়ের সমস্ত লোকজনই নাচতে লাগল আর গান-বাজনা চালাতে লাগল।

সকালবেলায় ফের সড়ক ধরার আগে বিদেশী লোক দুজন এল সর্দারের কাছে বিদায় নিতে। সর্দার ওদের যাত্রাপথে জানালেন বহুৎ শুভেচ্ছা, আর ওদের উপহার দিলেন বেশ বড়সড় আকারের একটা থলে। বললেন—'তোমাদের চমৎকার ওই গানের জন্যে কিছু টাকাকড়ি। এই তোমাদের দুজনের কল্যাণেই আমরা সকলেই রাতটা কাটিয়েছি বেশ আমোদে আহলাদে। সত্যিই কৃতজ্ঞ আমরা।'

গাঁ থেকে চলে গেল ঐ বিদেশী লোক দুজন। সড়ক ধরতেই তারা শুরু করল যুক্তিতর্ক ঃ টাকাটা এখন কিভাবে ভাগাভাগি হবে? নাকডাকানো লোকটি বলল—'বড়ো ভাগটা তো হওয়া উচিত আমারি। আমি যদি নাক না ডাকাতাম তো তুমি গানও বাঁধতে না, কোনো পুরস্কারও পেতে না।' অন্য সঙ্গীটি বলল—'ঠিক কথা, তুমি যদি নাক না ডাকাতে তো আমি গান বাঁধতাম না, কিন্তু আমি যদি গান না করতাম তো তুমি যে খুন হ'তে। লোকজন তো ছুরি শানাতে শুরুই করে দিয়েছিল। কাজেই আমারি হওয়া উচিত বড় ভাগটা।'

—এভাবেই ওরা যুক্তিতর্ক চালাতে লাগল, কিন্তু কোনোই সমাধানে আসতে পারল না। তুমি কি বলতে পারো সমাধানটা কী?

স্বামীরূপে বরণ করবে কাকে

এক সময়ে ছিল তিন বন্ধু—সকলেই বণ্টুকু গাঁয়ের তরুণ যুবক, আর এদের প্রত্যেকেই পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে পেয়েছে এক-একটি তাজ্জব যাদুশক্তি। একজনের ছিল একটা আয়না—তার মধ্যে সে তার ইচ্ছেখুশি দেখতে পেত যে কোনো জায়গা বা যে কোনো মানুষকে। দ্বিতীয় যুবকটির ছিল যাদু-পালকের এক পাখা। পাখাটি তুলে ধরলেই এক মুহূর্তে সে চলে

যেতে পারত যেখানে খুশি তার। তৃতীয় যুবকটির ছিল এক আশ্চর্য গোলাপ-গুচ্ছ, সেটি কোন মৃতের উপরে কেবলমাত্র তিন-তিনবার দোলালেই মৃত বেঁচে উঠত তক্ষুনি।

এখন এই যুবকদের প্রত্যেকেই ভালোবাসত নুসিয়াকে—গ্রামের সর্দারের সুন্দরী মেয়েটিকে। ওরা তাকে বিয়ে করতে চাইলে সে জানিয়ে দিল—'না, আমি তোমাদের কাউকেই বিয়ে করব না। চেহারায় তোমাদের পুরুষই বলতে হবে, কিন্তু এখনো তোমরা ঠিক পুরুষ নও। উল্লেখ করবার মতো তেমন কিছুই তো কেউ করোনি এখনো। তোমরা এখনো পরীক্ষাই দাওনি। তা, তোমাদের মধ্যে কে যে আমাকে সবচেয়ে ভালোবাসো জানি না আমি। তোমরা যখন কোনো নজির দেখাতে পারবে, একজনকে বেছে নেব।'

ওই যুবক তিনটি তখন বণ্টুকু থেকে যাত্রা করল এক অন্তরীপে—সাগরতীরে। সেখানেই কোনো কাজ নিয়ে নিজেদের যোগ্যতা আয়ত্ত করবে। কাজেই ওরা যেতে যেতে পেঁছিল এসে অন্তরীপে সাগরতীরে। সেখানে এসে তিনজনে থাকতে লাগল একই সঙ্গে। প্রতিদিন কাজকর্মের শেষে সন্ধ্যাবেলা প্রথম এক যুবক তার আয়নাটা বার করে দেখতে থাকত ছেড়ে-আসা বণ্টুকু গ্রামের দৃশ্য আর তাদের সুন্দরী নুসিয়াকে, আর দুই বন্ধুকে শোনাত কি কি সে দেখেছে।

একদিন সন্ধ্যাবেলা ঐভাবেই আয়নায় দেখে কি—মরে গেছে নুসিয়া। তার বাবার ঘরের খোলা বারান্দায় শুইয়ে রাখা হয়েছে তার মৃতদেহ, আর তাকে ঘিরে ঘিরে শোক করছে বাড়ীর লোকজন। যুবকটি অমনি আর্তকণ্ঠে বলে উঠল—'ভাইসব, আমাদের নুসিয়া আর বেঁচে নেই। তার বাবার ঘরের সামনের বারান্দায় শুইয়ে রাখা হয়েছে তার মৃতদেহ, আর সবাই কেবল কান্নাকাটি করছে। এই জায়গা ছেড়ে এক্ষুনি আমরা চলে যাব বণ্টুকু—যোগ দেব শোকে, কবরের মধ্যে নামিয়ে দেব আমাদের নুসিয়াকে।'—এই বলেই সে কাঁদতে লাগল, কাঁদতে লাগল তার দুই বন্ধুও।

বাড়ীতে যাবার জন্যে ওরা প্রস্তুত হচ্ছে, এমন সময় দ্বিতীয় তরুণটি সেই প্রথম তরুণটিকে বলল—'আমাদের যেতে যেতে তো দেরী হয়ে যাবে, শোক-মিছিলে যোগ দেবার আগেই তো নুসিয়াকে কবর দেওয়া হয়ে যাবে। তোমরা যদি ওর মুখখানি শেষবারের মতো দেখতে চাও তো, তোমরা দুজনেই বেশ শক্ত করে জড়িয়ে ধরো আমাকে জামাশুদ্ধ—কখনো ছেড়ে দেবে না কিন্তু।'

প্রথম ও তৃতীয় দুই বন্ধু তখন ওর জামা জড়িয়ে ধরল বেশ শক্ত হাতে, আর দ্বিতীয় বন্ধুটি মাথার উপরে মেলে ধরল তার যাদুপাখাটি। আর দেখতে না দেখতেই তিনজনেই এসে পেঁছিল বণ্টুকুতে—নেমে দাঁড়াল তাদের প্রিয়তমা নুসিয়ার মৃতদেহের পাশে। আর তখন, এই তৃতীয় বন্ধুটি বার

করল তার গো-পুচ্ছের যাদুটি। তিন-তিনবার সেটা সে দোলাতে লাগল মেয়েটির নিশ্চল দেহের উপর, আর মুখে বলতে লাগল—'নুসিয়া এবার ঘুম থেকে জাগো, নুসিয়া!' অমনি কিনা পলক ফেলতে না ফেলতেই জেগে উঠল নুসিয়া— সে যে মরে গিয়েছিল তা বুঝবারই জো নেই!

এবারে শুরু হল জোর নাচগান আমোদ-আহলাদ। তিনটি যুবকের প্রত্যেকে তাদের মধ্য থেকেই একজনকে স্বামীরূপে বরণ করবার জন্যে আর্জি জানাল। তারা বলল—'আমরা আমাদের যোগ্যতা প্রমাণ করেছি, আমরা দেখিয়েছি আমাদের প্রাণের ভালোবাসা। এখন নুসিয়া, তুমিই বলো আমাদের মধ্যে কে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছে এবং ভালোবাসাকে উঁচিয়ে তুলেছে— কাকে তুমি বিয়ে করতে চাও?'

নুসিয়া, তিন যুবক, কি বুড়োটুকুর সব লোকজন—কেউই একমত হতে পারল না কাকে বিয়ে করা উচিত নুসিয়ার। বলতে পারো সমাধানটা কোথায়?

কার বাহাদুরী সবচেয়ে বেশী

এবারে তিন যুবকের এক গল্প। সারাটা দেশ জুড়ে তাদের নাম রটে গিয়েছিল মহামল্লবাজ, মহাতীরন্দাজ আর মহামনবীর—যার যেটাতে দক্ষতা। এই যুবক তিনটি বাস করত একই গ্রামে, আর তাদের ভাবী কনেরা বাস করত কিছুটা দূরেই আর এক গাঁয়ে। তিন যুবকই একদিন রওনা হল সেই গাঁয়ে —যে যার কনেকে এবার ঘরে নিয়ে আসবে। পথে পড়ে একটা ছোট নদী। তা, পার হতে বিশেষ কোনো অসুবিধেই হল না—জল প্রায় শুকিয়েই উঠে-ছিল। তারপর সেই মেয়েদের গাঁয়ে পেঁৗছে নাচগানে খানাপিনায় বেশ কেটে গেল কয়েকদিন। পাঁচদিনের দিন যে যার কনেকে নিয়ে ফিরে চলল নিজেদের গাঁয়ে।

কিন্তু অবাক কাণ্ড, নদীটা কানায় কানায় উপচে উঠেছে—ছুটে চলেছে জোর উজানে। ওরা বলাবলি করতে লাগল—'যখন এই স্রোতটা পেরিয়ে গেলাম জল তো ছিলই না বলতে, তাই পার হয়ে গেছি সহজেই। কিন্তু এখন তো স্রোতটা দেখছি যেমন চওড়া তেমনি কানায় কানায় ভরপুর। আর কী দুরন্ত স্রোত! মেয়েদের নিয়ে তো পাড়ি দেওয়া অসম্ভব। এখন কী করা যায়? প্রথমে একজন বলল—'না, ফিরেই যেতে হবে।' কিন্তু অন্য দুজন তাতে রাজি নয়, তারা বলল—'না, ফিরে যাব না।'

তখন স্থির হল ওই তিন সঙ্গীদের এক একজন তার বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগ

করেই পার হতে চেষ্টা করবে। এবং স্থির হল প্রথমেই চেষ্টা করবে ওদের মধ্যে যে মহামনবীর অর্থাৎ কিনা যে মনের মহাবলে বলীয়ান। মহামনবীর অমনি করল কি হাঁটু গেড়ে বসে মনে মনে প্রার্থনা করেই তার হাতের লাঠিটা দিয়ে প্রচণ্ডবেগে আঘাত হানল স্রোতের উপর, আর অমনি কিনা দুভাগ হয়ে দুপাশে সরে গেল জল—দেখা দিল মাটি! আর মহামনবীরও অমনি তার কনেকে নিয়ে চলে গেল ওপারে। সঙ্গেসঙ্গেই আবার ভরে উঠল নদীটা—আগের মতোই টইটম্বুর।

এবার মহাতীরন্দাজের পালা। সেও সঙ্গেসঙ্গেই তার তূণ থেকে লম্বা লম্বা তীরের পর তীর বার করে ধনুকে লাগিয়েই ছুঁড়ে দিল একের পর এক—একের পর এক সারি বেঁধে ওপারে। সঙ্গেসঙ্গেই সে তার কনেকে দুহাতে তুলে ধরেই তার উপর দিয়ে বিদ্যুদ্বেগে ছুটে গেল ওপারে। ছুটে যেতে যেতে তীরের পর তীরের জোড়মুখ খুলে খুলে সেগুলো ভেসে চলে স্রোতের বেগে।

এবারে বাকী রইল শুধু মহামল্লরাজ আর তার কনেটি। কীভাবে সে যে ওপারে যাবে কিছুই বুঝে উঠছে না। এরকম সেরকম—যে রকমেই চেষ্টা করুক না সফল হয় না। ক্লান্তিতে বসে পড়ল—রাগে ফুলে উঠতে লাগল। তারপর হঠাৎ সে তার কনেটিকে এক মল্লবাজের কায়দায় আঁকড়ে ধরেই লাফিয়ে উঠল উপরে। উঠতে উঠতে নেমে পড়ল ওপার ছাড়িয়েও অনেকটা দূরে।

—এরা সবাই তো নদী পার হল, কিন্তু যে উপায়ে নদী পার হল তাতে কার কেরামতি সবচেয়ে বেশী? বলতে পার—কার?

ছেলে কার?

মাভুঙ্গুর সবদিকেই ভালো যাচ্ছিল তার গাঁয়ে, আর তাই সহজেই বিয়ে করে ফেলল গাঁয়েরই দু-দুটো মেয়েকে। তাদের নাম হল কেঙ্গি আর গুঙ্গা। বেশ ভালো একখানা জমি সমান দুভাগ করে মাভুঙ্গুর দিয়ে দিল দুই বউকে। যার যার জমিতে বউয়েরা বেশ মেহনত করে চাষবাস করত—ফসল ফলাত নানারকম ভুট্টা, ওকরা, বাজরা, কাসাভা। তাই খাবারের আর অভাব রইল না। দুই বউ একই বাড়ীতে থাকত বটে, কিন্তু এ ওকে দুচোখে দেখতে পারত না। আর দুজনেরই দেমাক ছিল খুব—নিজেরটা নিয়ে।

একদিন গুঙ্গার কিছু ধান দরকার রান্নার জন্যে, কিন্তু তৈরী ধান নিজের জমিতে না পেয়ে তুলে আনল কেঙ্গির জমি থেকেই। কেঙ্গির কাছে ব্যাপারটা

ধরা পড়তে সে কবুল করল গুঙ্গা—অন্যের জমিতে ঢোকাটা তার খুবই অন্যায় হয়েছে। তবে, সঙ্গেসঙ্গেই সে এটুকুও বলল যে তারা দুজনেই তো একই স্বামীর স্ত্রী—সতীন হলেও একসঙ্গেই তো খাওয়া-দাওয়া করছে। কিন্তু কেঙ্গি ওসব কথা শুনতে রাজি নয়। শেষ পর্যন্ত একটা ব্যবস্থায় রফা হল, নিজের জমি ও ঘর থাকবে একমাত্র যার-যার তারি—সেখানে যাই জন্মাক না তার অধিকারও হবে একমাত্র ওই জমির মালিকেরই। এরপর থেকে দুজনেই মিলেমিশে থাকতে লাগল মন্দ না।

তারপর একদিন হল কি, দুই বৌ যখন যার যার জমিতে কাজ করছে, কেঙ্গির মনে হল তার বাচ্চা হতে বেশী সময় নেই আর। এসময় তামাক-পাতা খুঁজতে লাগল, কিন্তু খুঁজে না পেয়ে চাইতে গেল গুঙ্গার কাছে তার জমিতে। আর ঐ সময়েই গুঙ্গার জমিতে জন্ম নিল কেঙ্গির ছেলে।

গুঙ্গা তাড়াতাড়ি ছেলেটাকে দুহাতে তুলে নিয়ে পরিষ্কার করে। বাচ্চাটার গায়ে মাখিয়ে দেয় তেল—এসময় যা যা করার সবি করল খুবি দরদ দিয়ে। কেঙ্গি একটু সুস্থ হয়েই কথা বলতে পারল—'সত্যিই গুঙ্গা, তুই সবি করেছিস আমার জন্যে। আমার ছেলের জন্যে তুই এমন দরদের সঙ্গেই সব করেছিস—ছেলেটা ঠিক যেন তোরি।'

গুঙ্গাও অমনি বলে উঠল—'হ্যাঁ, ছেলেটা তো আমারি। মনে করো আমাদের মধ্যের চুক্তিটা। আমার জমিতে যে ছেলে জন্মেছে সে ছেলে তো আমারি। না, একে আমি দেব না।'

কেঙ্গি বহু অনুনয় বিনয় করল, হাতে পায়ে ধরল—খুবি কান্নাকাটি করল। কিন্তু গুঙ্গা ছাড়বার নয়। শেষ পর্যন্ত ঠিক হল—বেশ, দুজনেই যাবে শহরের আদালতে, সেখানে গিয়ে জানাবে যার যার আর্জি। এখন মানিলম্বি—যিনি বিচার করবেন—সুবিচারের জন্য তাঁর ছিল দেশজোড়া ডাকনাম। তাই গুঙ্গা ও কেঙ্গি দুজনেই ভাবছে—বিচারটা হবে তার নিজেরি অনুকূলে। তারপর মানিলম্বি এসে আসনে বসতে দুজনেই পায়ের কাছে রাখল যার যার ভেটের জিনিষ। মানিলম্বি প্রথমে কেঙ্গিকে বললেন তার আর্জি পেশ করতে।

কেঙ্গি বলল—'আমি জন্ম দিয়েছি আমার ছেলেকে, আর গুঙ্গা কিনা তাকে কেড়ে নিয়েছে। আমার পেটেই বাচ্চাটা ছিল, আমিই সহ্য করেছি প্রসব-যন্ত্রণা, তাই ছেলে তো আমার। না, আর কিছুই বলবার নেই আমার। এতে ওর যদি কিছু বলবার থাকে বলুক না।'

গুঙ্গাও অমনি জবাব দিল—'ছেলেটা আমার। আমার জমিতেই জন্ম নিয়েছে। এর আগে একবার কেঙ্গির জমি থেকে কিছু ধান তুলে এনেছিলাম, তাই নিয়ে গণ্ডগোল হয়েছিল, এবং শেষ পর্যন্ত দুজনেই মেনে নিয়েছিলাম—

কারো জমির কিছু অন্য কেউ আমরা নেব না, কারো জমিতে যদি কিছু জন্মে তবে তার অধিকারেও অন্য কেউ হাত বাড়াব না। এখন, আমার জমিতে কেঙ্গি এলে সেখানেই জন্মেছে ছেলেটা, তাই ওই ছেলে আমার—আমারই সম্পত্তি ও। কেঙ্গি ওর নিজের কথামতোই ছেলেকে নিতে পারবে না।'

মানিলম্বি সবটা মন দিয়ে শুনে রায় দিলেন কিন্তু গঙ্গার পক্ষেই: হ্যাঁ, গঙ্গা তার অধিকার দাবী করেছে সঙ্গতভাবেই—ছেলেটা গঙ্গারই।

—তবে অনেক লোকেই মানতে চাইছিল না মহামান্য বিচারকের এই সিদ্ধান্ত। তারা বলাবলি করছিল—ছেলেটি কোথায় জন্মেছে সেটা কথার কথা, কোন্ মায়ের গর্ভ থেকে জন্ম নিয়েছে সেটাই আসল কথা। বিচারক মানিলম্বির বিচারের যৌক্তিকতা আজো অনেকেই মানতে চাইছে না। এক্ষেত্রে তোমার বিচারটা কিরূপ?

লেখক ঃ ওবি এগ্‌বুনা

ওবি এগ্‌বুনা নাইজেরিয়ার তরুণ লেখক হলেও ইতিমধ্যেই দেশবিদেশে পরিচিত হবার সৌভাগ্য লাভ করেছেন। তাঁর 'Emperor of the Sea' নামক গ্রন্থের তিনটি সুদীর্ঘ গল্পের অন্যতম একটি গল্পেই গ্রন্থটির নাম। গল্প-কাহিনীটি বৃটিশ বেতার-সংস্থা (B. B. C.) কর্তৃক প্রচারিত হবার ফলে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে দেশে দেশান্তরে। আমার এই কিশোর শ্রেষ্ঠগল্প সংকলন-গ্রন্থের প্রয়োজন মতো গল্পটির কিছু কিছু অংশ বাদ দেওয়া হয়েছে প্রথমদিক থেকে। গল্পটি আফ্রিকার জনজীবনের সঙ্গে গ্রথিত বহু প্রাচীন কাহিনীরই একটি—নীতিবোধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যবোধ এবং সংযত সারল্যের সুন্দর পরিচয় বহন করছে। আধুনিক কথা সাহিত্যিকের ভূমিকায় লেখক প্রাচীন কাহিনীকেই প্রকাশ করেছেন এক মৃত্যুমুখী সুপ্রাচীনার দরদী কণ্ঠে। যথোচিত মর্যাদায়ই কাহিনীটিতে দেখা দিয়েছে বর্ণনাভঙ্গীর জীবন্ত সৌন্দর্য, নীতিবোধের দৃঢ় প্রতিষ্ঠা এবং সেইসঙ্গেই গণতান্ত্রিক অধিকার-চেতনা। গ্রন্থটির অন্য দুইটি গল্প—'তিনটি জীবনের কাহিনী', 'নদী কথা বলতে পারে না'। সব কটিই অপূর্ব সুন্দর—কাহিনী-চাতুর্যে এবং বর্ণনা-সৌন্দর্যে।

নীল দরিয়ার শাহানশা

'আমার স্বীকার করতে দ্বিধা নেই, দিদিমা—পুরাণে উপাখ্যানে আমাদের প্রাচীন মনীষীরা যে ধরণের জীবনধারার কথা তুলে ধরেছেন বর্তমানে তা পালটে গেছে অনেকটাই।'—এই বলে দীর্ঘদেহী এক আগন্তুক তরুণ রুগ্না বৃদ্ধার দুইগালে সাদরে হাত বুলোতে লাগল আলগোছে, মুছে দিতে লাগল তার দুইগালে নেমে-আসা অশ্রুধারা, হাত বুলিয়ে মসৃণ করে দিতে লাগল বলীরেখাগুলি।

মৃত্যু-শয্যাশায়ী সদাশয়া সেই বৃদ্ধা বললেন—'করুণায় ভরা তোমার

মন, তাই তোমাকে আমি এমন কিছু প্রতিদান দেব যেমনটা কোনো মানুষই পায়নি কখনোই। তোমার দুর্লভ সহৃদয়তার প্রাপ্য তো দুর্লভ পুরস্কারই।'

'কিন্তু দিদিমা, আমি তো কোনোকিছুই পাবার যোগ্য নই।'

একটুখানি কাশির আওয়াজের সঙ্গেই বৃদ্ধার মুখে দেখা দিল কেমন চাপা হাসি, তিনি বলে উঠলেন—'না, তুমি ভুল বুঝেছ, যুবক! আমি কোনো পার্থিব প্রতিদানের কথা বলিনি, আর তা দেবার মতো আমার সামর্থ্যও নেই।'

'তাহলে কী রকম পুরস্কারের কথা বলছেন?'—আগন্তুক সেই যুবকটি এবার যেন আরো বিব্রত।

'একটি কাহিনী।'—বৃদ্ধার দাঁত-পড়া দুই মাড়ি জুড়ে দেখা দিল হাসির ক্ষীণ আয়োজন।

যুবকটি ভাবছিল—এককালে এই বৃদ্ধা নিশ্চয়ই ছিলেন অনিন্দ্য সুন্দরী, ত্রিশ বছর আগেও ওই বলীরেখামুক্ত মুখের হাসিতে আলো হয়ে উঠত অন্ধকার, এবং যে কোনো লোকেরই চোখে পড়ত সেই হাসির আলো। মুগ্ধ যুবকটি জিজ্ঞেস করে এবার—'কী রকম কাহিনী, দিদিমা?'

'যে কাহিনী দুনিয়ার সবসেরা—শত শত বৎসরে বলা হয় অমন একটিই শুধু, এমনটাই সেই যাদু-কাহিনী। আশী বছরের উপর আমি আমার বুকের মধ্যে পুষে রেখেছি সেই কাহিনী। আর, সেই প্রাচীন-প্রাচীনাদের মতো বলতে পারি একমাত্র আমিই। আল্লাই নিশ্চয় পাঠিয়ে দিয়েছেন তোমাকে। সেই কাহিনী আমি যে বুকে করেই কবরে নিয়ে যাব তেমনটা করার তো কোনোই অধিকার নাই আমার। চলে যাবার আগেই দুনিয়ার কাছে পরিশোধ করে যেতে হবে আমার ঋণের বোঝা···'

বুড়ীমা এবার খাঁকারি দিয়ে গলা পরিষ্কার করে নিলেন, তারপর অন্য আর কোনো কথায় না গিয়ে শুরু করলেন। তখন মনে হল কাঠঠোকরা আর প্যাঁচাদেরও প্রকৃতি বুঝি পালটে গেল। চুপ করে রইল তারা, টুঁ শব্দটিতেও কণামাত্র বাধা না ঘটে তাই। যে কাহিনীটি তখন বুড়ীমার মুখে বিবৃত হল তা এইরকম ঃ

কোনো একসময় এখান থেকে বহু বহু দূরে—উদিরাজ্যের কালো কালো পর্বতমালা পেরিয়ে বাস করত দুই ভাইবোন—ইজা ও ইজাদি। মায়ের সঙ্গেই থাকত তারা পাহাড়ের মাথায় এক কুঁড়েঘরে। বাবা নেই—মারা গেছে যখন তারা এই এতটুকু শিশু। বড়ই গরীব, তবে তারা ছিল খুবি ভালো পরিবারের সন্তান, বুকের ভিতরে স্নেহ-ভালোবাসাও ছিল খুবি। অভাবের ব্যথাটা যে কেমন হাড়ে হাড়ে জানা ছিল তাদের, তাই এর উপরে ভালোবাসারও অভাব থাকুক— এটা তারা চাইতই না···

ইজা ও ইজাদি আর তাদের মাকে নিয়ে সেই ছোট্ট পরিবারে অভাব অনটনটা যে কী রকম ছিল তা কেউ ভাবতেই পারবে না। তবু তারাই যে ছিল স্নেহে-প্রেমে কতখানি ভরপুর, কত সুন্দর, কত ভালোবাসবার মতো—সেটাও কেউ ভাবতে পারবে না। সম্পত্তি বলতে ছিল তো ছোট্ট একটুকরো জমি। আর তাতে মা ও ছেলেমেয়ে মিলে কী হাড়ভাঙ্গা খাটুনিই না খাটত—কোনোরকমে দুমুঠো খাবার জোগাড় করবার জন্যে। কিন্তু সেই বলভরসাটুকুও তো যেতে বসেছে, কারণ রোদপোড়া পাহাড়ের ঢালু যে জমিটুকুতে যেখানে তাদের ক্ষেত, সেখানে ইঁদুরের উৎপাতে সাবাড় হয়ে যাচ্ছে ফসল—গরীবদের খাবার বজরা। ···তাই এমনকি একবেলার খাবার জোগাড় করাটাও তাদের পক্ষে দুঃসাধ্য হয়ে উঠল।

এমন দুর্দশা হলে হবে কি, ইজা ও ইজাদি ছিল এ অঞ্চলে সকলের কাছেই বিশেষ পরিচিত দুই বিখ্যাত ভাইবোন। তাদের সুনাম ছিল সকলেরই মুখে মুখে—হাটে-বাজারে দেশে-দেশান্তরে সাতসাগর পেরিয়ে। তাদের এত সুনামের এক বিশেষ কারণ হ'ল তাদের অপরূপ সৌন্দর্য। আকাশের এপারে ইজার মতো সুঠাম সুন্দর যুবক আর তো ছিল না। আর ইজাদি? সৃষ্টির সেই উষাকাল থেকে আজ পর্যন্ত এমন সৌন্দর্য-প্রতিমা আর কখনোই তো নেমে আসেনি স্বর্গ থেকে মাটিতে।···এই দুই ভাইবোনকে ভগবান যে এমন সুন্দর রূপ দিয়ে পাঠিয়েছেন তারো একটা কারণ ছিল। কোনো যুবক যদি হাটে-বাজারে দেখা দিয়ে তার রূপ জাহির করত তো সবাই বলে উঠত —'যা যা, বাহাদুরী দেখাতে হবে না। ওর পায়ের পাশেও দাঁড়াবার যোগ্য নস্, ওর আধখানা সৌন্দর্যও যদি থাকত তোর? আর, ওর কাছেই শিখে নিস বিনয় কাকে বলে।' আর, কোনো যুবতী যদি নদীর ঘাটে স্নান করতে এসে তার রূপ দেখাতে গিয়ে একটু বাড়াবাড়ি করে ফেলত তো, লোকজন ঝাঁঝ দেখিয়েই বলে উঠত—'যা যা! খুব দেমাক হয়েছে, না? সুন্দরী সুরূপা ইজাদির সৌন্দর্যের আধখানাও তো নেই তোর! আর, তার কাছেই শিখে নিস সভ্যতা ভব্যতা কাকে বলে।'

কামদেবতার মতো সুন্দর ইজা এগিয়ে আসছে দেখতে পেলেই অল্পবয়সী মেয়েরা তাদের গায়ের ওড়না এমনভাবে টেনেটুনে রাখত যাতে দেখা যায় বুকের লোভনীয় ভাঁজটি, আর ইজা যদি তাদের দিকে তাকিয়ে একটু হাসত তো কাঁপতে থাকত তাদের হাঁটু। অপরূপা ইজাদির অর্থাৎ কিনা ইজার বোন সম্পর্কে একটা কথা রাষ্ট্র হয়ে গিয়েছিল: একবার এক রাজপুত্র ইজাদিকে নদীতে স্নান করতে দেখার পর তার দু'দুটো চোখই অন্ধ করে ফেলেছিল। যেহেতু ওই দেখার পরে ওর চেয়ে নিকৃষ্ট কোনো সুন্দরীকে

দেখার মতো দুর্ভাগ্যই যেন তার না হয়। সারাটা জীবনই ওই অন্ধ রাজপুত্র গানে গানে গুণগান করে বেরিয়েছে ইজাদির সৌন্দর্য। ইজা আর ইজাদির নামে যত গল্পকাহিনী একটুও অবিশ্বাস করত না কেউই। একটিবার মাত্র তাদের রক্তমাংসে গড়া দেহটি দেখলেই সবাই বুঝত অক্ষরে অক্ষরে তা কতখানি সত্যি। ওদের ভালোবাসত সকলেই—একমাত্র একজন ছাড়া, এবং এই কাহিনীর প্রধান চরিত্র সেই। এবারে তার কথায়ই আসছি।

এক ছিল শাহানশা, ওবা নামেই ছিল সে পরিচিত। সে রাজত্ব করত সপ্তসিন্ধু দশদিগন্ত পর্যন্ত। আর যেহেতু সে প্রভুত্ব করত অন্যান্য নবাবদের ও বাদশাদের উপরে—তাই তাঁকে বলা হত শাহজাদাদের শাহানশা। অফুরন্ত ছিল তার ধনদৌলত, আর তার রাজপুরীতে ছিল শত শত মহল। তার বেগম ছিল কমপক্ষে আটশো, আর সন্তান-সন্ততি ছিল অসংখ্য। তার নামে লোকে ভয়ে থরথরি কাঁপত। তার দাপট দেখাতে সে কখনো দয়ার ধার ধারত না। তার চরিত্রে সবচেয়ে বড়ো বৈশিষ্ট্য ছিল ঈর্ষা আর হিংসা—সারাটা দুনিয়ার কোথাও তার আয়ত্তের বাইরে ভালো কিছু থাকবে এটা সে বরদাস্তই করতে পারত না। আর, ওইসব তার দখলে না আসা পর্যন্ত সে স্বস্তি পেত না—এমনকি রাতে ঘুমোতেই পারত না।

তার এক বিশেষ খেয়াল-খেলা ছিল শাহানশাহী ফরমান জারি করে গ্রামবাসীদের বাস্তুচ্যুত করা এবং তাদের বিষয়সম্পত্তি বেদখল করা। কত লোকেরই মাথা সে কেটে ফেলেছে—কেবলমাত্র তাদের বৌদের ছিনিয়ে আনার জন্যেই। এরও পিছনে এক বিশেষ কারণ ছিল—তার অহংকার সবচেয়ে সুন্দরী হবে একমাত্র তার বেগমরাই, তার হারেমে যাকে কিনা সবচেয়ে কুৎসিত বলা যায় তার মতোও যেন থাকে না কেউ কোথাও।

কিন্তু এই মনোভাবের পিছনে ছিল এই বদ্ধমূল ধারণা যে সে নিজেই হল দুনিয়ার সবচেয়ে সুন্দর পুরুষ, একেবারে মদনমোহন। এই শাহানশার সবচেয়ে বড় সুখ ছিল মাসে একটিবার রাজতোরণের পাশে বসে বসে পথের লোকজনদের মুখে মুখে তার রূপের প্রশস্তি শোনা। অন্য সবাইর স্ত্রীরা যখন বুক চাপড়াত—তাদের কেন বিয়ে হয়নি এমন শাহানশার সঙ্গে, সেটা শুনে সে বড়ই মজা পেত, হাসতে থাকত। আর শাহানশাহী ফরমান অমান্য করে কারো স্বামী যদি এতে কোনোরকম অস্বস্তি বা অসন্তোষ প্রকাশ করত তবে তার স্ত্রীই শুধু হাতছাড়া হত না, তার মাথাটাও ধড়ছাড়া হ'ত। কোনো কারো স্ত্রী যখন স্বামীদের বলত 'নপুংসক! ব্যাটা তো নয় মেয়েছেলে', আর শাহানশাকে বলত কিনা 'দুনিয়ার সবসেরা শক্তিমান পুরুষ', 'কামদেবতার আদলেই গড়া', 'স্বর্গ থেকে সদ্যই নেমে এসেছে'— এসব শুনে তখন

শাহানশা অট্টহাসিতে ফেটে পড়ত হোঃ হোঃ হোঃ, হাঃ হাঃ হাঃ। তার সঙ্গেই সমর্থনের হাসি হাসতে হ'ত ঐ স্বামীদেরই। গানের পর গান ও গাথার পর গাথা গাওয়া হত এই দুনিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ শাহানশা ওবা-র প্রশস্তিতে।

আর তারপর একদিন—সেদিনটা চিরদিনই মনে রাখবার মতো শাহানশার। এক দূত ছুটতে ছুটতে এসে উপস্থিত হল স্বয়ং শাহানশার সামনে এবং মেঝের উপর সাষ্টাঙ্গে লুটিয়ে পড়ে হাঁপাতে লাগল ক্লান্তিতে এবং ভয়ে,—ভয়ে যা বলতে হবে সেজন্যে। সে বলে উঠল—'মহাশক্তিমান শাহানশা, মহাশক্তিমান শাহানশা! আমাকে মাফ করুন, আমি খারাপ সংবাদ এনেছি।'

'কি রকম খারাপ সংবাদ!'—গর্জে উঠল শাহানশা—যেন গর্জে উঠল এক দানব—'বল্, কী সংবাদ, বদমাশ?'

'মহামান্য শাহানশা!'—দূত বলে ওঠে—'আপনার প্রজাদের মধ্যে শোনা যাচ্ছে ভয়াবহ সব চাপা কথা। সেসব কথা এত পাপকথা যে সেসব কথা আপনার সামনে ফের উচ্চারণ করতেও ভয়ে কাঁপছি।'

'কীসব কথা বলছে আমার প্রজাবৃন্দ? বল্, আদেশ করছি।'

'মহামান্য শাহানশা, মহামান্য শাহানশা!'—ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বলতে থাকে দূতটি—'তারা বলছে আপনি এখন আর সবচেয়ে সুন্দর পুরুষ নন, আর আপনার বেগমরাও আর দুনিয়ার সবচেয়ে সুন্দরী নন। তারা বলছে—এখান থেকে বেশী দূরে নয়, একটা পাহাড়ের উপর এক গাঁ আছে। সেই গাঁ এত নগণ্য যে তার একটা নাম পর্যন্ত নাই—সেই গাঁয়ে থাকে এক ভাই আর এক বোন—ইজা ও ইজাদি। তারা বলছে এমন রূপ কেউ কখনো চর্মচক্ষে দেখেনি—এমন কি আপনি বা আপনার বেগমদের কেউই সৌন্দর্যে তাদের পাশেও দাঁড়ায় না।'

'অ!'—চেঁচিয়ে উঠল শাহানশা, যন্ত্রণা হলে এমনটাই শব্দ করে সে—'মিথ্যে বলছিল, বদমাশ! আমার সামনে এসে আমাকে আর আমার সমস্ত হারেমকেই নিন্দা করেছিস—মিথ্যে চক্রান্তের ফাঁদ পাতছিস, এতবড় দুঃসাহস তোর? হ্যাঁ, এজন্যে তোর যা পাওনা ঠিকই পাচ্ছিস।' আর তক্ষুনি শাহানশার আদেশে কেটে ফেলা হল দূতের জিভ, যতদিন বেঁচে ছিল অমন কথা আর বলতে হয়নি।

তবে, শাহানশা তার মনের সন্দেহ দূর করার উদ্দেশ্যে তার গোয়েন্দা-দপ্তরের প্রধানকে—তার সবচেয়ে বিশ্বাসভাজনকে ডেকে এনে আদেশ দিল: দুনিয়ার গ্রামগঞ্জ ঘুরে ঘুরে সমস্ত লোকজনের মন থেকে স্রেফ উপড়ে ফেলতে হবে ঐ ভাইবোনের অস্তিত্ব বিষয়ে সব রকমের ধারণা। শাহানশা তার শেষকথায়

চিৎকার করে উঠল—'ইজা আর ইজাদিই বটে।' তার গলায় গর্জে উঠল যেন এক বজ্র।

কিন্তু শাহানশার কাছে এ কী দুঃসংবাদ! গোয়েন্দা-প্রধান ফিরে এল একটু বেশী তাড়াতাড়িই—মাত্র তিনদিন পেরোতে না পেরোতেই, এবং দূত-মুখের সেই সংবাদ যে মিথ্যা নয় তা স্বীকার করে নিজেই বরং সুনিশ্চিতরূপে জানাল যে রাজমহলের অদূরেই এক খাড়া পাহাড়ের মাথায় সত্যিসত্যিই বাস করে ইজা ও ইজাদি।

শাহাজাদা জানতে চায়—'তুমি তোমার নিজের চোখে দেখেছ?'

'হাঁ মহামান্য শাহানশা, আমি নিজের হাতে স্পর্শ করে দেখেছি। কারণ, আমি জানতাম যে আপনি তা জানতে চাইবেন।'

শাহানশা তখন জানতে চায়—'আর, তোমার নিজচোখে দেখে নিজের হাতে স্পর্শ ক'রে—বলো বলো আমার বিশ্বস্ত গোয়েন্দা-প্রধান, তারা কি আমার এবং আমার শাহাজাদীদের চেয়েও সুন্দর?'

গোয়েন্দা-প্রধান এবার বুঝতে পারছে না কীভাবে জবাবটা দেবে। যদি সত্যিকথা বলে যে ইজা ও ইজাদি সত্যিই আরো সুন্দর, তবে শাহানশা ও তার হারেমের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করার অপরাধে হারাতে হবে তার জিভ কিংবা মাথাটা। আর যদি মিথ্যে করে বলে যে শাহানশা ও তার বেগমেরাই ঢের বেশী সুন্দর, তবে সবচেয়ে বিশ্বস্ত রাজকর্মচারীর মুখের সেকথাই হবে মারাত্মক কর্তব্যচ্যুতি, এবং শাহানশা ও বেগমদের বিরুদ্ধে বিশ্বাসের অপব্যবহার। যেদিকেই যাবে মহা বিপদ, এবং সুনিশ্চিত রক্তপাত! তাই ফন্দীমতো একটা জবাব খুঁজে নিল সে।

মাথা চুলকোতে চুলকোতে বলল—'মহামান্য শাহানশা, মহামান্য শাহানশা! মনীষীরা যেমন বলেছেন—সৌন্দর্য যদি দর্শকের কামনা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় তো, বলতে হয় আপনি ও আপনার বেগমদের পায়ের পাশেও কেউ দাঁড়াতে পারে না। কিন্তু—অন্য এক মতানুসারে যেমনটা বলা হয়—যথার্থ সৌন্দর্য হল দর্শকের ইচ্ছা-অনিচ্ছা-নিরপেক্ষ, এবং এমনকি তা রূপবান কি রূপবতীরও ইচ্ছা কি অনিচ্ছা-নিরপেক্ষ। এবং এক্ষেত্রে তাহলে বলতে হয়—আপনার মহামান্য রাজকীয় সত্তার এবং রাজমহলের মহামান্যা বেগমবৃন্দেরই দুই প্রতিদ্বন্দ্বী হল ইজা ও ইজাদি। ভয় হচ্ছে, দেশে কিছু গণ্ডগোল ঘটছে, মহামান্য শাহানশা।'

'অ!'—গোয়েন্দা-প্রধানের চতুর কথা থেকে শাহানশার কিন্তু বুঝতে দেরী হল না যে ইজা ও ইজাদি হল কিনা রূপে শ্রেষ্ঠতর সুন্দরতর। আর, সঙ্গে সঙ্গেই জ্বলে উঠল তার ঈর্ষা।

গর্জন করে উঠল শাহানশা—'কাল সকালেই আমার সামনে এনে হাজির করাতে হবে ইজা ও ইজাদিকে।'

সেইরাতে দেশ জুড়ে চলল শুধু নানা ধরনের ভাবনাচিন্তা জল্পনা-কল্পনা। সবাই জানতে চায়—শাহানশা কী করবে ইজা ও ইজাদীকে নিয়ে। ইজাদীকে যদি শাদী করে তো তার এই গর্ব অটুটই থাকবে যে দুনিয়ার সবসেরা সুন্দরীটি হল তারই বেগম। কিন্তু ওর ভাই ইজাকে নিয়ে কী করা হবে—সেই তো থেকে যাবে দুনিয়ার সবচেয়ে সুন্দর পুরুষ। বোনকে শাদি করার পরেই যদি ভাইকে কোতল করা হয় তো দেবতারা ক্রুদ্ধ হবেন। সমস্ত দেশ জুড়ে সকলেই জানে বীর দুমদু তার শ্যালককে খুন করার পর দেবতাদের হাতেই শাস্তি পেয়েছিল কী ভয়ানক।

শাহানশার মনে যে ভয় আছে, আর দেবতাদের সঙ্গে কোনোরকম বিরোধের ব্যাপারেও সে যে যাবে না—এটাও সকলেরই জানা ব্যাপার। আর একটা ব্যবস্থা হতে পারে দুজনকেই খুন করা। কিন্তু ইজা কি ইজাদি—কেউই কোনোরকম অন্যায় করেনি, তাই এহেন কাজ দেবতার চোখে হবে আরো ভয়ংকর অপরাধ। এটা হওয়াটা বরং আরো অস্বাভাবিক। সারাটা দেশ জুড়ে সেইরাতে কেবল ভাব-ভাবনার অনিশ্চিত অস্থিরতা। কেউই এক করতে পারছে না চোখের দুপাতা। একটিমাত্র লোক আছে যার মনে কোনো অনিশ্চয়তা নাই, ঘুমোচ্ছে গভীর ঘুম সূর্যাস্ত থেকে সূর্যোদয়। তারো কারণ হল একমাত্র সেই জানে কী করতে যাচ্ছে সে। ঘুম থেকে ওঠামাত্রই তার মুখে দেখা দিল মৃদু হাসি, আর লোকেরা তা থেকেই আভাস পেল ঘটতে যাচ্ছে ভয়ংকর কিছু একটা······

আর তারপরেই সবাই তো অবাক। শাহানশা কিনা ইজা ও ইজাদিকে সম্বর্ধনা জানিয়ে নিয়ে এল এমন মহাসমারোহে—যেমনটা একমাত্র রাজ-রাজড়াদের ক্ষেত্রেই বিশেষভাবে দেখানো সম্ভব। শাহানশা এবার সমবেত দর্শকদের সামনে ঘোষণা করল—'হে আমার সপ্তসিন্ধু সপ্তভূমির প্রজাবৃন্দ, আমি আমার সাম্রাজ্যের সর্বোচ্চ পর্বত থেকে সর্বনিম্ন উপত্যকা পর্যন্ত সুবিস্তৃত সমস্ত দেশে ঘোষণা করতে চাই যে আজই হল আমার জীবনের সবচেয়ে আনন্দের দিন।'—তার কথাবলার সময় বিরাজ করতে লাগল সে এক নিদারুণ স্তব্ধতা। সে বলে চলল—'অনেক অনেকদিন থেকেই দু'দুটো মুকুট পরে আমার মাথাটা ভারী হয়ে উঠেছে—এক মুকুট রাজপ্রতাপের, আর এক সৌন্দর্যের! আমার প্রতাপ দিনে দিনে যতই বেড়ে উঠছে, আমার ততই মনে হয়েছে সৌন্দর্যের মুকুটটি হয়ে উঠছে বেশী দুর্ভর—বড় বেশী ভারী। আমি কত রাত প্রার্থনা করেছি—কেউ এসে আমাকে ওই ভার থেকে মুক্তি দিক।

এবার আমার সেই প্রার্থনার উত্তর পেয়েছি। ঐ ইজা ও ইজাদিই হ'ল আমার প্রার্থনার উত্তর। ওরা দুজনে এসেছে—আমাকে আর আমার বাদশাহী হারেমের বেগমদেরকে সৌন্দর্যের রাজা আর রাণীর মুকুট পরার কষ্টকর দায়িত্বটা থেকে অব্যাহতি দিতে।

আমার কৃতজ্ঞতা দেখাবার জন্যে আমি স্থির করেছি প্রতিদানে ওদের দেব তিন-তিনটি পুরস্কার। প্রথমটা : আজ থেকে পূর্ণিমাকাল পর্যন্ত তারা যা যা কামনা করবে বাদশাহী সরকার কর্তৃক সে সবই পূর্ণ করা হবে।'

তখন সমবেত জনগণের সে কী উল্লাস-ধ্বনি!

'দ্বিতীয়টা হল—যেহেতু ইজার চুলকাটার পদ্ধতিটা এই দুনিয়ার সবসেরা, এখন থেকে সেই নিযুক্ত হল—শাহানশার একান্ত পরামানিকের পদে। আর ইজাদি—যেহেতু তার আঙুলগুলি মোলায়েম ও সুন্দর, সে তাই এখন থেকে আমার ঘামাচি খুঁটবে।'

লোকজনের এবার আরো উচ্চ জয়ধ্বনি। শাহানশা বলেই চলেছে—'এবং শেষটায় এই সবকিছুর উপরের কথা হ'ল আজ রাতেই আমার প্রাসাদে ইজা ও ইজাদিকে আহ্বান করা হচ্ছে এক বিশেষ ভোজোৎসবে—রাজকীয় ভোজসভা-কক্ষে রাজকীয় খানাপিনায়। শাহানশাহী ফরমান মতোই আমার এই নির্দেশ।'

রাজকীয় ঘোষণার উল্লাসে এবার উচ্চ জয়ধ্বনিটা এতই উঁচুতে উঠল যে পাখপাখালিরাও গাছ থেকে ঝটপট উড়ে গেল ঝাঁকে ঝাঁক আকাশে বাতাসে। মনে হল ঝঞ্ঝায় ছড়িয়ে পড়ল রাশি রাশি শুকনো পাতা—চোখের সামনে ঢাকা পড়ল সমস্তটা আকাশ। শ্রোতাদের মধ্যে অনেক মেয়ে তো আবেগের চাপে চেঁচাতেই লাগল, আর সমস্ত লোকজনই রাজকীয় এই মহাবদান্যতা দেখে একেবারে বিমুগ্ধ। কারণ, এটা এই শাহানশার চরিত্রের সঙ্গে মেলেই না। তা, দর্শকদের মধ্যে প্রাচীন লোকেরাই শুধু বলতে পারে—শাহানশার মুখের হাসিটির কী অর্থ! শিকারের দেহে দাঁত বসিয়ে খুন করবার আগে রক্তচোষা বাদুড়ের ভাবখানা হয় যেমনটা, শাহানশার মুখের হাসির তুলনাটা চলে একমাত্র তারি সঙ্গে। যত বেশীক্ষণ ধরে ঝিকমিক করতে থাকে তার দাঁতগুলো, ততই অপমৃত্যু ঘনিয়ে আসতে থাকে অসহায় শিকারের দিকে···

ইজা ও ইজাদির প্রথম বিস্ময়কর অভিজ্ঞতাটা হ'ল সেইরাতেই—তারা রাজকীয় ভোজকক্ষে ঢুকেই দেখল টেবিলে খাবার সাজানো রয়েছে কেবলমাত্র তাদের দুজনের জন্যেই! তখনি মহামান্য শাহানশার কাছ থেকে এই সংবাদ পরিবেশিত হ'ল—'অতিথিরা যেন আপন ঘরের মতোই সুস্থ ও স্বাভাবিকভাবে খানাপিনা করে—দিলখোস বাৎচিৎ করে।' তাদের

সামনে একমাত্র তৃতীয় মানুষটি ছিল সুন্দরী রাজকন্যা স্বয়ং—সেই পরিবেশন করছিল অতিথিদের। আর, ইজা ও ইজাদি ভাবছিল—রাজকন্যা নিজেই পরিবেশন করে, এ কেমন অদ্ভুত ব্যাপার।

কিছুক্ষণ তারা তো ভয়ে দিশেহারা—সারাটা জীবনে কখনো এমন জাঁক-জমক এত অলৌকিক সৌন্দর্য তারা তো কখনোই আর দেখেনি। আর তাদের সামনে যা খাদ্যসম্ভার তেমনটা আকাশের এপারে কী করে যে তৈরী হতে পারল তা তারা বুঝতেই পারছে না। এত তার সুস্বাদ এত তার বৈচিত্র্য, এত রকমফের, এত সাজসজ্জার বাহাদুরী! আহা, কথা দিয়ে তা প্রকাশ করা যায় না। এমন দৃশ্যমাত্র দেখলেই তো জিভে জল এসে যায়। কিন্তু ইজা ইজাদির মনে হচ্ছিল—স্বর্গের এক ভোজসভায় অতিথি হিসাবেই যেন আমন্ত্রিত হয়েছে তারা, আর এক দেবদূতই এসেছে যেন আপ্যায়নের ভার নিয়ে। তবে, এমন ভয়ও তো তারা কোনোদিনই পায়নি আর।

তারা অবিশ্যি খেতে লাগল। মসলাদার খাবার আর সুরার প্রভাবে ক্রমেই তাজা হয়ে উঠল মন। তালরসে বিশেষ ভাবে তৈরী সুরাটা হ'ল এতই মধুর এতই কড়া ও এতই স্বাদু যে সারাটা দুনিয়ায় তার তুলনা মেলা ভার। তারা যতই সেই সুরা পান করতে লাগল ততই হতে লাগল মাতাল। সুরার যাদু লাগানো উপাদানগুলি সোজা ঢুকে যেতে লাগল মগজের ভিতর—আলগা করে দিল জিভের বাঁধন। গরমের দিনে দেখতে না দেখতে যেমন শুকিয়ে যায় গায়ের ঘাম, তেমনি উবে গেল ভব্যতা-সভ্যতা কি লাজলজ্জা। তারা হাসতে লাগল হি-হি-হি, চিৎকার করতে লাগল উন্মাদের মতো। তারা কথা বলতে লাগল যতটা জোরে পারে—যদিও তারা ছিল এত কাছাকাছি যে ফিসফিস কথা বললেও শুনতে পেত ঠিকই। আর, দেখতে দেখতে অবস্থাটা হয়ে উঠল খারাপ থেকে আরো খারাপ।

তারপর ওরা কী যে করছে জানবার আগেই ইজাদি—দুজনের মধ্যে যে কিনা সবচেয়ে বেশী উত্তেজিত, সে হঠাৎ লাফঝাঁফ মারতে মারতে তার দাদাকে বলছিল গলা ছেড়ে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে—'আহা আহা! কী ভোজ রে। বাহা বাহা, বাহারে কী ভোজরে! এরকম আর একটা ভোজ খেতে পেলে আমি তো সাধ করেই মাথাটা পেতে দিই জহলাদের খড়্গের তলায়!'

আর ইজা—সেও তার বোনের দেখাদেখি লাফাতে লাগল—মাতাল ঝড়ের উল্লাসে। কিন্তু যে শাহাজাদী তাদের আপ্যায়ন করার জন্যে উপস্থিত, খাদ্যের চেয়েও তার সৌন্দর্যের দিকেই ইজা যেহেতু আকৃষ্ট হচ্ছিল আরো বেশী ('কারণ মদমত্তার একটা বিশেষ স্তরে জিভের চেয়েও অন্য অঙ্গের পরিতৃপ্তির দিকেই আকাঙ্খা জাগে আরো বেশী)—শাহজাদীর দিকে ইজা তাই কামনালোলুপ

দৃষ্টিতেই অপলক তাকিয়ে থেকে বলে উঠল—'আঃ কী সুন্দর! কী সুন্দর! একটি রাত যদি এই সুন্দরীর সঙ্গে একশয্যায় শুতে পাই তো সানন্দেই আমি মাথাটা পেতে দিই জহ্লাদের কাছে।'

কিন্তু ইজা ও ইজাদি এটা জানত না যে শাহানশার ব্যবস্থামতোই একজন গুপ্তচর দরজার আড়াল থেকেই শুনে নিল সব, এবং সোজা ছুটতে ছুটতে শাহানশার কাছে এসে বলে দিল প্রত্যেকটি কথাই। আর এজন্যে সেই সংবাদদাতা যে মোটা পুরস্কার পেল বলাই বাহুল্য, কারণ সবকিছুই ঘটে যাচ্ছে ঠিক শাহানশার পরিকল্পনা মতোই।

শাহানশা এবার সঙ্গেসঙ্গেই আদেশ দিল ইজা ও ইজাদিকে তার সামনে হাজির হতে। ইতিমধ্যেই সভাপ্রাঙ্গণে সমবেত হয়েছে সমস্ত লোকজন। মহামান্য শাহানশা এবার ঘোষণা করল—'হে আমার সপ্তসিন্ধু সপ্তভূমি পরিব্যাপ্ত প্রজাবৃন্দ! সর্বোচ্চ পর্বত থেকে সর্বনিম্ন প্রান্তর পর্যন্ত সুবিস্তৃত আমার সমস্ত রাজ্যের কাছে আমি ঘোষণা করতে চাই যে আজ হল আমার এই জীবনের সবচেয়ে মর্মান্তিক দুঃখের দিন।'—ভয়াবহ স্তব্ধতার মধ্যে বলতে লাগল শাহানশা—'তোমাদের সকলের সামনে আমি আজ সকালেই স্বর্গ মর্ত সাক্ষী রেখে এক গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা করেছিলাম। তাতে আমি বক্তব্য রেখে-ছিলাম—আজ থেকে পূর্ণিমা-কাল পর্যন্ত ইজা ও ইজাদির প্রতিটি ইচ্ছা পূর্ণ করা হবে সরকারী নির্দেশেই।'—লোকজন নড়ছে না পর্যন্ত, কারণ তারা অনুভব করছে মারাত্মক কিছুই আসছে এর পরে। শাহানশা বলে চলল—'তোমাদের সকলকেই আজ এখানে আহ্বান করার কারণ হল আমি এবার ঘোষণা করতে চাই যে ইজা ও ইজাদি তাদের প্রথম ইচ্ছা প্রকাশ করেছে। ইজাদির সাধ হয়েছে তাকে আর একবার আপ্যায়িত করা হোক ঐ রাজকীয় ভোজে, তারপরে জহ্লাদের হাতেই যেন কাটা যায় তার মাথাটা। আর, ইজার সাধ সে একরাত কাটাবে সুন্দরী শাহাজাদীর সঙ্গে, আর তারপরেই তার মাথাটা কাটা যায় যেন জহ্লাদের হাতে। তারা নিজেরাই বলেছে মনমতো সাধ পূর্ণ হলে তাদের সবচেয়ে আনন্দ হবে।

তোমরা জানো, সেটা আমার ও আমার রাজকীয় হারেমের বেগমদের পক্ষে কতটা বেদনাদায়ক হবে—প্রতাপের মুকুটের উপরেই আবার গ্রহণ করতে হবে ওই সৌন্দর্যের মুকুট, কিন্তু যা হবার তা তো করতেই হবে। যেহেতু ইজাদিই প্রথমে তার ইচ্ছার কথা প্রকাশ করেছে, তার সেই ইচ্ছা কালরাতেই পূরণ করা হবে। সে আজ থাকবে প্রাসাদেরই ভিতরে—থাকবে আমার রাজকীয় অতিথি। কাল সূর্যাস্তের পরেই সে উপভোগ করতে পাবে তার জন্যে প্রদত্ত রাজকীয় ভোজ, এবং অবিলম্বেই ঘটবে তার শিরচ্ছেদ। আর, ইজা যেহেতু ইজাদির

পরেই প্রকাশ করেছে তার কামনার কথা, তাকে বাড়ীতে যেতে দেওয়া হবে তার মায়ের কাছে বিদায় নেবার জন্যে। কিন্তু তাকে সকালবেলায়ই—তার বোনের শিরচ্ছেদ যে সকালে ঘটছে তার পরের সকালেই ফিরে আসতে হবে তার শেষ ইচ্ছা পূরণ করবার জন্যে। রাজপ্রাসাদের একান্ত মহলেই থাকতে পাবে সে সারাটা দিনের রাজকীয় অতিথি—সারারাতও থাকবে সে শাহাজাদীরই ব্যক্তিগত সঙ্গী, এবং রাত্রি ভোর হতেই শিরচ্ছেদ হবে তার। এ সবি আমার বাদশাহী ফরমান।'

পরের দিনই মাথা কাটা গেল ইজাদির।

আর ইজা—একদিন যার এখনো বাঁচার মতো সময় হাতে আছে, সারাটা পথ কাঁদতে কাঁদতে চলে এল মায়ের কাছে, জানাল সব দুঃসংবাদ। আর, সেই পাহাড়ী গাঁয়ে নেমে এল শোকের ছায়া।

কাঁদতে কাঁদতে ইজার মায়ের চোখে যখন আর একফোঁটা অশ্রুও রইল না —ক্লান্তিতে সে ঘুমিয়ে পড়ল কখন। ঘুমের মধ্যে সে এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখল। সে দেখল তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে এক বুড়ো—ঝুলে পড়েছে তার লম্বা দাড়ি, হাওয়ায় হাওয়ায় উড়ছে। সে বলল—'আর কান্নাকাটি করো না, দৈবীবল তোমারি পক্ষে আছে। তোমার মেয়েকে বাঁচাবার জন্যে এখন তো কিছুই আর করা যাবে না—বড়ই দেরী হয়ে গেছে। কিন্তু তাড়াতাড়ি করতে পারো তো তোমার ছেলের ঘাড়টা এখনো জহলাদের খড়্গ থেকে বাঁচতে পারে। শোনো, এখান থেকে সপ্তসিন্ধু সপ্তভূমি দূরে হিয়ালার দিকে আছে শাস্ত্রকথিত সেই পুনর্জীবন কানন। কাছেই আছে এক গ্রাম—নাম আরো-চুকোউ অর্থাৎ কিনা দেবতাদের গর্ব! সেখানে গিয়েই সাক্ষাৎ করতে চাইবে একটি লোকের সঙ্গে—নাম তার চুকোউ-নুটা অর্থাৎ ক্ষুদে ভগবান। কারণ, সে-ই হল এই দুনিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ হেকিম। তারপর কী কর্তব্য সে-ই নির্দেশ দেবে।'

ইজার মা ঘুম থেকে জেগেই ছেলেকে জানাল তার স্বপ্নের বিবরণ।

সুন্দর-কান্তি ইজাও বলে উঠল—'এ এক অলৌকিক ঘটনা, মা। আমিও দেখেছি ঐ একই স্বপ্ন। এ যে স্বপ্নের চেয়েও বেশী-কিছু বোঝা যাচ্ছে স্পষ্টই। এ দৈববাণী!'

'তাহলে আর সময় নষ্ট করে লাভ কী?'—মায়ের কণ্ঠস্বরে বেজে ওঠে আশার সুর, চোখের দৃষ্টিতে আনন্দ,—'চল্, ছুটে যাই।'

সপ্তভূমি সপ্তসিন্ধু পার হয়ে ছুটে চলল তারা, ছুটতে ছুটতে এসে পড়ল সেই গ্রামে, দেখা পেল সেই হেকিমের। সেখানকার গাঁয়ের লোকেরা জানাল উনিই হচ্ছেন চুকোউ-নুটা অর্থাৎ কিনা ক্ষুদে ভগবান—দুনিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ হেকিম।

সেই ক্ষণে ভগবানকে ওরা কোনোকিছু জানাবার আগেই তিনি ইঙ্গিতে ওদের বললেন কথা না বলতে, এবং নিজেই বলে চললেন—'আমি জানি রূপবান ইজা, কেন তুমি ও তোমার মা এসেছ এখানে। তা, জায়গামতোই এসে গেছ তোমরা। হ্যাঁ, ওই শয়তান শাহাজাদার হাত থেকে মর্তের যে মানুষ তোমাকে বাঁচাতে পারে—এই আকাশের তলায় সে কেবল আমিই। কিন্তু একটা মুশকিল আছে।'

'কী মুশকিল ?'—জানতে চায় ইজা।

'ঐ মন্ত্রৌষধ তৈরী করতে হলে কেটে ফেলতে হবে তোমার মায়ের মাথাটা। মন্ত্রৌষধ তৈরী করতে ওটাই কাজে লাগাতে হবে।'

'সেটা কি আমার মায়ের মাথা ছাড়া হবার উপায় নেই ? ওর বদলে অন্যটা হলে হবে না ?'—ইজা যেন বেশ জোর দিয়েই বলতে থাকে।

'না, ইজা।'—হেকিম বলতে থাকেন—'ওটা তোমার মায়ের না হলেই নয়, আর কিছু দিয়েই তা হবে না। কিন্তু ও নিয়ে অযথা তুমি এত ভাবতে যেও না, কারণ তোমার মা মরে গিয়েই বরং তোমার বেশী উপকার করে যাবে। ঈশ্বরের ইচ্ছায় তোমরা দুজনেই আমার এখানে এসে পড়েছ, এবং ঈশ্বরের ইচ্ছায়ই ফিরে যাবে দুজনের একজন। কিন্তু শেষপর্যন্ত আসবে মহাসুখ। সেসময়ে তুমি খুশিই হবে যে আজ এই দিনটায় আমি তোমার মায়ের শিরচ্ছেদ করিয়েছিলাম।'

কিন্তু ইজা ওসব কথা শুনতে রাজি নয়—'আমি নিজেই বরং মরে যাব, তবু আমার মায়ের একগাছি কেশও কাউকে স্পর্শ করতে দেব না। আমরা যদি জানতাম আমার নিরাপত্তার জন্যে এতটা মূল্যই দিতে হবে, তবে এখানে এসে আপনার ও আমাদের সময় নষ্ট করতাম না।'

এবারেই প্রথম কথা বলল ইজার মা—'আমার সোনার চাঁদ, আমার প্রাণের পাখী, তোর চোখের জল মুছে ফ্যাল্। এখন মাথা ঠিক রেখে ভাবার সময়, প্রাণের আবেগে অধীর হওয়াটা এখন নয়। তুই কি বুঝছিস না খোকা, কাল সকালে যদি তোর মাথা কাটা যায় তো, আমি কি সন্ধ্যা পর্যন্তও বেঁচে থাকব ? তুই ও ইজাদি—দুজনের শোকের ভারেই আমি যে মরে যাব তাতে আর সন্দেহ নাই। আর, তখনি যদি মরেও না যাই তো, আমাদের জমিটার ফসল ইঁদুরেই এমনভাবে সাবাড় করে দেবে যে না খেয়ে খেয়েই আমাকে আর বেশীদিন বেঁচে থাকতে হবে না—তিলে তিলে শুকিয়ে শুকিয়ে মরে যাব —পচে গলে পড়ে থাকব। তাই আমি তো মরেই আছি ভাবতে পারিস। ···এখন আমাদের বেছে নিতে হবে—আমার মৃত্যু দিয়ে তোকে বাঁচাব, না

দুজনেই জ্যান্ত ফিরে গিয়ে মৃত্যুর মুখে ঢুকব—আমার পরিবারের নামটা বাঁচিয়ে রাখবার জন্যে কাউকেই রেখে যাব না ?

আমার বেঁচে থাকাটাই তো আমাদের মৃত্যু, আমার মৃত্যুই তো একমাত্র আশা। হেকিম নিজেও তো তাই বলেছেন—মরে গেলেই তো আমি তোর কাজে লাগব। উনি তো এটাও বলেছেন যে ঈশ্বরের নির্দেশমতোই এই এখানে এসে পড়েছি আমরা দুজনেই, কিন্তু ফিরে যাব শুধু একজন, এবং এতে শেষ পর্যন্ত সুখই হবে। আর সেই শুভদিন যখন আসবে, সেদিন একথা ভেবে খুশিই হবি যে তোর মায়ের শিরচ্ছেদ হয়েছিল। আমার সোনার ছেলে, আমার সোনার পাখী, এটা তো বিধাতারই বিধান। সৃষ্টি-কর্তার অভিসন্ধির বিচার করা আমাদের সাজে না। আমি আজ যেমন মরে যাচ্ছি, একদিন তুইও তো তোর রক্তমাংসের দেহটা ছেড়ে চলে আসবি আমার কাছে—সে যতকাল পরেই হোক না। মা ও ছেলের সেই পুনর্মিলনের প্রতীক্ষায়ই থাকব আমরা—এই দুদিনের বিচ্ছেদের কথা ভেবে কেন আর এই বিলম্ব, কেন বা এই অশ্রু ! আকাশের ওপারে গিয়ে সেই পুনর্মিলনের দিন পর্যন্ত—বিদায় নিচ্ছি তোর কাছ থেকে। সোনা আমার, সোনার মানুষের মতোই বেঁচে থাকিস। কখনো ভুলে যাস না তোর মা আজ চলে যাবার সময় ওষ্ঠে নিয়ে যাচ্ছে তোর নাম, বুকে নিয়ে যাচ্ছে তোর ভালোবাসা, আর সারা মুখে বিজয়িনীর আনন্দ। যাদুপাখী বাছা আমার, আমার বুকের শেষ ধুকধুকটুকু দিয়ে তোকে আশীর্বাদ করে যাচ্ছি। হা ভগবান ! তোকে আমি কী যে ভালোবাসি। বুক আমার ভেঙ্গে যাচ্ছে, তবু তবু যা হবার তা হবেই।'—এই কথা বলতে বলতে সারামুখ আলোকিত হয়ে উঠল বিজয়ের হাসিতে আর প্রাণের শান্তিতে। হাওয়ায় বেজে উঠল গান।

ইজার মন তো তখনো সায় দিতে পারছে না—আপত্তিই জানাতে যাচ্ছিল। কিন্তু দেরী হয়ে গেল, কারণ তার মা—সাহসিনী সেই অনন্যা জননী হঠাৎ মেঝে থেকে কোলা-ছোড়াটা তুলে নিয়ে কারো চোখে পড়বার আগেই বসিয়ে দিল নিজের বুকের গভীরে, সামনের দিকে পড়ে গিয়েই শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করল। তখনো মুখে ফুটে আছে সুন্দর হাসিটি। তালপাতারা আনন্দে দুলতে লাগল হাওয়ায় হাওয়ায়। ইজা মায়ের বুক থেকে ছোরাটা তুলে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল একদিকে। ক্ষতস্থান থেকে অনর্গল বেরিয়ে আসতে লাগল রক্ত—ঝর্ণাস্রোতের মতো। ইজা—রূপবান সেই ইজা দাঁড়িয়ে আর দু'চোখে দেখতে পারছে না। তার দু'হাতে মায়ের বুকের রক্ত—যে মা তাঁকে বাঁচাবার জন্যে প্রাণ দিল তারি রক্ত ! ইজা কাঁদতে লাগল বুকফাটা কান্না। হাওয়ারা আছড়ে পড়ে কাঁদতে লাগল তার সঙ্গে।

কিন্তু চুকৌউই-নুটা সেই হেকিম ইতিমধ্যেই শুরু করে দিয়েছেন তাঁর কাজকর্ম—কারণ এখন তো দেরী করার সময় নাই একমুহূর্তও। তিনি কেটে ফেললেন সেই মৃতার মাথাটা—তা দিয়ে তৈরী করে নিলেন এক যাদু-ঔষধ। সেটা তৈরী হতেই ঢেলে দিলেন একটা শিশিতে, ইজার হাতে তুলে দিলেন। এবার সে তাই নিয়ে যাক। চুকৌউ-নুটা বলে দিলেন—'তোমার গায়ের সঙ্গে লুকিয়ে রাখবে। যে রাতে তুমি শাহাজাদীর সঙ্গে শোবে, বিছানায় উঠবার পরেই ওটা খেয়ে ফেলবে। ভুল না হয়। সাবধান থাকবে,— শাহাজাদী তোমাকে যেন খেতে না দেখে। তারপর মাঝরাতে শাহাজাদী যখন গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন থাকবে ধীরে ধীরে বিছানা থেকে উঠে পড়বে, মেঝেতে একটা ভালোমতো জায়গা খুঁজে নিয়ে প্রস্রাব করবে। তারপরেই দেখতে পাবে যা দেখবার।'

আর, তার পরের দিন সকালেই ইজা এসে উপস্থিত হল রাজপ্রাসাদে, গায়ের সঙ্গেই ঠিক লুকানো আছে সেই যাদু-ঔষধটা।

অস্তসূর্য থেকে ঝরে পড়ছ অগ্নিবর্ণ অশ্রুধারা, মেঘেবা আকাশ পাড়ি দিতে দিতে দাঁড়িয়ে আছে টলমল অশ্রু নিয়ে। সারাটা দুনিয়ার সমস্ত দেশই ভয়ে যেন রুদ্ধশ্বাস—কি হয় কি হয়। তেমন হওয়াটা তো অস্বাভাবিক কিছু নয়। কারণ, ইজার মতো সর্বপ্রিয় ও সর্বাঙ্গসুন্দর এক তরুণ কোনো শাহাজাদার ব্যবস্থামতোই জীবন-মরণের শর্ত গ্রহণ করবে—এমন ঘটনা তো আর প্রতিদিনকার ঘটনা নয়।

সত্যিসত্যিই ইজা ও রাজকন্যা সেই ভয়ংকর রাত্রে কি রকম শয়নকক্ষে রাত কাটিয়েছিল সেই বিষয়টা নিয়ে আজো পর্যন্ত এদেশে নানা বিরুদ্ধ মতামত চলিত আছে। কেউ বলে—রাজকীয় শয়নকক্ষটাকেই করে তোলা হয়েছিল একটা কারাকক্ষ। তবে, একটা ব্যাপার সুস্পষ্ট যে ওটা ছিল একটা প্রকাণ্ড কক্ষ এবং তারি মধ্যখানে ছিল একটি সুবিস্তৃত শয্যা। দরজাগুলিতে তালা এঁটে দেওয়া হয়েছিল একের পর এক ছ-ছটা। ভাবখানা এমন যে ইজার পলায়নটা ঠেকাতে রুদ্ধ কারাকক্ষটাই যেন যথেষ্ট নয়! প্রত্যেকটি দরজার সামনেই খাড়া ছিল প্রহরী—সারারাত কড়া নজর রাখবার জন্যে। প্রত্যেকটি প্রহরীরই হাতে ছিল এক-একটা দোফলা-ছোরা—এত লম্বা যে কুমীরের পেটও চিরে দুভাগ করে ফেলা যায়, অন্যগুলি প্যাঁচার ঠোঁটের মতো বাঁকা—এক কোপেই ঘাড় নামিয়ে দেওয়া যায়।

ইজা সেই প্রশস্ত কক্ষে ঢুকেই অবাক হয়ে যায়—শাহাজাদী আগেই শয্যায় শুয়ে আছে ইজাকে বরণ করার জন্যে। সদ্যোজাতের মতোই সম্পূর্ণ নগ্ন সে। স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে ইজা—অপলক তাকিয়ে থাকে, দুচোখে টলমল

করে ওঠে অশ্রু। এই তো সেই নারী—কাল যে তাকে পাগল করে তুলেছিল। এখনো তো সে তেমনি সুন্দরী। গভীর রাত্রির মতোই কমনীয় তার গায়ের রঙ, সুগঠিত কোমরটি বিপুল ঝঞ্ঝায় দুলতে-থাকা রবার গাছের মতোই নমনীয়। তার পরিপূর্ণ স্তন দুটি এত নিটোল—হ্যাঁ, কল্পনাও সেখানে হার মানে। আর তার পা—আহা তার পা দুটি! এত দীর্ঘ, এত অবাক করে দেবার মতো দীর্ঘ যে ওই পা দিয়ে কামনার আবেগে কোনো প্রেমিককে সে অটুটভাবেই জড়িয়ে পেঁচিয়ে বন্দী করে রাখতে পারে তালতন্তুর দড়ির বাঁধনের মতোই···এমনকি মহাশক্তিধর কোনো পুরুষকেও উদ্দাম নৃত্যে মাতাল করে পৌরুষের সব বাঁধনই আলগা করে দিতে পারে—নিঃশেষে তার সব মধুই নিষ্পেষিত করে নিতে পারে।

তা, শাহাজাদীর সৌন্দর্যের সব লক্ষণই তো তেমনি বর্তমান। কিন্তু ক্ষেত্র-বিচারে ইজাকে এখন তো ওসব নিয়ে ভাবতে গেলে চলবে না। তার তো ওদিকে কোনো আগ্রহই নাই এখন—ওকে চাইছেই না সে। অবস্থাটা অন্যরকমের হলে, এহেন রূপবতীকে দেখামাত্রই—এমন মহিমাময় নগ্নরূপ দেখামাত্রই যে কোনো লোকই তো ঝাঁপিয়ে পড়ত দিশেহারার মতো। কিন্তু এখন নিজেকে তার মনে হল জলে-ডোবা একটা কলাগাছের মতো হিম-শীতল। এমনকি বিছানায় উঠে জায়গামতো শোবার সময় হঠাৎ তার হাতখানা রাজকন্যার পাছায় লেগে গেলেও সেই স্পর্শটিও মনে হ'ল হিমশীতল, এবং ব্যক্তিস্পর্শের বহির্ভূত অনুভূতিহীন কিছু। অনেকটা যেন কসাই ও তার ভেড়ার মাংসের মধ্যে সম্পর্ক যেমনটা।

ইজার দিকে তাকাল শাহাজাদী। এই প্রথম ইজার চোখে পড়ল যে শাহাজাদীর চোখেও অশ্রু! মুখখানা ফুলে উঠেছে—যেন কতদিন কতরাত্রি কেঁদে কাটিয়েছে। স্পষ্টতই এবং যথার্থই সে এক অক্ষতযোনী কুমারী। এরকম স্থূল-করুণ ও আত্ম-বিরুদ্ধ পরিস্থিতিতে তার লজ্জার শেষ আবরণটুকুও খুলে পড়বে এই দুর্ভাবনায় সে ভয়ানক ভয়ই পেয়ে গেছে। ইজা তার দুচোখে লক্ষ্য করল শিশুর মতো সারল্য, সতীর মতো পবিত্র ভীরুভাব। তাকে রেহাই দেবার জন্যে কী মর্মান্তিক কাকুতি তার! আনন্দে দুলে উঠল ইজার বুকখানা। এতদিন তার পিছু ফিরেছে মেয়েরা, আর রেহাই দেবার ইচ্ছাটা যে মেয়ে ও পুরুষের পারস্পরিক নয়—সেটাই তো ছিল তার ভয়ের।

চিৎ হয়ে ইজা তাকিয়ে ছিল ছাতের দিকে। ধীরে ধীরে ঘনিয়ে উঠল রাত। ইজা ও রাজকন্যা দুজনেই একেবারে নীরব।

ইজার মাথার মধ্যে এখন ঘুরপাক খাচ্ছে একমাত্র সেই হেকিম চুকোউ-নুটার উপদেশ-নির্দেশগুলি। রাজকন্যা যেই ওপাশ ফিরেছে, ইজাও অমনি গায়ের সঙ্গে বাঁধা যাদু-ঔষধটা বার করেই খুলে নিল—খেয়ে ফেলল সবটা।

যাদু-ওষধটার স্বাদটা লাগল যেন রক্ত আর তালমদ মেশানো মতোই। তবে, একটুখানি মুখবিকৃত করতেও সাহস হল না তার—রাজকন্যা যদি বুঝতে পারে। রাত গভীর হতেই উঠে পড়ল ইজা, রাজকন্যা ঘুমিয়ে আছে ভেবে গুঁড়িসুঁড়ি বিছানা থেকে নেমে পড়তে যাচ্ছিল। কিন্তু একি, রাজকন্যা তো জেগেই আছে—ইজাকে টেনে ধরেছে। কারণ, রাজকন্যাকে আগেই নির্দেশ দেওয়া আছে—সে যেন ইজাকে চোখের বাইরে যেতে না দেয়। ইজা হঠাৎ বিব্রত ও বিমূঢ়, তবু সামলে উঠেই ভাবতে থাকে—এ থেকে বেরিয়ে আসার উপায়টা কী। সে জানে তার হাসিতে ধরা দেবে না এমন সাধ্য নাই কারোই। রাজকন্যার দিকে ফিরে সে তার মধুরতম হাসিটি হেসে বলল—এখনি সে প্রস্রাব করে ফিরে আসছে বিছানায়। ইজার সেই সম্মোহিনী মধুহাসিতে প্রফুল্ল হল সুন্দরী শাহাজাদী—আর সম্ভ্রম জেগে উঠল এই যুবকটির উপর। ইতিমধ্যেই সে তো তাকে নিয়ে যা-খুশি করতে পারত, তবু কিনা ছেড়ে দিল! তাই হাসিমুখেই তাকে যেতে দিল রাজকন্যা। বন্ধুর মতো সেই চাহনির ও হাসির বিনিময়েই যেন মুখোমুখী দাঁড়িয়ে গেল দুটি হৃদয়। যেন ওরা পরস্পর দেখতে পেল ওদের মনের মণিকোঠাটি, আর সেখানেই অকৃত্রিম প্রাণের দুটি আলোক-বিন্দু—যা পুষে রাখলে একদিন জ্বলে উঠবে অতৃপ্ত প্রেমের এক দীপ্যমান পুণ্যশিখা। ইজার সেই মুহূর্তে আকাঙ্ক্ষা হল—শাহাজাদীকে তার দুই বাহুর মধ্যে দুর্দম আবেগে জড়িয়ে ধরে রাখে—মোরগ-ডাকা সূর্যোদয়ে তার শিরচ্ছেদ হবার পূর্বকাল পর্যন্ত। কিন্তু বিবেকের শাসনই তাকে থামিয়ে রাখল। সে লাফিয়ে নেমে পড়ল বিছানা থেকে—যেন দুঃস্বপ্নের কবল থেকেই। আর, হাওয়ায় হাওয়ায় অমনি বেজে উঠল তার মুক্তির সঙ্গীত। কক্ষটার মাঝখানে ইজা একটা সুবিধে-মতো জায়গায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করতে শুরু করল। প্রস্রাবের নির্দিষ্ট পাত্রে নয়, হেকিমের নির্দেশমতোই শয়নকক্ষের মেঝেতে।

ইজা হঠাৎ সবিস্ময়ে দেখে—মেঝেটা গলে যাচ্ছে, তার সামনেটাই ফাঁক হয়ে বেরিয়ে পড়ল একটা গুহা! যেন কোন্ অদৃশ্য হাত হঠাৎ খুঁড়ে বার করল মস্ত বড়ো একটা গহ্বর—তিনজনকে ধরার মতোই বড়ো। চমকে ওঠে ইজা। তার সামনেই গুহাটার ভিতর দিকে দাঁড়িয়ে আছে এক বুড়ী—কী দীর্ঘ. তার ধূসর-রঙ কেশরাশি, সর্বাঙ্গে জড়ানো কালো চাদর, হাতে হাঁটবার লাঠি। চোখদুটো জ্বলছে দুটো আগুনের গোলা—তা থেকে বেরিয়ে আসছে এত তীব্র আলো যে অন্ধকারেও ইজা দেখতে পাচ্ছে সব স্পষ্ট, অন্য কোনোরকম আলোর দরকারই হয় না। বুড়ী তার হাতের লাঠিখানা তুলে ইজাকে নির্দেশ দিল—অবিলম্বেই গুহার মধ্যে লাফিয়ে পড়তে।

আনন্দে নেচে ওঠে ইজার বুক। আনন্দের অট্টহাসি শোনা যায় আকাশে। শাহাজাদীর দিকে একটিবার ফিরে চায় ইজা শেষবারের মতো। কারণ, সে তো বুঝতে পারছে এখনি সে চলে যাবে। কিন্তু শাহাজাদী শুয়ে ছিল—তার দিকে পিঠ, দেয়ালের দিকে মুখ। কারণ সে তো বিশ্বাস করেছে ইজা তখন প্রস্রাব করছে, আর সেদৃশ্য দেখাটা নিশ্চয়ই তার পছন্দমতো কিছু নয়। ইজা আপনমনে হাসে—সে হাসি বেদনামাখা।

'কি নাম তোমার রাজকন্যা?'—জানতে চায় ইজা।

'আমার নাম উয়ান্নে, মাতৃহারা উয়ান্নে।'—জবাব দেয় শাহাজাদী, ভাবে ওই অবস্থায়ও কেউ আলাপ শুরু করে? এটা খুবি বিসদৃশ বৈকি!

'তোমার বাবা তোমার উপরে এমন হীন—এমন লজ্জাকর কাজের ভার দিলেন কি জন্য? তোমার ধর্ম তোমার বংশ-মর্যাদা তোমার আত্মসম্মান—কোনোকিছুর কথাই ভাবলেন না? বাদশা পিতা কি করে তার শাহাজাদী কন্যা—রাজকন্যার সঙ্গেই এমন ব্যবহার করতে পারলেন?'

'তুমি শোনোনি? বাবা আমাকে ঘৃণা করেন! আমার মাকেও ঘৃণা করতেন।'

'রাজকন্যা, তোমার মাকে ঘৃণা করতেন কেন?'

'পিতার অবাধ্য হয়েছিলেন।'

'অবাধ্য হয়ে কি কাজ করেছিলেন?'

'মাকে আদেশ দিয়েছিলেন—পুত্রসন্তান জন্মাতে। কিন্তু মা তার বদলে জন্ম দিল আমাকে। অকথ্য ক্রোধে পিতা ঝাঁপিয়ে পড়লেন মায়ের উপরে—মাকে এমন লজ্জাকর ও অপমানকর শাস্তি দিতে লাগলেন যে শোকে দুঃখে একদিন মারা গেলেন মা। মা যখন মারা যান আমি তো কয়েকদিনের শিশু। হলে কি হবে, আমি তো আমার মায়ের অবাধ্যতার—সেই মহা অপরাধেরই জীবন্ত প্রতিমূর্তি! সেই লজ্জাকর কাজের শেষচিহ্ন-রূপেই তো আমি টিঁকে আছি—পিতা আমাকে সেই দৃষ্টিতেই দেখেন। যে মাটিতে আমি পা ফেলে চলি উনি তা পর্যন্ত ঘৃণা করেন। আর, তাই তো যত অপ্রীতিকর কর্তব্য করবার দায়িত্বটা দেওয়া হয় আমাকেই। ঈশ্বর জানেন, এর আগেও আমাকে বহুরকম অপমানকর অভিজ্ঞতার মধ্যে যেতে বাধ্য করা হয়েছে, কিন্তু কখনোই তো কোনো পুরুষের সামনে নগ্ন হবার নির্দেশ দেওয়া হয়নি—আনকোরা কোনো আগন্তুকের সঙ্গে রাত কাটাবার কথা তো ওঠেই না।'—বলতে বলতে রাজকন্যার দুচোখ বেয়ে নামে অবাধ অশ্রুধারা। আর ঊর্ধ্ব গগনে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে হাওয়ারা।

ইজা দাঁতে দাঁত ঘষে ক্রোধে। হৃৎপিণ্ডটা যেন লাফিয়ে উঠে ধাক্কা মাতে

থাকে পাঁজরে—ঠিক যেন ঝঞ্ঝাঘাতে। গুরুজনেরা বলেন ওটা হল কোনো অপদেবতার বিরুদ্ধে অন্য দেবতাদের দীর্ঘশ্বাস। ইজা ক্রুদ্ধ হলে কি হবে, দুঃখিনী রাজকন্যাকে সাহায্য করার মতো শক্তি তো নাই তার। তাছাড়া, এখন তো কোনো সময়ই হাতে নাই। বুড়ী ওদিকে সেই গুহার তলা থেকে অবিরাম পাগলের মতো ইশারা করছে—অনুরোধ করছে একলাফে তাড়াতাড়ি চলে আসবার জন্যে, কারণ সময় চলেই যাচ্ছে।

'সুন্দরী উয়াম্বে, এখন তোমার সুন্দর চোখের অশ্রু মুছে ফেলো। যা সৎ শেষপর্যন্ত জয়ী হবেই। শেষ বেশ। কিছুকাল অপেক্ষা করো। হ্যাঁ, তোমার জন্যেই অপেক্ষা করছে সুখের দিন।'—এই বলেই ইজা গহবরের দিকে ঝুঁকে পড়েই অদৃশ্য হয়ে গেল।

বুড়ী তার যাদুদণ্ডটি শূন্যে দোলাতেই জোড়া লেগে গেল উপরের ফাঁকটা। কেউ যেন গুহার মুখটা হঠাৎ ভরাট করে ফেলল, আগের মতোই দেখা দিল মেঝেটা। সেই কক্ষে থেকে আর বুঝবার জো নাই যে ওখানেই ছিল মস্তোবড়ো এক গর্ত......

ইজা মহানন্দে দেখে ভূগর্ভের গুহাটা আসলে একটা সুড়ঙ্গের প্রবেশ-পথ। সেই সুড়ঙ্গটা নিশ্চয়ই দুনিয়ার সবচেয়ে লম্বা—কারণ ইজা ও সেই বুড়ী চলতে লাগল তো চলতেই লাগল রাজপ্রাসাদ ছাড়িয়ে, ধারে-কাছের গ্রাম ছাড়িয়ে, শাহাজাদার শাসনের বাইরে। সুড়ঙ্গের অন্য প্রান্তটায় দেখা দিল এক দ্বীপ—এক রামধনু-নদীর ভিতর। এই দ্বীপে দুইপাওয়ালা কোনো প্রাণীই পেঁছিতে সাহস পায়নি কখনোই! লোকজন তফাৎ থাকে এই দ্বীপ থেকে।

পুরাণকাহিনীতে আছে এই দ্বীপটি আসলে এক দেবভূমি—দেবতাদের বিশ্রামস্থান এক নন্দনকানন। এখানে রান্না খাবার ঝুলে ঝুলে থাকে গাছের ডালে ডালে, আকাশ থেকে হয় সুরাবৃষ্টি! আর মাকড়শারা এত সুন্দর সুন্দর পোষাক তৈরী করে রাখে যা কিনা কেবলমাত্র দেবতাদের গায়েই মানায়। কিন্তু দুঃখের বিষয় হল একমাত্র দেবতা হলেই এখানে এই দ্বীপে উপস্থিত হওয়া যায়...খুশিমতো ঘুরে বেড়ানো যায় ধূমকেতু-জাহাজে।...সুড়ঙ্গ-পথে বুড়ী এখানেই নিয়ে এল ইজাকে। কিন্তু যেই তারা এগিয়ে গেল—পিছনেই বুজে গেল পথ, সুড়ঙ্গটিও বন্ধ হয়ে গেল শক্ত পাথুরে মাটিতে। তবে, বুড়ীর চোখের আগুনেই আলো হয়ে উঠল সামনে এগোবার পথ।

ওদিকে রাজপ্রাসাদে রাষ্ট্র হয়ে পড়ল ইজার অভাবনীয় পলায়ন-বার্তা—এক ভয়ার্ত প্রহরী কাঁপতে কাঁপতে এসে বার্তাটা নিবেদন করল শাহানশার কাছে।

'অ !'—চিৎকার করে উঠল শাহানশা—যন্ত্রণা হলে যেমনটা করা তার স্বভাব।—'হ্যাঁ, এর জন্যে পাওনা কিছু ঠিকই দিতে হচ্ছে।'

সেদিন রাতে বাদশাহী ফরমান মতো পাহারা দিচ্ছিল যেসব প্রহরীরা—সঙ্গেসঙ্গেই মাথা কাটা গেল তাদের সকলেরি। আর শাহাজাদী উয়ান্নেকে—সেই মাতৃহারা উয়ান্নেকে সারাজীবনের মতোই বন্দী করে রাখা হল কারাগারে।

তারপর তেরোটা পূর্ণিমা-রাত পার হতে দিলখোস গানবাজনার আর রঙ্গরসের এই উৎসবের দিনে রাজপ্রাসাদের তোরণদ্বার দিয়ে ঢুকে পড়ল অপরিচিত এক আগন্তুক—নতুন এক বিদেশী, শাহানশাহী মেলার মধ্যে মিশে গেল। কিন্তু তার চেহারার স্বাতন্ত্র্যেই আলাদা হয়ে থাকল সে। আরাবা ঝোপের চেয়েও ঘন তার মাথার চুল, মুখভরা দাড়ি নেমে এসেছে ঘাড় ও বুক বেয়ে—ঠিক যেন সিংহের কেশর! তার এলোমেলো চুলের ও উদ্ধত দাড়ির মুখোশ সত্ত্বেও সবাইর কাছেই ধরা পড়ছিল লোকটি আসলে সুন্দর এক যুবক—ছন্নছাড়া কালো মেঘের আড়ালে লুকিয়ে-থাকা পূর্ণিমার চাঁদের মতোই সুন্দর। তার ঐ বিশিষ্ট চেহারা দেখে সবাই তো বিস্মিত, তারা একেবারে অবাক—বন্য বাজপাখীর মতোই এ হেন মানুষটি এল কোত্থেকে? কারণ তারা ঠিকই জানে—ও এখানকার কোনো অঞ্চলেরই নয়!

'আপনার নামটা কি, বিদেশী যুবক?'—জানতে চায় সবাই।

আগন্তুকটি সবাইকেই নীরবে একবার দেখে নিল একটুখানি। যুবকটির দাঁতগুলি দেখা গেল—দুধের চেয়েও সাদা। হাসিমুখে এবার সে বলল—'কাকে কি নামে ডাকা হয় সেটা মোটেই গুরুত্বপূর্ণ কিছু নয়। বেঁচে থেকে সে তার চারদিকের দুনিয়ায় কী পরিবর্তন আনতে পারল সেইটিই দেখবার বিষয়।'

সমবেত ময়দানের জনতা ফেটে পড়ল হাসির উল্লাসে, একে একে আরো অনেক লোকজন ভিড় করে এল এই উদ্ধত বাজপাখীর কথা শুনতে।

তারা জানতে চায়—'দার্শনিক যুবক, তা হলে বলুন—আপনার বেঁচে থাকাটাই বা কী পরিবর্তন আনবে আপনার চারদিকের এইসব মানুষের মধ্যে?'

'বন্ধুগণ, বহুৎ পরিবর্তন! কারণ, আমি এসেছি তোমাদের শাহানশাহাকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহবান করতে। আমি যদি জয়লাভ করি—এবং সেটা আমি করবই, তোমাদের জীবনে আসবে এক বিরাট পরিবর্তন, কারণ তখন তোমরা প্রত্যেকেই হবে যে যার শাহানশা।'

যেন এক বিদ্যুৎ-চমক হ'ল সেই জনতার মধ্যে—কারো মুখ দিয়ে আর কথা সরে না! কেউ আর নড়েও না, কী এক ভয়ে অসাড় হয়ে গেছে সবাই—অসাড় কেবল তাদের জিভই নয়, তাদের প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গও। সেই

ভয়ঙ্কর মুহূর্তে লোকে লোকারণ্য চতুষ্কোণ ময়দানটায় নড়ছে না কেউ। যেন মাটিতেই গেঁথে গেছে সবার পা। আর, স্তব্ধতা এত থমথমে যে একটা প্রজাপতিও যদি সেখানটা দিয়ে উড়ে যেত তো তার পাখা দোলানোর আওয়াজটাকেও মনে হত বজ্রধ্বনি।

শেষ পর্যন্ত সাহসে ভর করে একজন প্রহরী ছুটে এল শাহানশার কাছে, তার সামনে মেঝেতে সাষ্টাঙ্গে শুয়ে পড়েই বলে উঠল—'মহামান্য শাহানশা, মহামান্য শাহানশা! একটা পাগল এসেছে উৎসবের ময়দানে—বলছে আপনাকে সে আহবান করছে কিনা দ্বন্দ্বযুদ্ধে!'

শাহানশা অমনি ময়দানে উপস্থিত হয়েই একবার দেখে নিল লোকজনদের—বুঝে নিল কী ভাবছে সবাই। শাস্ত্রলিখিত প্রাচীন এক দৈব-নির্দেশে এটাই স্থিরীকৃত আছে: শাহানশার কবল থেকে দেশকে যে মুক্তি দিতে পারবে তার মাথাটা হবে তালগাছের মাথাটার মতোই ঝাকড়া, আর গলায় থাকবে একটা দাঁত! শাহানশা দেখছে—সমস্ত লোকজনের চোখ-মুখ আশায় ও উল্লাসে উজ্জ্বল। শাস্ত্রে যে মুক্তিদাতার কথা বলা হয়েছে এই লোককেই তারা ভাবছে সেই লোক…

'মুর্খ, মুর্খের দল!'—গর্জে উঠল শাহানশা, ফেটে পড়ল অট্টহাসিতে। সেই হাসিতে কাঁপতে লাগল পৃথিবী।

'কি দেখে হাসছিস?'—সিংহের মতোই উচ্চকণ্ঠে হাঁক দিল সেই প্রতিদ্বন্দ্বী আগন্তুকটি—কণ্ঠে তার ক্রোধের আওয়াজ।

'আমি হাসছি আমার লোকজনদের মুর্খতায়।'—বলে উঠল শাহানশা—'ওরা ভাবছে তুমিই হলে কিনা ওদের ত্রাণকর্তা! কিন্তু তুমি তো ওদের ত্রাণকর্তা নও। তোমার মাথার বাবড়ি তালগাছের আস্ত একটা মাথার মতোই হতে পারে, গলায় দাঁত কৈ? ঘাড় থেকে তো আর দাঁত গজাতে পারে না।'

'মুর্খ! মুর্খ শাহানশা—সব ভুল। আমার ঘাড় থেকে দাঁত গজাতে না পারে, আমার গলায় এই যে দাঁত!'

সেই দুঃসাহসী বীর যুবক তার বুকখানা খালি করে দেখিয়ে দিল কুমীরের ইয়া-বড়ো একটা দাঁত—ফিতেয় ঝুলছে তার গলা থেকে। আকাশে অমনি শোনা গেল কার খিলখিল হাসি। আর সমস্ত জনারণ্য আনন্দে লাফ-ঝাঁপ মারতে লাগল শূন্যে। লক্ষ সিংহের সমবেত গর্জনের মতো আওয়াজ উঠল—'ত্রাণকর্তা! আমাদের মুক্তিদাতা, আমাদের মুক্তিদাতা!'

দ্বন্দ্বযুদ্ধটার জন্যে আর দেরী করল না শাহানশা! কী যে ঘটতে যাচ্ছে লোকজন ঠিকঠিক বুঝে উঠবার আগেই—কাছাকাছি পাঁচিলটা টপকে এক দৌড়ে সে ছুটে চলল প্রকাণ্ড সাগরের দিকে।

এবার মুক্তিদাতা সেই যুবক প্রকাশ করল তার সত্যিকার পরিচয়—তাদের বলল তার সব কাহিনী।

'ইজা! মুক্তিদাতা! আমাদের ইজা!'—উল্লাসে চিৎকার করতে লাগল সবাই, ইজাকেই অনুরোধ করল তাদের শাহানশা হতে। কিন্তু ইজা তাতে সম্মত নয়, সে বলল—'আমরা শাহানশা কি সম্রাটও চাই না, সাম্রাজ্যও চাই না। আমরা চাই এমন এক সমাজ যেখানে কোনো গ্লানি থাকবে না—যে সমাজের সম্পদ পরিচিত হবে না ধনীদের সংখ্যাধিক্য দিয়ে, বরং নির্ধারিত হবে দরিদ্রদের সংখ্যা কতটা কমে গেল তাই দিয়েই।'

উল্লাসে ফেটে পড়ছে জনতা—উত্তাল হয়ে উঠছে। আকাশে খুশিতে হাওয়ার মাতমাতি।

এক কিম্বদন্তী বলে (আর বহুলোকেই এখনো তা বিশ্বাস করে)—দেবতারা সুন্দর ইজার জন্যে ফের বাঁচিয়ে দিয়েছিল তার মাকে ও বোনকে, এবং মৃত্যুকাল পর্যন্ত সকলে মিলে সুখেই ছিল। ব্যাপারটা আমরা স্বীকার করতেও পারছি না, প্রত্যাখ্যানও নয়। কিন্তু একটা ব্যাপার যে সুনিশ্চিত সত্য তাতে আর দ্বিমত নাই। শাহাজাদী উয়ান্নে—সেই মাতৃহারা উয়ান্নে যেখানে তার পিতার আদেশে কারাগারে বন্দিনী হয়ে ছিল ইজার সেই চলে যাওয়ার দিন থেকে, সেই কারাগার থেকেই ইজা তাকে মুক্ত করে আনল। তারপর আর কি, তারপর যা হবার হ'ল ঃ দুজনেই পরস্পরের ভালোবাসায় ভরে উঠল, এবং তাদের শাদি হল পরের পূর্ণিমাতেই।

সেই শয়তান শাহানশার কি হল? ছুটতে-ছুটতে ছুটতে-ছুটতে সে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল গিয়ে নীল সাগরে। কিন্তু দেবতারা তাকে ডুবে মরতে দিল না—তাকে রূপান্তরিত করে ফেলল মাছে। সবাই যদিও চেনে তাকে মাছেদের মহারাজ তিমিরূপেই, কিন্তু যারা তার আসল ইতিহাসটা জানে আজো তারা বলে—'ও-ই হল সেই ওবা! এখন হয়েছে নীল দরিয়ার শাহানশা।'

লেখক : রেনে মারাঁ

লেখক ফরাসী অর্থাৎ জন্মসূত্রে ফ্রান্সবাসী হলেও মনেপ্রাণে আফ্রিকার জীবনের সঙ্গে তাঁর আত্মিক যোগ, আফ্রিকার লেখক-গ্রন্থমালায় স্বতই ইনি স্থান লাভ করেছেন। এবং নিজে একজন সত্যিকার ধর্মপ্রচারক—খ্রীষ্টীয় মিশনারী বলেই আফ্রিকার জীবনকে দেখতে ও বুঝতে চেষ্টা করেছেন তার সারল্য তার বলিষ্ঠতা ও তার বিচিত্র সংস্কার-সংস্কৃতির মূল্যায়নে। লেখক আফ্রিকার জীবন-চিত্রের নির্ভেজাল একটি পট রচনা করেছেন তাঁর 'বাতোয়ালা' নামক উপন্যাসে। এই উপন্যাসটিই ১৯২১ খ্রীস্টাব্দে লাভ করেছিল "প্রিন্স গণকোর্ট" পুরস্কার।

'বাতোয়ালা' উপন্যাসেরই অষ্টম ও নবম পরিচ্ছেদকে কৌশলে যুক্ত করেছি এই কিশোর গল্প-সঙ্কলনের 'ওকে খুন করব' কাহিনীরূপে—কিছু অংশ বর্জনে, কিন্তু বিকৃত করে নয়।

কাহিনীর প্রসঙ্গ-সূত্রে উল্লেখ্য : বাতোয়ালা হল এক উপজাতির তরুণ সর্দার, তার আট স্ত্রীর বিশেষ একজন হল সবিশেষ সুন্দরী। ইয়াস্‌সি গুইন্‌দ্‌জা নাম। সে অন্য এক তরুণ বিস্‌সিবিঙ্গুই-র দিকে আকৃষ্ট হয়ে পড়ে, তাই বাতোয়ালাকে খুন করার জন্যেই রাত্রিকালে এই সশস্ত্র অভিযান। তবে বাইরে থেকে দেখলে সে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে যাচ্ছে বাতোয়ালারই বাড়ীতে, এবং একা। লক্ষ্য করবার, সেখানেই বাতোয়ালা বিশেষ অর্থবহ এক কাহিনী পরিবেশন করল বিস্‌সিবিঙ্গুইর কাছে, এবং তারপর ঘুমিয়ে পড়ল একান্ত সরল ও নিশ্চিন্ত মনে। বলা যায় যাকে খুন করতে আসা সেখানে সে নিজেই যে খুন হতে পারে, সে ভাবনাও রইল না। [তবে, বাতোয়ালাকে খুন করতে হয়নি। চিতাবাঘের আক্রমণে বাতোয়ালা একদিন যখন মারা যাচ্ছে তখনি বিস্‌সিবিঙ্গুই পালিয়ে গেল সুন্দরী ইয়াস্‌সি গুইন্‌দ্‌জাকে নিয়ে। এবং এটা পরের কথা।]

ওকে খুন করব

যুবক বিস্‌সিবিঙ্গুই অভিযানে চলেছে রাতের অন্ধকারে—নিয়ে, চলেছে তীর ধনুক আর একটা বর্শা—গোড়ার দিকটায় রয়েছে চওড়া এক মস্ত ফলা। দু'দুটো ভোজালিও আছে ছুঁড়ে মারবার জন্যে। আর, তার বাম বাহুর কব্জির তলায় বেল্টে বাঁধা একখানা তলোয়ার।

বিস্‌সিবিঙ্গুই যাচ্ছে তো যাচ্ছে নিঃসীম রাত্রির অন্ধকারে—ভয় নেই তাড়াও নেই, তবে টুঁ-মাত্র শব্দেও চোখ-কান খাড়া সতর্ক। ডান হাতে একটা মশাল। চলেছে তো চলেইছে রাতের অন্ধকার ভেদ করে, কতক্ষণ ধরে চলেছে নিজেই জানে না। ···সামনেই ঘাসবন কোস্‌সো-গাম্বা, তারপর ছোট নদীটা —হাউবাও।

এখানেই নদীটার পাশে এক সর্দার—এক ছেলেপাউস্‌ সর্দার গড়ে তুলেছে এক গাঁও। সড়কটা চলে গেছে সদরঘাঁটির দিকে, তারপর বাম্বা। তারপর ঘাঁটির আস্তাবল, পাশেই সাদা চামড়াওয়ালাদের কবরস্থান। বাম্বার উপর মস্ত বড় পুল চলে গেছে এপার-ওপার—জলের উঁচু দিয়ে। এরপরে ঘাঁটি আর ক্ষেতখামার। সৈন্যাধ্যক্ষের সব্‌জি বাগান, তারপর এক ডেরা। এখানেই রবারের মরশুমে আস্তানা গাড়ে সর্দারেরা।

পাম্বো পার হয়ে সে বাতোয়ালার গাঁয়ের পাশটায় এসে পড়তেই ঢুকে পড়ল একটা নিরালা কুঁড়েঘরে। হ্যাঁ, এখানেই তো থাকত জেলে মাকোদে, আর তার কাছ থেকেই তো বিস্‌সিবিঙ্গুই ঠিক ঠিক জেনে নিয়েছে কোথায় থাকে বাতোয়ালা, আর পথ ধরবার মুখেই মাকোদে ইঙ্গিতে জানিয়ে দিয়েছিল গোপন কিছু সাবধান-বাণী।

কিন্তু ঐ রকম সাবধান বাণীর অস্পষ্টতারই ধরা পড়ল কী মারাত্মক বিপদের মধ্যে এগিয়ে যাচ্ছে সে। তবু আর দেরী করা চলে না। সরাসরি হাত লাগাতে হবে। আর তা যত্‌ত জল্‌দি হয়।

শুরুটায় মনে হয়েছিল, আমন্ত্রণটা না নিলেই হত। তারপর অনেক ভেবেচিন্তে বুঝল—অনুপস্থিতিটাই বরং মনে হবে অদ্ভুত কিছু।

কী ঝুঁকিটাই না নিয়েছি ? বাতোয়ালার মুখোমুখী হতে যাচ্ছি কিনা তারি আপনজনের মধ্যে। ভুল পথ নেওয়াটা কি ঠিক হল ?

তবে ঠিক-ঠিক কাজ তাকে করতেই হবে। কাজ ? কিন্তু কোথায় ? কি ভাবে ?

বাঃ চমৎকার টম্‌টম্‌ বাজছে তো। বাদুড়ের পর বাদুড়, পেঁচা

আর পেঁচা। জোনাকীর মেলা। দূরে দেখা যাচ্ছে আগুন। তারার চুমকি বসানো আকাশ। আর শীতল শিশির! আঃ কী চমৎকার! হ্যাঁ সবি ঠিক আছে। কিন্তু···কোন্‌দিকে এগোব এবার? এই রাতেই যে বিস্‌সিবিঙ্গুই খুন হবে না তা নিশ্চিত। খুন খারাবিটা সবার সামনেই করা হয় না, ঠিকই। কিন্তু কেমন করে মুক্তি পাবে সে বাতোয়ালার কবল থেকে?

হুঁ, একফোঁটা লিকোন্দভ্‌ বিষেই কাজ হবে। বাতোয়ালার খাবার কি পানীয়ের সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া যাবে গোপনে। চিতাবাঘের মতো ঝাঁপিয়ে পড়াটা চমৎকার বটে, 'এস্‌সেপাই' অস্ত্রটা ব্যবহার করাটাও খারাপ-কিছু নয়। কিন্তু এই দুটোতেই তো কিছু-না-কিছু চিহ্ন রেখে দেয়,—বিষ প্রয়োগে তা হয় না।

বিস্‌সিবিঙ্গুই এবার এগিয়ে চলেছে আগুনের লাল আলোর মধ্য দিয়ে। হাওয়ার ঝাপটায় লাফাতে লাফাতে আগুনটা মনে হচ্ছে উঠে যাচ্ছে আকাশে—স্বর্গের দিকে। তার দুই চোখের দৃষ্টি কিন্তু পায়ের দিকেই—গাছের কাটা গুঁড়িতে কি পাথরে হুঁচোট না খায়। ফেলে দিল হাতের মশালটা।

পোয়াম্বার দিকটা থেকেই কী সব ভাবতে ভাবতে চলেছে এগিয়ে। দখলে পেয়ে আগুনে গ্রাস করে চলেছে ঘাসবন। আগুনের জিহ্বা-গুলি লকলক করে পথ করে চলেছে—লাফিয়ে উঠছে ঘুরপাক খেতে খেতে। পাহাড়ের যেসব জায়গায় শুকনো ঝোপঝাড়, আগুন একটু একটু করে তা গ্রাস করে ফেলছে, শত শিখা মেলে,—ঝোপঝাড়গুলো ভূমিসাৎ হলে তবেই ছেড়ে দিচ্ছে, আর যেতে যেতে উজ্জ্বল করে তুলছে অন্ধকার।

কোথায়, কী করে সে খুন করবে বাতোয়ালাকে? সুযোগটা আসার জন্যে অপেক্ষা করবে? না। তাকে উত্তেজিত করবে? হ্যাঁ হ্যাঁ, সেটাই চাই। কিন্তু তা করাটাই তো মুশ্‌কিল।

এবার এক শেষচেষ্টা! একটা ঢিপির মাথায় উঠে সব শিখাগুলিই একসঙ্গে জ্বলে উঠল শেষবারের মতো, আর তা থেকে উঁচিয়ে উঠতে লাগল লাল ও কালো রঙের ধুঁয়ো।

বাতোয়ালাকে সে খুন করবে, নয় তো বাতোয়ালা খুন করবে তাকেই। তা, খুন হওয়ার চেয়ে খুন করাটাই ঢের বেশী স্বস্তির—তাই তো মনে হয়। বিশেষ করে বয়সটা যখন কম—যুবক বয়স, এবং মেয়েরা যখন ধরা দেয় যুবকদের কামনার কাছে।

চারদিকটা তাকিয়ে দেখে বিস্‌সিবিঙ্গুইঃ আগুন আগুন, চারদিকেই আগুন! ঘাসবন জ্বলছে—রাতের হাতে হাতে মশাল।

বাতোয়ালাকে সে আলবৎ খুন করবে। এসো! এবার এসো···শিকার-

দুর্ঘটনা? হ্যাঁ, তেমনটা তো ঘটেই থাকে মাঝেমধ্যে। আর, লোকজন তা সত্যি ভাবে বৈকি। কি? তুমি একটা পশুর দিকে তাক করেই খুন করবে কিনা একটা মানুষকে। তা, সকলের তাকই যে একেবারে লাগসই হয় কে তা বলতে পারে? লক্ষ্যভ্রষ্ট হতে পারে সবচেয়ে পাকা হাতের গুলিও। হ্যাঁ।

আর ঝোপঝাড়ের আগুন? কত অভাগাই তো বছর বছর পুড়ে মারা পড়ে জ্যান্ত। আগুন তো রেহাই দেয় না কোনকিছুকেই, জানেই না কী কাজ করে চলেছে—যাচ্ছেই বা কোন্‌দিকে। কেউ হয়ত কোথাও বহুক্ষণ ঝিমুচ্ছে বনে শিকার করতে এসে, আগুন চলে গেল তারি উপর দিয়ে···কিছুকেই তো রেহাই দেয় না, একমাত্র জল ছাড়া। তা, জলের দিকেও দাউদাউ করে—যদি পারে। ব্যস্‌, চলার পথে সব শেষ।

তাহলে, বনের আগুন, কিংবা শিকার-দুর্ঘটনা।

নাক কুঁচকে গন্ধ শুঁকল। নজর করে দেখল চারদিকটা,—সদা-সতর্ক সমস্ত চেতনা। পথের যে কোনো মোড়েই তো গা ঢাকা দিয়ে থাকতে পারে যেকোনো শত্রু ঃ যে সাবধান সেই বুদ্ধিমান।

আঃ, পিঁপড়ের ঢিবি একটা, আরো একটা, আরো একটা তারি উপর খাড়াখাড়ি। ডানদিকে ঘুরল, কারণ অজস্র ভুঁইফোঁড়ই ইঙ্গিতে দেখিয়ে দিচ্ছে ডানদিকটা। আরো খানিকটা এগোলে নজরে পড়ল তার সামনেই পড়ে আছে কাঁধ-সমান উঁচু একটা ভাঙ্গাডাল, আর তারপরে পায়ের কাছেই একখণ্ড কাঠ, আর তারো পরে ঝোপেরই একটা গাছ। এবার এই পথই দেখিয়ে দিচ্ছে বাঁ দিকটায়। সরু একটি পথ। হ্যাঁ হ্যাঁ, এই পথই তো।

খেঁকিয়ে উঠছে একটা কুকুর। কাউকে অপমান করছে, শাসাচ্ছে। রবার বনে দাউদাউ জ্বলছে একটা মশাল। শোনা যাচ্ছে মাতাল-হওয়া দুটো লোকের গলা। হ্যাঁ, ওই তো বাতোয়ালা, আর তার বুড়ী মা। আর তাদের সঙ্গেই দ্‌জৌমা—খাড়াকান সেই ছোট্ট জিঞ্জার কুত্তাটা।

এসে পড়েছে বিস্‌সিবিঙ্গুই। কিন্তু কী করে সে খুন করবে বাতোয়ালাকে? শিকার-দুর্ঘটনা, না বনের আগুন?

কিন্তু এই মুহূর্তে কি তার আত্মরক্ষার কথাটাই বেশী করে ভাবাটা একান্ত জরুরী নয়? সতর্ক হওয়ার কথাটা আগেভাগে জানতে পেয়েও সরল মনে সে নিজেই এসে ঢুকল কিনা তারি জন্যে পাতা ফাঁদটাতে। বিস্‌সিবিঙ্গুই এবার ঠিকই বুঝতে পারল কতদূর মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে তার হঠকারিতা। সামনেই এক মাতাল, আর সে-ই তাকে ফাঁদে ফেলছে—আর, ফাঁদের মধ্যে সে নিজেই এসে ধরা দিয়েছে একটা বাচ্চার মতোই। এই সবকিছুই তো আগে থেকেই জানা ছিল।

সাক্ষী ? কেউই নেই। বরং আছে বলা যায় দ্‌জনেই। বাতোয়ালার মা ও দ্‌জোমা কুত্তাটা। তা, কেউই নেই—তাও তো বলা যায়। কোনো মা-ই তার ছেলের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে না—যদি অবশ্য অস্বাভাবিক রকমের মা না হয়। আর, দ্‌জোমা বিশ্বাস-ঘাতক হতেই পারে না—কারণ, মানুষে কখনো কোথাও কুকুরকে কথা বলতে শোনেনি।

বিস্‌সিবিঙ্গুই নিজেই বসে পড়ে, তার বর্শাটা গেঁথে রাখে মাটিতে। আলগোছে বার করে তলোয়ারখানা।

খাবার সঙ্গে পরিবেশন করা হ'ল ছাতুর মদ। খেতে চাইল না। বাড়ীর আপ্যায়নকারীদের মুখে দেখা দিল কি রকম আশাহত ভাব—সেটাও যেন চোখে পড়েনি এমন একখানা ভাণ করল বিস্‌সিবিঙ্গুই।

'মাকোদে আগেই আমাকে পেট্ দামিয়ে খাইয়েছে আলু মাছভাজা আর কেনে মদ। শোনো বাতোয়ালা, এর পরে তো আর পেটে ধরবে না। বিশ্বাস করছ না! পেটে হাত দিয়ে পরখ করো, খাওয়ার চোটে ফুলে উঠেছে।'

দ্‌জোমা কাছে এগিয়ে এলে একটু আদর করল। কুত্তাটা খুশিতে ডগমগ গড়াগড়ি খেতে লাগল মাটিতে, ঘেউঘেউ করল খানিকটা। লেজ নাড়তে লাগল, আর খেলার ভঙ্গীতেই ঘড়ঘড় আওয়াজ করে দেখাল শিকারের ভাব। যে আঙুলগুলো দিয়ে বিস্‌সিবিঙ্গুই তাকে আদর করেছিল আলগোছে তা একটুখানি কামড়ে ধরল।

এবার মদে-চুর বাতোয়ালা উঠে দাঁড়াল—পা বাড়িয়ে শুরু করল 'ভালোবাসার নাচ'। নাচছিল আর ভাবছিল, কিন্তু দাঁড়াতে দাঁড়াতেই দুলছিল ঃ মাথা আর পা পাথরের মতো ভারী, দুইচোখ লাল টকটকে রক্তের মতো। এবার একটা কাটাগাছের গোড়ালিতে ধাক্কা খেয়ে পড়ে গেল—লম্বা সটান···দ্‌জোমা অমনি তার চারদিকে ঘুরে ঘুরে ডাকতে লাগল ঘেউ ঘেউ।

বাতোয়ালা দাঁড়িয়ে পড়েই বলতে লাগল—'সেই কোন্‌কালে এমনি একটা দুর্ঘটনাই ঘটেছিল লিলিঙ্গোর জীবনে।'—বলতে বলতেই ফেটে পড়ল অট্টহাসিতে। 'হ্যাঁ, এবারে তোমাকে বলব লিলিঙ্গোর কাহিনী, আর তুমি তার একবর্ণও জানো না, বিস্‌সিবিঙ্গুই।···শোনো ঃ

তখন আজকালকার মতোই এই দুনিয়াটার কোনো সীমানা ছিল না—তবে, এই ঝোপঝাড় নদী-নালা পাহাড়-পর্বত, মোরো (জলা) ও স্বালা (জঙ্গল) এসব নিয়েই এই দুনিয়াটা ছিল। এখন যেমনটা। তখনো মানুষ ছিল আর ছিল শীত কী শীত! ঐ শীতটা না থাকলে মানুষ তো সুখেই থাকত। ঐ শীত নিয়েই ছিল যত অভিযোগ—শীতে শক্ত হয়ে যায় গা-গতর, ছুটে যায়

ঘুম। মানুষ এতটা অসন্তোষ আর অভিযোগ দেখাতে লাগল যে রানী আইপেয়ু—ওই আকাশের চাঁদ পাঠিয়ে দিল তার স্বামী আইলিঙ্গইকে। আর একটা নাম যার সেলা-ফো। তার উপরেই ভার পড়ল মানুষকে আগুনের ব্যবহার শেখানোর।

তাড়াতাড়ি করে আইপেয়ু তাকে নামিয়ে দিল একটা দড়ি দিয়ে—সেই দড়িটা যে কত লম্বা তার হিসেবনিকেশ নেই। দড়িতে বেঁধে দেওয়া হল একটা আইঙ্গ (আসন)। আর এই দড়িটাকেই উপরে টেনে তুলতে করতে হবে কি, একটা টম্‌টম্‌ (দামামা) দিয়ে ঘা মারতে হবে আইঙ্গটায়।

তখন আইলিঙ্গের কাছ থেকে মানুষ জানতে পেল আগুন শুধু শীতকেই তাড়ায় না, গাটাও গরম রাখে—খাবারও রান্না করে দেয়। আর, অন্ধকারে জ্বেলে দেয় আলো।

আইলিঙ্গ হয়ে উঠল মানুষের সবচেয়ে বড় বন্ধু। যা-কিছুই রহস্য-ঘেরা, তাই মানুষ জানতে চায় তার কাছে। আর তখন হল কি? ভয় ঢুকে গেল মানুষের পেটের ভিতর। মানুষ তো দেখছে—যারা কিছু আগেই বেঁচে ছিল আশেপাশে, তারা আর নেই! সব প্রাণীই তো শুয়ে পড়ে একদিন, আর তো ওঠে না! কোথায় যায় তাদের আত্মা। আর, তখন তো তাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলা সবি বৃথা—তাদের আদর করা বা খুশি করা বা আলাপ করা সবি তো নিষ্ফল। মুখের ভাষায় কোনোই তো জবাব দেয় না। তারা পড়ে থাকে নীরব নিঃসাড়। মাছিগুলো সুড়সুড় ঢুকে পড়ে নাকের ছেঁদা দিয়ে। হায় রে, দেখতে দেখতে তারা হয়ে পড়ে নোংরা দুর্গন্ধ, পোকাভর্তি এক-একটা ক্লেদের পিণ্ড!

মানুষ এবার জানতে চায় আইলিঙ্গের কাছে। কিন্তু সে তো জানে না কী জবাব দেবে—কী জবাব দিয়ে দূর করবে মানুষের ভয়ভীতি। তাই সে উঠে গেল তার রানী আইপেউর কাছে। বলল গিয়ে—

'সকল মানুষেরই বড় উদ্বেগ, মৃত্যুকে ভয় করে তারা। তুমি বলে দাও অন্যসব প্রাণীর মতোই মানুষের বেলায়ও কি ঐ একই বিধিবিধান?'

'যাও, তাড়াতাড়ি যাও, বলো গে। আমি মানুষ সৃষ্টি করেছি আমারি আদলে। আমিও তো মরে যাই—কিন্তু আমার অদৃশ্য হয়ে যাবার আটদিন পরেই আবার জন্ম নেই। এটা যেন খুবি মনে রাখে সব মানুষেই। আর, কথাটা যাতে মনে রাখে, তাই আইলিঙ্গ, হে আমার স্বামী! এখন থেকে তুমিই থাকো গিয়ে মানুষের মধ্যে।'—দড়িটা ছেড়ে দিয়ে সঙ্গেসঙ্গেই সে নামিয়ে দিল আইলিঙ্গকে।

দড়িটায় বাঁধা একটা আসনে (লিঙ্গায়) বসে আছে আইলিঙ্গ। দুহাত

দিয়ে সে ধরে আছে দড়িটা, কিন্তু মনে মনে অন্য কত ভাবভাবনা। তারপর একসময় মনে হয়, এই বুঝি এসে গেছে। তাই ছেড়ে দিল দড়িটা আর বসার আসনটা,—অমনি কিনা পড়ে গেল মহাশূন্যে। মারা গেল। আর, সেই থেকেই মানুষও মরে যায়।'

বিস্‌সিবিঙ্গুই একমনে শুনছিল বাতোয়ালার কাহিনী, কিন্তু শুনতে শুনতে তার ভাবভাবনা ঘুরে চলছিল অন্যদিকে···ও, অবিশ্বাস? মৃত্যু—বিস্‌সিবিঙ্গুইর মৃত্যু সুনিশ্চিত? তাকে সন্দেহ! সে এখন কেবল দয়ার পাত্র! তার বেশী কিছু নয়? হয়ত বা এই মুহূর্তেই তাকে······

হঠাৎ দ্‌জোমা তার কালো কালো বাঁকানো ওষ্ঠ দুটো ফাঁক করে ডেকে উঠল অর্থাৎ কুকুরের ভাষায় কিছু কুবাক্য প্রয়োগ করল, এবং সঙ্গেসঙ্গেই ছুটে গেল পথের মুখে—দাঁড়িয়ে পড়ল। এগিয়ে আসছে কিছু লোক। কয়েকজন ন্‌গাবৌসি—ইয়াকিদ্‌জি এলাকা থেকে। আসতে আসতে তারা পথ হারিয়ে ফেলেছে রাতের অন্ধকারে।

যাঃ, বাঁচা গেল! ওদের উপস্থিতিতে নিশ্চিন্ত হল বিস্‌বিঙ্গুই,—নেমে গেল দুশ্চিন্তার ভার। তাড়াতাড়ি একবোঝা পাতা জড়ো করে শুয়ে পড়ল তার উপর।

ঘুম পাচ্ছিল। এই রাতেই সে যে খুন হবে না তা ঠিকই। তালে গোলে বিশ্রামের যে সুযোগটা এসে গেল তার সদ্ব্যবহার করাটাই সবচেয়ে ভালো।

দুচোখ বুজে এক পলক ভাবতে লাগল। কালই ভোর হবে।

মাথাটা খুব আস্তে আস্তে নড়তে লাগল এপাশ ওপাশ। লোকজন কথা বলাবলি করছে তার পাশেই। নিশ্বাস-প্রশ্বাস হয়ে উঠল গভীর একটানা···

ঘুমিয়ে পড়েছে।

লেখক : ক্যামারা লেয়ে

'আফ্রিকার আধুনিক সাহিত্য-জগতে ক্যামারা লেয়ে-কে আখ্যাত করা যায় প্রথম প্রতিভাশালী লেখকরূপে।'

ফরাসী গিনিতে জন্মেছেন ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে কৌরোসার পল্লীগ্রামে, আঞ্চলিক বিদ্যালয়ে পড়াশোনার শেষে এবং সবসময়েই যোগ্যতার সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়ে—শেষ পর্যন্ত উচ্চতর শিক্ষার জন্য বিদ্যালয়-বৃত্তিলাভ করেন। তীক্ষ্মবুদ্ধি এই বালক গিনির রাজধানী কোনাক্রিতে অধ্যয়ন সমাপ্ত করেন টেকনিকাল কলেজে, এবং বৃত্তিলাভ করেন নির্বাচিত ছাত্ররূপে। ইঞ্জিনীয়ারিং পড়তে যান ফ্রান্সে। সেখানে অপরিচিত জনতা, এবং অভিনব সভ্যতা-সংস্কৃতির মধ্যে নিজেকে কেমন বিষণ্ণ ও নিঃসঙ্গ লাগে : তারি পরিচয় তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁর প্রথম গ্রন্থ 'আফ্রিকার কিশোর' গ্রন্থে। লেখক এখানে সরল সততায় জীবন্ত করে এঁকেছেন তাঁর পরিবার প্রতিবেশ ও সংস্কার-সংস্কৃতির সহৃদয় পরিচয়। এই গ্রন্থেরই দ্বিতীয় খণ্ড 'আফ্রিকার স্বপ্ন'। এখানে আছে লেখকের তরুণ জীবনের অভিজ্ঞতায় বিদেশী সভ্যতার মুখোমুখী নবজাগ্রত স্বদেশের চিন্তা-চেতনার কথা—রাজনৈতিক পরিস্থিতির কথাও জড়িয়ে গেছে স্বাভাবিক ও সঙ্গতরূপেই। এখানে স্বাধীনতার জন্য উদ্দাম আফ্রিকা, অস্থির আফ্রিকা। আমার এই সংকলন-গ্রন্থের প্রথমটি আহরণ করেছি 'আফ্রিকার কিশোর' থেকে, দ্বিতীয়টি 'আফ্রিকার স্বপ্ন' থেকে।

ক্যামারা লেয়ে তার আত্মজীবনকেন্দ্রিক দুই খণ্ড জীবনোপন্যাসে সরল-সুন্দর অনুভব এবং চেতনার পরিচয় যেরকম সততার সঙ্গে হৃদয়গ্রাহী ভাষায় ও রচনাভঙ্গীতে প্রকাশ করেছেন তাতে উচ্চমান সাহিত্যেরই পরিচয়। উল্লেখ্য মূলগ্রন্থ লেখা ফরাসী ভাষায়, ইংরেজী সংস্করণে তারই অনুবাদ। লেখকের রচনাশক্তি সম্পর্কে (দ্বিতীয় গ্রন্থপ্রসঙ্গে) জাম্বিয়া বেতারে যা বলা হয়েছে তা যথার্থ :

'ক্যামারা লেয়ের হাতে ভাষা হয়ে ওঠে মৃৎশিল্পীর হাতের মৃত্তিকার মতোই নমনীয়, তাই শেষপর্যন্ত তাঁর রচনা হয়ে ওঠে নিখুঁত সাহিত্য।'

দেশে ফেরার পরের দিন সকালে

হ্যারিকেন লন্ঠনটা নিভিয়ে দিতে যাচ্ছি এমন সময়ে আমার কুঁড়েতে ঢুকল এসে এক যুবক। মাথা তুলতেই দেখি আমার বাবাও তার পিছনেই এসেছেন চৌকাঠ পর্যন্ত। বাবাকে দেখেই বলে উঠলাম—'সুপ্রভাত, বাবা।'

'সুপ্রভাত! ফোটম্যান, খোকা! এই যুবকটি তোমারি বাল্যকালের এক বন্ধু। ওর নাম বিলালি। গতকাল থেকেই তোমার সঙ্গে দেখা করার কথা বলছে।'

'খুবি ভালো, সত্যিই ভালো।'—কিন্তু সঙ্গেসঙ্গেই ভাবছিলাম এত সকালে বাইরের লোককে অভ্যর্থনা জানাবার ব্যাপারে কোনো বিধিনিষেধ আছে কিনা? তবে মনের ভিতরে যে মন আছে সেখানে থেকে ঠিকই বুঝলাম—ওই যুবকটি এসেছে তো নির্ভেজাল বন্ধুত্বের ভাব থেকেই। আর ঠিক তখনি শুনতে পেলাম মায়ের গলা—'এত সকালেই উঠে পড়েছিস, ফোটম্যান? খোকা! তোর শরীরটা কি ভালো নেই?'

একটা মাদুর টেনে নিয়ে তখন আমরা বসে আছি বাইরে—আমার ডান-দিকে বিলালি, বাঁ দিকে বাবা। মায়ের কথার জবাবে আমি হয়ত এমন কিছু বলে ফেলতে পারি মা যাতে বিচলিত হয়ে উঠতে পারে, সেই ভয়ে আমার জবাব দেবার আগেই বাবা বলে উঠলেন—'না গো, ওর শরীর ভালোই আছে। ক্লান্ত আছে এই আর কি! আমাদের খোকা তো এসেছে অনেক দূর থেকেই।'

'হ্যাঁ, অনেক দূর থেকে এসেছি ঠিকই, তবে মোটেই ক্লান্ত নই আমি।'

'তা, ঘুমুতে পারিসনি তো মোটেই?'—মা চেপে ধরেন।

'না, তা নয়। সারাটা রাত কেবল ভেবেছি ওখানকার কথা।'

মা বলে উঠল—'ও! তাহলে আমাদের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিস বলে আফশোসই হচ্ছে? এখানে কি শান্তি পাচ্ছিস না?'

'শান্তিই পাচ্ছি। আর, কিছুটা তো সেজন্যেই—দুচোখে ঘুম আসছে না।'

আমার বাবা বসে আছেন, পায়ের উপর পা রেখেছেন কী সুন্দর—খলিফাদের মতন, এই প্রাচ্যদেশের লোকে বসে যেমনটা। বাবা কি এখনো আশংকা করছেন—আমি হয়ত এমন কিছু সত্যকথা বলে ফেলতে পারি মা যাতে বিচলিত হয়ে পড়বে। আমার ইউরোপে যাওয়াটা মা একদমই সমর্থন করতে পারেনি। তাছাড়া, মা সবসময়েই খুব আবেগপ্রবণ। আমি জানি

তা। বিলালি আমার পাশে বসে নীরবে শুনে যাচ্ছে সব, মুখে তার জিজ্ঞাসার দৃষ্টি।

মা জানতে চান—'ওদেশটা কি সুন্দর ?'

'হঁ্যা, খুব সুন্দর। আমি কয়েকটা ছবি দেখাব।'

বাবা হঠাৎ বাধা দিলেন বেশ কঠিনস্বরেই—'বলছি কি শুনছ ? এবারে জলখাবারটা বানাও গে। বেশ রোদ উঠে গেছে।'

চলে গেল মা। বাবা যখন বুঝলেন মা বেশ দূরেই চলে গেছে, আমার দিকে ঘনিয়ে এসে কানে কানে বললেন—'তোমার যে সব সঙ্গীরা গত বছর ফিরে এসেছে তাদের মুখেই শুনেছি ওখানকার জীবন তোমার পক্ষে খুবি কষ্টের ছিল! তাই কি ?'

'হ্যাঁ, খুব সত্য কথা। কিন্তু দুঃখকষ্টই কি সেরা শিক্ষালয় নয় ? আর তা ছাড়া, ওখানে দেখা মিলেছে বহু ভালোমানুষের, তারা আমাকে সাহায্য করেছে। খুবি সাহায্য করেছে।'

'তা বেশ, খোকা। কেউ চলতে চলতেই যদি হাত পা ছেড়ে না দেয় তো দুঃখকষ্ট করে তোলে শক্তপোক্ত শক্তিমান এবং সহনশীলও—আগুনের মধ্যে লোহার মতো। ঈশ্বর যেন তোমার ওখানকার সব বন্ধুদের অভাব না রাখেন।'

বাবা আবার আমার দিকে ঝুঁকে পড়েন—কেউ শুনছে না, বা ঘরের আশেপাশে ঘুরঘুর করছে না তা নিশ্চিত করে বুঝে নিয়ে কানের কাছে বলতে লাগলেন—'তোমার মা যেন এর কোনো কথাই জানতে না পায়। বুঝেছ তো ?'

'হ্যাঁ, বুঝেছি, বাবা। মা কিচ্ছুটি জানবে না।'

বাবা বললেন—'পুরুষদের সব দুঃখকষ্ট বা বিপদ আপদের কথাই মেয়েদের কাছে বলা যায় না।'

বিলালি বলে ওঠে সমর্থনের ভঙ্গীতে—'মেয়েরা—বড়ই স্পর্শকাতর।'

'হ্যাঁ, তাই তো।'

বাবার দিকে ফিরে জানতে চাইলাম—'আপনার খবর বলুন ?···আপনার সব কিরকম চলছে ?'

বাবা বলতে লাগলেন—'বড় কঠিন সময় গেছে, খোকা! তবু তো আমরা ছিলাম আমাদের বাড়ীতেই, আর তুই ?···বুঝতেই পারছিস, আমার পেশায় এখন আর বিশেষ কিছুই হয় না। মুচিরা ও মণিকারেরা যারা আমাকে পছন্দ করে তারা তো কার্যতই বেকার হয়ে পড়েছে। ঐ যে লেবানীরা সস্তামস্তা জিনিসপত্তরে ভরে তুলছে সব—তাদের দোকান-সাজে ভিড় লেগেই আছে। দামের তফাতের জন্যেই আমাদের মেয়েছেলেরাও পছন্দ করে তাদের নকল

জিনিসপত্র—আমাদের তৈরী সোনার অলংকারের চেয়েও, হাতে তৈরী আমাদের সৌখীন থলের চেয়েও। তাই এখন আগের কাজ ছেড়ে দিয়ে লেগে আছি মূর্তি গড়ার কাজে, স্থাপত্যশিল্প নিয়ে। তাউবাবরা যাবার পথে কিনে নেয় আমার হাতে-গড়া মূর্তির অনেকটাই। ওর জন্যেই পাগল ওরা।'

মাথা তুললাম। আমার বন্ধু কোনেট এসে পড়ল আমাদের মধ্যে। ও সেই যে শিক্ষক হবার জন্যে পড়াশোনা শুরু করল সেই থেকেই আর দেখা-সাক্ষাৎ ছিল না।

'হেরি সিরা?' (রাতটা ভালো কেটেছে তো?)—বলল সে।

'টানা মাস্সি।' (না, রাতে কোনো দুঃস্বপ্নের ঘটনা ঘটেনি)—বললেন আমার বাবা।

'দেম্বাইয়া ডন?' (তোমাদের পরিবারের সবাই কেমন আছেন?)—জানতে চায় বিলালি।

'আমাদের পরিবারের সবাই বেশ সুস্থ আছে।'—বলে কোনেট।

আমি কোনেটকে সাদর সম্বর্ধনার সুরে বললাম—'তোমাকে দেখে বড় খুশি হয়েছি।'

'আমিও।'—কোনেট বলে চলে—'কাল একটা রাজনৈতিক সভা থেকে ফিরতেই আমার স্ত্রী জানাল তোমার আসার কথা।'

'তোমার স্ত্রী বেশ ভালো আছে তো?'

'হ্যাঁ, বেশ ভালো আছে।'

বিলালির দিকে ফিরে আমি জানতে চাইলাম—'তারপর তোমার কী খবর! কী করছ?'

'হীরার কারবারে আছি আমি। বেশ তেজী বাজার। জোর বিক্রি হচ্ছে আজকাল—ঐ হীরা! তবে অন্যেরাও যে কম শুষে নিচ্ছে তা নয়। তবে কিনা, আমার দিক থেকে খুঁৎখুঁত করার কিছুই নেই। আমাকে কি করতে হয়: সোজা খনিতে নেমে যাই—ব্যস্ লাখ লাখ কামিয়ে নেই। দামী পাথরের ব্যাপারে আমার একটা অসাধারণ ভাগ্য আছে।'

'হলেই তো ভালো।' আমার বাবা বলছিলেন—'আমার ছেলের বন্ধুরা জীবনে কিছুটা প্রতিষ্ঠিত হতে পারছে—জানতে পেলে আনন্দই হয়।'

বিলালি সঙ্গেসঙ্গেই যোগ করে—'আমি একটা গাড়ী কিনেছি। সেটা কিন্তু আপনাকে দেখতেই হবে, সারাটা গিনিতে ওর জুড়ি নেই আর।'

ওই শেষদিকের কথাটা শোনামাত্র ইচ্ছে হল থামিয়ে দিই ওকে,—ওর দেমাকী কথা আমাকে অস্বস্তিই করে তুলছিল। আমি তাকে ইঙ্গিতে এটা জানিয়ে দিতে চেষ্টা করছিলাম যে ভদ্রবংশের সন্তানেরা ওরকম বড়াই করে না।

কিন্তু ও আমার ইঙ্গিতটা বুঝতে না পারায় আমি একটু ঝুঁকি নিয়েই সরাসরি বলে ফেললাম—'এক সময় একজন লোক ছিল খুব ধনী, কিন্তু তার একটি বড় রকমের শত্রু ছিল।'

বিলালি সাদাসিদে ভাবেই জানতে চায়—'কে সে?'

আমিও খোঁচা দিয়ে বলে ফেলি—'সে হল বড় বড় কথা। যার কথা বলছি বড়ই চাল মারত।'

বিলালি কিন্তু বুঝে উঠল না আমার কথা, কিংবা না বোঝার ভান করে চালিয়েই যেতে লাগল তার গাড়ির স্তুতিবাদ। আমার বাবা বেশ মজাই পাচ্ছিলেন—তাঁর মুখে দেখা দিচ্ছিল দুষ্টুমির হাসি। আর কোনেট—স্বভাবতই যে খুব বেশী কথা বলে—চুপ করেই ছিল। সে হাঁ করে চেয়ে চেয়ে দেখছিল বিলালিকে।

বিলালি কিন্তু শুনিয়েই চলেছে—'হ্যাঁ ঠিকই, সারাটা দুনিয়াতেই নেই আমারটার মতো আরো একটা। এমনকি সারাটা আফ্রিকাতেও নয়—সারাটা আফ্রিকা মহাদেশেই নয়। এই ধরনের গাড়ী আমেরিকাতেও তৈরি হয়েছিল ওই একটিমাত্রই। শুল্কবিভাগ বিশেষ ক'রে……'

'শুল্কবিভাগ তৈরী করেছিল কার জন্যে?…তোমার জন্যেই কি?'—বলে উঠলাম আমি।

'না, না! আমার জন্যেই নয়, লাইবেরিয়ার প্রেসিডেণ্টের—রাষ্ট্রপ্রধানের জন্যে। কিন্তু আমি হাতে হাতে জমা দিলাম বারো হাজার ডলার অর্থাৎ কিনা একলক্ষ পঁচিশ হাজার—তা বলা যায়, নিয়মিত দামের প্রায় তিনগুণ! তা টাকা দিয়ে কী না কেনা যায় এই দুনিয়ায়? গাড়ীটাও তুলে দিল আমারি হাতে।'

—এই ধরণের মিথ্যে আর বাহাদুরীতে ধরা পড়ে উট্‌কো বড়লোকদেরই একান্ত স্থূল চেহারাটা। এবং এটা সত্যিসত্যি বড়ই বেয়াদপি, এবং বোকামি। আমরা হেসে উঠলাম। বিলালি কিন্তু নির্লজ্জের মতোই বলে চলেছে তখনো—'আমার গাড়ীটার স্টিয়ারিং-চাকার পিছনটায় আমার সিটটায় বসে যখনি আমি কোরোসার ভিতর দিয়ে যাই, হাঁ করে তাকিয়ে থাকে সমস্ত লোকজন। তারা তো আমাকে এগিয়ে চলতেই দেয় না—আমার ওই ইউনাইটেড স্টেটস অব আমেরিকার পরিবহণ-যানটির হাতলটা নিচু-করা আর উঁচিয়ে-তোলার কায়দাটা বারবার দেখালে তবেই পথ ছেড়ে দেয়।'

'তুমি একজন সত্যিকার ক্যাপিটালিস্ট'।—কোনেট এবার হাসতে হাসতে বলে ওঠে উচ্চকণ্ঠে—'জন্মাবধিই ক্যাপিটালিস্ট—দৈবী কোনো ভুলেই জন্ম নিয়েছিলে এই সর্বহারার দেশে। তোমার জায়গাটা যে এখানে নয়, বুঝতে পারছ তো?'

'আমার জায়গাটা কোথায় ?'—বিলালি জোরের সঙ্গেই জানতে চায়।

কোনেট হাসতে হাসতেই জবাব দেয়—'ইউনাইটেড স্টেটস অব আমেরিকায়—যুক্তরাষ্ট্র আমেরিকায়।'

আমার বাবা একটু কৌতুকের হাসি হেসে বললেন—'না, শাল সেগুন নয় রে, ও হল যাকে বলে আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ! ধনিকের গুণও আছে, কিন্তু হঠাৎ-বড়লোকের আছে শুধু দোষ।'

'এত বস্তা বস্তা টাকা কিন্তু লোহালস্করের পিছনে না উড়িয়ে শুরুতেই একটা বাড়ী করলে ভালো হত না? কোরোসার মতো শহরে একটা বাড়ী কত কাজের হত। বাড়ী করাটা তো বেশ ভালো রকমের বিনিয়োগ।'

'কোনেট, আমি ওটাও করছি।' —জবাব দেয় বিলালি। আমি মন্তব্য করি—'ওইভাবে শুরু করাটাই বোধ হয় ভালো হত। চমৎকার রথে চড়ে হেলেদুলে ঘুরে বেড়ানোটায় কত মজা—তা উপভোগ করার পরেই মাটির মেঝেওয়ালা এক কুঁড়েঘরের বিছানায় এসে শোওয়াটা কী করে সহ্য করতে পারো? প্রথমেই তোমার উচিত ছিল বেশ একখানা পাকা বসতবাড়ী খাড়া করা।'

কিন্তু বিলালিরও বলার মতো জবাব আছে—'আমি যে কত বড় লালাজী তার প্রমাণটা বাড়ী করেই তো আর শহরবাসী বন্ধুদের দেখাতে পারতাম না। একটা বাড়ী সকলকেই দেখিয়ে বেড়ানো যায় না,—ওটা তো শহর জুড়ে ঘোরানো যায় না। কিন্তু একটা গাড়ী···'

বাবা তখন বললেন—'তোমার চিন্তার ধরণ থেকে বোঝা যায় তুমি মোটেই আমার ছেলের অন্যসব বন্ধুদের মতো নও।'

কিন্তু বিলালিকে রোখে কার সাধ্য? ওর মুখে যা শুনলাম তা কেবল বাহাদুরী আর দম্ভ। তবে, এর মধ্যেই ওর মুখের অনর্গল কথা শুনতে অভ্যস্তই হয়ে উঠলাম, জেনে গেলাম ওর ধনদৌলত জাহির করার পদ্ধতিটা—সৎভাবেই হ'ক কি অসৎভাবেই হ'ক ধনদৌলত আয়ত্ত করার ব্যাপারটা (তা, হীরার কারবারী যে বড় একটা সৎ হয় না তা তো জানা কথাই)।

···বিলালি বলতে লাগল—'এখানে এই যারা রয়েছে, সবাই ইস্কুলে শিক্ষা পেয়েছে। তোমরা ডিপ্লোমা পেয়েছ এবং এটা-সেটা কাজেও ঢুকে গেছ।'

আমার বাবা মন্তব্য করলেন শুষ্কভাবেই—'খোকা, আমি তো ইস্কুলে যাইনি কখনোই।'

'তা জানি, দা। কিন্তু আপনি তো নানারকম পেশায়ই কাজ করেছেন। আমার বিদ্যের দৌড় তো ঐ প্রাইমারী ইস্কুল পর্যন্ত। আর তাই, টাকাই হল আমার ডিপ্লোমা—এবং যা-কিছুই টাকায় পালটানো যায়। আমার আয়ত্ত-করা

সবকিছুই যদি সবার কাছে জাহির না করি তো, লোকে আমাকে ভাববে একটা যা-তা—একটা অপদার্থ'।'

ওর এইভাবে কথা বলাটায় বেশ মজাই লাগছিল আমাদের, বিলালিরও মনে হল এত তার মুখ রক্ষা হ'ল। আমার বাবা ওর কথার স্রোত থামিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন—'এই যে খোকা, কতদিন হয় এই অঞ্চল ছেড়ে গেছ?'

'অনেক দিন হল—অনেক অনেক কাল।'

'অনেক অনেক কাল বলতে কি বোঝাতে চাইছ?'—বাবা চেপে ধরেন।

'পনের-ষোল বছর!'—বিলালি জবাব দেয়।

বাবা মাথা নাড়তে নাড়তে চাপাহাসি হাসতে লাগলেন—দুষ্টু ছেলের মতোই। আমরা তখন খাওয়া বন্ধ করে দিয়েছি। বসেই আছি মাদুরের উপর।

কোনেট মৃদু মৃদু হাসতে হাসতে বলল—'ওকে ছেড়ে দাও। যখন সময় আসবে ঠিক শিক্ষাই পাবে—অবশ্য সে শিক্ষা ওর নিজের খরচেই, এবং সেটা দুর্ভাগ্যজনকই যদিও। আমরা অবশ্য চাই না, যেদিক থেকেই হক শেষ পর্যন্ত সেটাই হক। আমি আর ফোটম্যান হাতেনাতেই তোমাকে কিছু নীতিশিক্ষা দিয়ে দেব এবার। কি বলো বিলালি?'—কোনেট শেষ করল একটু উদ্ধত-ভাবেই।

বিলালি হেসে উঠে হো হো করে, জবাব দিল—'আমি তোমাদের নীতি-গর্ভ বক্তৃতা মনোযোগ দিয়েই শুনে যাচ্ছি, কিন্তু তাতে আমার চিন্তাভাবনার ধরণটা পালটাবে না একটুও। আমার বদ্ধমূল বিশ্বাসও নয়।'

আমরাও হেসে উঠলাম হো হো শব্দে। বাবা গায়ে বউবাউটা জড়াতে জড়াতে হঠাৎ উঠে দাঁড়ালেন। বললেন—'খোকারা, তোমাদের সঙ্গটা বড়ই ভালো লাগছিল, কিন্তু এখান আমাকে তোমাদের কাছ থেকে বিদায় নিতে হবে। কারখানায় যাবার সময় হয়ে গেছে। যাচ্ছি, কেমন?'

'নমস্কার!'—বলে উঠল সকলে।

আমার বান্ধবী মেরী

আধঘণ্টার মধ্যেই আমি পৌঁছে গেলাম আমার মামীর বাড়ীতে—বিমানবন্দর থেকে পনের কিলোমিটারের বেশী দূরে নয়।

মামা ও মামীমাকে তো দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু মেরী কৈ?

···কোথায় মেরী? আমার এক মামী বলল—সে গেছে সহরতলীতে

তার এক বন্ধুর বাড়ীতে। ধপ্ ধপ্ কাঁপছিল বুক—বিছানায় শুয়ে রইলাম।

আমি এখন মেরীর প্রসঙ্গে কী রকম ভাবব? এই কয় বছরে সে কি বদলে গেছে? তাকে ছেড়ে গিয়েছি সে তো অনেকদিন। সে কি এখনো আগের মতোই আছে—তেমনি শান্ত আর অসাধারণ রকমের জেদী? এখনো কি তেমনি আত্মবিশ্বাসী? ঠিক তেমনিই বাস্তব বুদ্ধিদীপ্ত?

এসব কথা যখন মনের মধ্যে খেলে বেড়াচ্ছে, বিদ্যুৎঝলকের মতোই কানে এল একটি মেয়ের কণ্ঠস্বর। সঙ্গে সঙ্গেই উঠে বসলাম—দেখি চৌকাঠে দাঁড়িয়ে আছে মেরী। আগের চেয়েও সুন্দর, আরো সম্মোহিনী রূপ—আমার বুকের ভিতরে তার যে ছবিটি পুষে রেখেছি তার চেয়েও পাগল-করা।

একটি কথাও না বলে কয়েক পলক তাকিয়ে রইলাম এ-ওর দিকে—যেন পরস্পরের প্রতি উদাসীন, কিংবা আত্মীয়দের সামনে আমাদের মনের ভাবকে খুলে ধরতে ভয় পাচ্ছি—শালীনতাবোধেই।…কারণ আমার মামীরা আমাদের সম্পর্ক নিয়ে খোঁচা মারতে পেলে ছাড়ে না। কিন্তু তারপরেই ওইসব কড়া লোকের কথা ভুলেই গেলাম—আমাদের দুজনের মনের এবং প্রাণের ভিতর হঠাৎ সমভাবেই আছড়ে পড়ল এক আবেগের ঢেউ। আমরা হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়লাম এ-ওর বাহুবন্ধনে।

মেরী ও আমি কথা বলতে পারিনি বহুক্ষণ; এত বছর পরে আমরা যে আবার মিলিত হয়েছি তার আনন্দ তো কথার অতীত—বোধেরও বাইরের। কখনো যদি আমার মামীরা আমাদের একা রেখে যাচ্ছিলেন আমরা এ-ওর দিকে হাসিমুখে তাকাই, এমনকি হাত ধরাধরি করে থাকি…

তারপর দুপুরে খাবার সময়েও আমরা কথাবার্তায় কেবল বাইরের কথাই বলেছি—বাদ-বিতণ্ডা না হয় এমন নিরীহ বিষয় নিয়েই। আর, যখনি য়ুরোপে থাকাকালীন আমরা কথা বলতে গেছি, লক্ষ্য করলাম মেরী প্রতিবারেই কৌশলে এড়িয়ে এড়িয়ে চলেছে তার ব্যক্তিগত প্রসঙ্গটা। টেবিল থেকে উঠে গেলে আমিও পিছু পিছু তার ঘরে গেলাম, জিজ্ঞাসু ভঙ্গীতে তাকালাম তার চোখে। সবকিছুই জানতে চাই আমি—আর দেরী না করেই! ও যখন ডাকারে ছিল তখনকার কথা, সবাই কী রকম আচার-আচরণ করেছে ওর সঙ্গে সে সব কথা। সবচেয়ে জানবার বিষয়—মেরী এখনো কি আমার প্রতি তার আস্থা বজায় রেখেছে? আমি ঘরে ঢুকছি দেখেই মেরী তার মাথাটা নিচু করে রাখল—আর কিছুক্ষণ তখন আমাদের ঘরে নেমে এল সে এক ভারী স্তব্ধতা। আমি ওর বাহু টেনে ধরে বললাম—'চলো না, একটু ঘুরে আসি।'

'স্কার্ফটা নিয়ে আসছি।'

তখনো নীরব থেকেই এগিয়ে চললাম আমরা শহরের দিকে…। হাওয়ারা খেলা করছে মেরীর স্কার্ফটা নিয়ে। একটা সিগারেট ধরালাম। মেরী আহতে হতে পারে তাই তাকে কোনোকিছু জিজ্ঞেস করলাম না আমাদের বিষয়ে —আমাদের বন্ধুত্ব সম্পর্কে, আমাদের পরস্পরের মন দেওয়া-নেওয়া সম্পর্কে। আমি ভাবছিলাম—মনের অনুকূল অবস্থা না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করব, অর্থাৎ কিনা মনের ভয়-ভয় ভাবটা সম্পূর্ণই দূর না হওয়া পর্যন্ত। তারপরে কথাবার্তার মধ্যে মধ্যে ঢুকিয়ে দেব আমাদের ব্যক্তিগত সমস্যা সম্পর্কে দুচারটা কথা।

'সবকিছুই এতটা বদলে গেছে ?'—আমি অর্থপূর্ণভাবেই বললাম।

মেরী সায় দিল—'সবকিছুই বদলে গেছে। দূরে ওখানটায় দ্বীপগুলির উপরে তৈরী হয়েছে বড় বড় গুদাম—বক্সাইট পিণ্ডগুলো রাখবার জন্যে। কত ঘরবাড়ী তৈরী হয়েছে কী সুন্দর—কিন্তু সে সব তোমার আমার মতো লোকের জন্যে নয়, ওসব বিদেশী কোম্পানীগুলিরই সম্পত্তি।'—বলতে বলতে মেরী ঃ ` ঠল উচ্চকণ্ঠে।

'হ্যাঁ, তা বটে'!—আমি সায় দেই।

…নাইজার সড়ক ধরে এগোচ্ছিলাম আমরা—টাম্বো সেতুর দিকে পিঠ রেখে। সমুদ্রের দিক থেকে এগোচ্ছিলাম শহরের মুখে, কিন্তু প্রথমটায় তো চিনেই উঠতে পারছিলাম না চারদিকটা।…প্রায় সবজায়গায় দেখছি নতুন নতুন দালানকোঠা…হাঁটতে হাঁটতে ক্লান্ত হয়ে ট্যাক্সি ডাক দিলাম, কিন্তু অত দূর থেকে শুনতে পেল না ড্রাইভার। হঠাৎই ডাক দিয়ে ফেলেছিলাম—ঠিক প্যারিসেই আছি যেন!

মেরী বলে উঠল—'এই কোনাক্রিতে ট্যাক্সি দেখে অবাক হচ্ছ, না ? হ্যাঁ, আমরাও এখন আধুনিক হয়েছি।'

'হ্যাঁ, প্রগতি আসে ধীরে ধীরেই, কিন্তু সুনিশ্চিত ভাবে।'—বললাম আমি।

'…ভগবান আমাদের দিয়েছেন কী সুন্দর সুন্দর সবুজের সমারোহ! একবার এখান থেকে দেখো তো দৃশ্যটা কী চমৎকার!'—বলে মেরী।

'সত্যই আশ্চর্য সুন্দর!—আমিও সায় দিই।

'শুনছি, তোমাদের ঐ প্যারিস নাকি খুবি সুন্দর, কিন্তু ঠাণ্ডাও নাকি খুবি।'

'খুব ঠাণ্ডা ওখানে—এত ঠাণ্ডা যে ওখানে থাকাটা যে কী কষ্টকর, খুব সম্ভব কল্পনায়ও আনতে পারবে না।'

'এখানে খুব শিগগির বৃষ্টি শুরু হবে—প্রবল বৃষ্টি প্রচণ্ড…তা বিশ্বাস করো, তোমার সেই যাওয়া থেকে কিছুই বিশেষ একটা পালটে যায়নি। এই

ঋতুটার নামও নিশ্চয়ই থেকে যাচ্ছে বর্ষাঋতু !···তা, তোমাকে বলে রাখছি, তোমার স্যুট যা-সব আছে প্যাক করেই রেখে দাও। মুষলধারে বর্ষা এই এল ব'লে। অর্থাৎ একটা প্রলয় হয়ে যাবে আর কি, তারপরে রেখে যাবে কী সুন্দর নির্মল আকাশ—পরিষ্কার তো বটেই।'

'ধন্যবাদ, মাস্টারমশাই।'—হাসতে হাসতেই বললাম—'অনেক অনেক কথা জানালে—আমি দেখছি এর কিছুই জানতাম না।'

মেরী খিলখিল করে হেসে উঠল—মনে হ'ল আমি ওকে যে প্রশংসা করলাম এতে খুশিই হয়েছে।

আমি সাহস করে এগিয়ে দিলাম—'আচ্ছা, এবারে আমাদের বিষয়ে কিছু কথা শুরু করতে পারি, এখনি!'

—কিন্তু এই কথাটা বলতে না বলতেই মেরী মাথাটা নিচু করে রইল—সে খুবি বিব্রত এই ভেবে যে পিছনের জীবনের পর্দাটা সরে যাবে এখনি। দেখা দেবে সেই অতীত এখন থেকে যাকে সে আর আমল দিতে চায় না—কোনোভাবেই যার সঙ্গে কোনো সম্পর্কই অটুট রাখাটা আর নয়। আর, হঠাৎ সে তখনি হয়ে উঠল আবার সেই ভীরু মেয়েটি—চাপাস্বভাব সেই মেয়েটি—যাকে আগে আমি জানতাম। সে অবশ্য বলল—'তা হয়ত শুরু করা যেতে পারে।'

একদিন আমার জন্যে ওর যে ভালোবাসা তা কি চলে গেছে? কিছু আগেই আমরা অনুভব করছিলাম, যে আবেগ—আমাদের দুজনেরই মনের ও প্রাণের যে উষ্ণ আবেগ—তা কি যথার্থ, না তা একটা ভাণমাত্র? মনে করে দেখলাম—আমার বিদায়ের সময় মেরী যাচ্ছে ডাকারে, আমি প্যারিসে। আমাদের চিঠিপত্রের মাঝখানে পড়েছে বড় বড় ছেদ, (আমি বিষণ্নভাবে ভেবেই চলেছি) তা সম্ভবত মেরীর দিক থেকে অন্যান্য ছেলেদের নিয়ে মশগুল থাকার জন্যেই। কিংবা ওইসব ছেলের দিকেই তার ভালোবাসা দিনে দিনে গভীর হয়ে উঠছিল—এবং তার মনপ্রাণ সে সমর্পণ করেছিল সম্পূর্ণভাবেই—ওই ছেলেদের কাছেই, আমার জন্যে তার ভালোবাসা আর ছিলই না।

নানাধরণের বিষণ্ন ভাবনা আমার মনকে ছেয়ে ফেলল—বিষণ্ন হবার মতো যদিও কোনো যথার্থ কারণ ছিলই না। আমি বলে ফেললাম—'আমার ফিরে আসাটা ঠিক হয়নি। এখানে আমাকে দেখে তুমি সুখী হওনি!···এমনটাই ভেবে রেখেছিলাম। আর তাই আসবার আগে ঠিক বুঝেসুঝেই রিটার্ণ-টিকেট করে নিয়েছি। কালই চলে যাচ্ছি আমি।'

তারপর ওর মুখখানি লক্ষ্য করে বুঝলাম আমার সন্দেহের কোনো ভিত্তিই থাকতে পারে না, এবং আমার যুক্তিবুদ্ধির সবটাই মিথ্যে। কিন্তু—সেটা

যতই উদ্ভট কিংবা ভুল হক না কেন, একমাত্র সেটাই তো মেরীকে বাধ্য করতে পারে উপরকার ঢাকনাটা খুলে দিতে কিংবা আরো সঠিক বললে তার জীবনের যে অংশটি আমার একেবারেই অজানা সেইটুকুই খুলে ধরতে। তার ভালোবাসার সম্পর্কে আমার আস্থাটা অটুট রাখাবার জন্যেই মেরী তার মুখ তুলল—তাকিয়ে রইল আকাশের দিকে। সে যে ওখানেই উদ্ভাসিত দেখছে কোনো কিছু, ওখানেই যেন সে আমাকে দেবার মতো উত্তরটা খুঁজে পাচ্ছে। এবার সে জোরের সঙ্গেই বলে উঠল—'না, তুমি যাবে না—আমি তা চাই না।'

'সত্যিই কি ?'—আমি যেন বিস্ময়ের ভাণ করি।

'হ্যাঁ, সত্যিই।

মেরী এবার মৃদুস্বরে বলতে লাগল—'তোমার চিঠি পেয়ে আমি যেন এক ধাক্কা খেলাম। আমি জানতাম তুমি একদিন আসবেই। তোমার আর আমার সামনে এখন সেই মুহূর্তটিই উপস্থিত যার সম্পর্কে আমি বড় ভয়ে ভয়ে ছিলাম। কিন্তু এবার যে সেই সময় এল, এতে আমি খুশিই।'

আমি ভাবছিলাম আমার অন্তরের গোপনে নেমে ! ফ্রাঙ্কোয়ের সঙ্গে আমার যোগাযোগের ব্যাপারটা মেরী নিশ্চয়ই ভুলতে পারেনি। মেয়েটা—একরত্তি ঐ মেয়েটা। ও ফ্রান্স থেকে কেবল চিঠির পর চিঠি ছেড়েছে আমার বাবামার কাছে—তাদের চেপে ধরেছে তার সঙ্গে আমার বিয়েতে মত দেবার জন্যে।

'তা, ফ্রাঙ্কোয়ের কথাই যদি ভেবে থাকো, তবে আমিও সোজা বলছি ওর সঙ্গে সবকিছু শেষ করে দিয়েছি বহু আগেই। যাই হক না, আমার কাছে সে ছিল কথা বলার মতো কোনো সঙ্গী—এর বেশীকিছু নয়। তার অর্থ, আমি খুবি পছন্দ করি ও ছিল তেমনটাই, এবং ওর সঙ্গে আমি মতামত বিনিময় করতাম, এবং তারো একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল পরস্পরকে খবরাখবর জানানো—আমাদের দুই দেশের জীবনধারা সংপর্কে। মেরী, তুমি ওসব কখন ভুলে যাচ্ছ, বলো ? কখন তুমি তোমার পিছনেই ফেলে রাখবে পিছনটা, দৃষ্টি মেলে ধরবে সামনের দিকেই ?'

'ভু-লে যাবো ?'—নরম সুরেই বলল মেরী, প্রত্যেকটি অক্ষরে আলাদা-ভাবে জোর দিয়ে—'বটেই তো, কত ছেলেই তো তাদের প্রণয়ীদের প্রতারণা করে ফিরছে !'

'কিন্তু আমিই বা তোমাকে এ ছাড়া কী বলতে পারতাম ?'—একটু বিরক্তির সুরেই বলছিলাম—'আমি তো বলেছি ওসব চুকেবুকে গেছে—এই সবি। তা, আমি যদি দুটো তিনটে এমনকি চার-চারটে শাদি করতাম—আমাদের ধর্মশাস্ত্র কোরাণের ফরমান মতোই, তখন তুমি কী বলতে ?'

—এসব কথা আমি ওকে খোঁচা মারবার জন্যেই বললাম, কিন্তু ওই শেষের দিকের কথাগুলি শোনামাত্রই ও তেলেবেগুনে জ্বলে উঠল—ঘৃতে আগুনের মতো জ্বলে উঠল। চেঁচিয়ে উঠল—'ও, এই যদি তোমার মনে থাকে তো, সোজাই বলে দিচ্ছি—আমার জবাব হ'ল—না। না, না! ও হবে না—কখনোই না। শুনছ, কি বলছি?···না, কক্ষনো না। ঠিকঠিক বুঝে হজম করে নাও, এই একবার আর এই শেষবার।'

'সবকিছু এত জড়িয়ে ফেলো না, মেরী।···আমার গৃহে তুমিই হবে একক গৃহিণী এবং একমাত্র! তোমার সঙ্গে একটু মজাই করছিলাম, তাও বুঝতে পারোনি?'

'ঠিক আছে··বেশ! মজা করে থাকো তো ঠিকই আছে। কিন্তু তোমাদের পুরুষদের ভিতরের কথা কে জানে!··ঠাট্টামস্করা করতে করতেই বেরিয়ে পড়ে পেটের ভিতরের সত্যি কথাটা। বুঝেছ?'—এবার সে তার বুকের ভিতরের সঙ্গোপন বিষয়টিতে ফিরে এসে বলল—'আমি ভাবতে শুরু করেছিলাম আমার জন্যে আর বুঝি কোনো ঠাঁই নেই।'

'আমি মন দিয়ে শুনছি, মেরী!'

মেরী আমার দিকে তাকিয়ে রইল। হয়ত সে লক্ষ্য করছিল আমার উপরে তার কথার প্রভাবটা কী রকম দেখা দিচ্ছে। সম্ভবত তার প্রত্যাশা-মতো ফলাফলটা দেখতে পেল না। কণ্ঠস্বর দৃঢ় করে সে বলতে লাগল—'তোমাদের এই পুরুষজাতের পক্ষে আমাদের মেয়েদের বোঝাটা কঠিন।'

'সে যাই হ'ক না, আমাকে তোমার বুঝিয়ে দেওয়া উচিত।'

আমরা বেরিয়েছি সেই দুটোর সময়, বাজে এখন ছটা—গীর্জার গম্বুজ থেকে পরপর ছটা বাজল। এবার ফিরে চলেছি বাড়ীর দিকে। আর একটা সিগারেট ধরালাম, মেরীকে বললাম—'একটা বেঞ্চিতে একটু বসলে হয় না?'

আমার পাশেই বসল মেরী—খুব ঘনিয়ে বসল। আমাদের পাছায় পাছায় ঘনিষ্ঠ স্পর্শ। আমার বুক দুলছে—ভয়ানক দুলছে। আমার সমস্ত মন ওদের প্রাণ ঝুঁকে পড়ছে পরস্পরের দিকে। উচ্চভাবের সংজ্ঞাতীত এক আবেগেই যেন আমি সম্মোহিত হয়ে পড়েছি। মেরীর মুখের দিকে তাকালাম। তাকে দেখাচ্ছে আরো শান্ত আরো সুন্দর—এমনটি কখনোই তো আর দেখিনি! ধীর সমীরণ খেলা করছে ওর স্কার্ফটা নিয়ে—ওর কাঁধের উপর দুলছে তার প্রান্তটা। দেখে কেমন সুখী মনে হচ্ছে আমাকে। ও কথা বলতে চাইছে, কিন্তু আমি চাই—ও এখন নীরব থাকুক। হঠাৎ আমার সব ভাবভাবনা উড়ে চলল ডানা মেলে। এবারে বসবে গিয়ে আমার মনের মতো এক আনন্দময় ভবিষ্যতের উপর, বসবে একবার অতীতে, একবার বর্তমানে।·· দেখতে দেখতে সবটা মিলেমিশে এক

হয়ে গেল অসীমের মধ্যে, উঠে গেল উঁচু থেকে আরো উঁচুতে—অদেখা উঁচুতে। মেরীকে বলতে ইচ্ছে হচ্ছিল—'কী সুন্দর তুমি মেরী!'—কিন্তু সামলে নিলাম। আমার আকাঙ্ক্ষার চেয়েও শক্তিশালী কোনো আবেগ, আর এই চেতনা যে জীবনটা ঠিক আমাদের পরিকল্পনার সঙ্গেই খাপ খায় না—এই দুইয়ে মিলে আমাকে এবার আমার দিবাস্বপ্ন থেকে টেনে নামিয়ে আনল, বাধ্য করল মেরীর কথা শুনতে।

মেরী বলতে লাগল—'সে এক দুঃস্বপ্ন! প্রথমটায় শুনতে পেলাম—তুমি বিয়ে করেছ। তারপর শুনলাম তোমার স্ত্রী নিয়মিত চিঠি পাঠাচ্ছে তোমার বাবামার কাছে। এমনিধারা চলছে তো চলছেই।···একদিন এত যন্ত্রণা হতে লাগল যে আমাকে হাসপাতালে পাঠাতে হল—জানি না সেখানে কতদিন ছিলাম। বেচারা ডাক্তাররা আমার তাপ নিতে লাগল দিনের পর দিন, আমার দেখাশোনা করতে লাগল। তা, আমার অসুখটা তো দেহে নয়, মনে। কেবল মনোবিকারের ডাক্তাররাই আমাকে সারিয়ে তুলতে পারত।'

কিছুক্ষণ নীরব থেকে আবার বলতে লাগল মেরী—'কিন্তু একদিন আধখানা যেন উঠে গেল আমার সামনের পর্দাটা। আমি আমাকেই বলছিলাম—"কী লাভ! সে তো বিবাহিত!" তারপর একদিন আমার উপরে প্রতিশোধ নেবার এক সুযোগের মতোই (সেটা প্রতিশোধের একটা ভাণ ছাড়া কী আর, আর কী বা হতে পারে)। হেডি এল আমাদের বাড়ীতে, আমিই তাকে যাতায়াত করার সুযোগ দিলাম···সত্যিকথা যদি বলি, যখনি দেখতাম ও আসছে—আমার ইচ্ছে হত চিৎকার করে উঠি। সে এক মজা বটে, একটা মেয়ে একটা ছেলেকে যখন ভালোবাসে না।···আমি তাই দয়াময় ঈশ্বরের কাছে হাঁটু গেড়ে প্রার্থনা জানালাম—'হে ঈশ্বর, তুমি আমাকে আবার শিশু করে দাও—আবার ফিরিয়ে দাও আমার চিন্তাভাবনাশূন্য শৈশবের সেই মন—আমি যেন প্রসন্নমনেই ভাবতে পারি আমার অতীতের কথা।'

আমি অধীরের মতোই বলে উঠলাম—'এখন শান্ত হও—শান্ত হও এখন, তোমার হাত ধরে বলছি। ও অধ্যায় শেষ হয়ে গেছে—ওসব শেষ হয়ে গেছে।' মেরী আমার হাত ছেড়ে দিয়ে উঠে দাঁড়াল—হঠাৎ দুচোখ ভরে-ওঠা অশ্রু মুছে নিল স্কার্ফের এক প্রান্ত দিয়ে। তখন একেবারেই আচমকা আমার গলার ভেতরে যেন একটা দলা বেধে গেল—কিন্তু কাঁদতেও তো পারছি না। একটা অল্পবয়সী মেয়ের কাছে কোনো পুরুষ কি কাঁদতে পারে?···পুরুষের অশ্রু বড় ভয়ানক, মেয়েদের মতো হয় না,—বড় একটা বেরিয়ে পড়ে বেয়ে চলে না। আমার অন্তরতম সত্তা সহজেই ডুবে গেল বন্যার বেগে, ভাসিয়ে দিল আমার বিবেক।

মেরী আমার কাছ থেকে সরে গিয়ে দাঁড়াল একটা নিচু দেয়ালের উপর ভর ক'রে—অপলক তাকিয়ে রইল আরো অনেক দর্শক-যাত্রীর মতোই—দূরে লুস দ্বীপপুঞ্জের দিকে। ঘন-লাল অস্তসূর্য স্থির হয়ে আছে দ্বীপপুঞ্জের উপরে—অদৃশ্য রশ্মিতেই বাঁধা যেন। আমরা যখন এখানে এসেছি সূর্যের বিচ্ছুরিত রশ্মি তেমনটা আর জোরালো নয়। আমি ধীরে ধীরে এগিয়ে গেলাম ওর দিকে। প্রতিটি পুরুষ কি মেয়েই এখন একেবারে নীরব। প্রত্যেকের মধ্যেই জেগে উঠেছে যেন এক অন্তর্জীবন, এবং এই জাগরণ এমন যে কারো মুখ দিয়ে কথা ফুটছে না, প্রত্যেকেই বাঁধনহারা—ভেসে চলেছে স্বপ্নের স্রোতে···

কিন্তু কী ভাবছে তারা, ওই সব নারী ও পুরুষ প্রত্যেকেই?

আমাদের সামনের দিগন্তকে ঢাকা দিয়ে রেখেছে ওই যে দ্বীপগুলি—ওই কথাই কি ভাবছে সবাই!···

আমি মেরীর কাছে এসে আলগোছে তার নাম ধরে ডাকলাম। ও কোনো সাড়া না দেওয়াতে আমি ওর ব্লাউজটা ধরে নাড়া দিলাম, কিন্তু ওর দৃষ্টি তবুও স্থির হয়ে আছে নিঃসীম সমুদ্রের দিকে। আর তাই তাকে মনে হচ্ছিল যেন কোন্ সুদূরের কেউ।

কী ভাবছে ও? হয়ত ভাবছে সেনেগালে থাকার সেই দুদীর্ঘ বছরগুলির কথা—তার অভিভাবকেরা সুখেদুঃখে সস্নেহে তার জন্যে যা করেছে সেসব। প্যারিসে কী রকম জীবন কাটিয়েছি সম্ভবত তাও ভাবছে। ওই দুটোই নিশ্চয় তার মনে রয়েছে! ওর মুখের গম্ভীর ও কঠিন ভাবে স্পষ্টই ধরা পড়ছে তা। আমার উপস্থিতি সম্পর্কে ও সচেতন নাই দেখে আমি একটু সরে গেলাম। ওর মুখে তখন দেখা দিচ্ছিল—এই উজ্জ্বল আভা, তারপরেই বিষণ্ণ ছায়া। ওই বিষণ্ণতায়ই ধরা পড়ছিল মনের ভিতরটায় কিরকম ক্লেদ জমা হয় ঈর্ষায়।

মেরীর মতোই আমিও এখন দাঁড়িয়ে আছি দেয়ালের এক কোণের দিকে। সামনেই বিক্ষুব্ধ সমুদ্রস্রোত এগিয়ে আসছে—আর তার সঙ্গে ঢেউগুলো সাদা সাদা ভেড়ার দলের মতো জোর ছুটতে ছুটতে ঝাঁপিয়ে পড়ছে সামনের দিকে, তীরের উপর ভেঙ্গে পড়ছে প্রচণ্ড আওয়াজ তুলে। বনের মধ্যে ঝড়ের দাপটই যেন! পাহাড়ের পাথরে পাথরে চূর্ণবিচূর্ণ হতেই ঐ গর্জন রূপান্তরিত হবে হাজার হাজার ছোট ছোট কলরবে, আর ঢেউগুলো তীর থেকে দূরে সরে যেতে যেতে ভেঙ্গে ভেঙ্গে দেখা দেবে লক্ষ লক্ষ ধ্বনির সমবেত ঐকতান। আমার স্বপ্নজগৎ থেকে বেরিয়ে আসতেই ফিরে দেখি মেরী দাঁড়িয়ে আছে আমার পাশেই। সেও কি শেষ পর্যন্ত তার দুঃস্বপ্ন থেকে বেরিয়ে এসেছে, বেরিয়ে এসেছে প্যারিস ও সেনেগাল থেকে?

ওর বাহুটা জড়িয়ে ধরে বললাম—'অতীতটা ভুলে যাও। আমার কাছে এটাই হবে তোমার সবচেয়ে বড় অনুগ্রহ।

'হ্যাঁ, তোমাকে—তোমাকে ক্ষমা করলাম, কিন্তু তুমি কি বুঝতে পারছ না স্রেফ এই নিয়েই আমি তোমার সঙ্গে কথা বলতে চাই। সেসময় আমি কী যন্ত্রণায় যে জ্বলেছি, তুমি যদি জানতে! আমি ছিলাম তখন আমার আত্মীয়দের সঙ্গে—ভেবেছি পারিবারিক পারিবেশেই আমার দুর্ভাবনা তলিয়ে থাকবে। আমার বন্ধুদের সঙ্গে ঘুরে বেড়িয়েছি ঘণ্টার পর ঘণ্টা। তবে, প্রায় সময়েই তো থাকতাম বাড়ীতে···দিনে দিনে চলছিলাম ক্ষয়ে ক্ষয়ে···কিছুই তো করার নেই আমার। "ফোটম্যান···বিয়ে করেছে!···প্যারিস!"—আমার মাথার শুধু ঐ শব্দ তিনটি!'

মেরীর পিছনে দাঁড়িয়ে আমি হঠাৎ হৃদয়ের এক কোমল উচ্ছ্বাসে ওকে আমার দিকে টেনে নিলাম। আর যেন সামলে থাকতে না পেরেই মেরীও আমাকে জড়িয়ে ধরল—মাথাটা রাখল আমার কাঁধের উপর। কয়েক মুহূর্ত চুপ করে রইল। বুঝলাম, এত বছর ধরে যে অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করছিল এতদিনে তার দাগ ধুয়ে মুছে গেল। আমরা দুজনেই খুব অভিভূত।

আমি ফিসফিস করে বললাম—'মেরী, চলো এবার ফিরে যাই! দেরী হয়ে যাচ্ছে। ওরা যখন তোমার মধ্যে এই বিশ্বাসটাই বদ্ধমূল করে ফেলেছে যে আমি বিয়ে করেছি, আহা তখন যদি একবার তোমার কাছে আসতে পেতাম!'

আমরা দুজনে হাতে হাত ধীরে ধীরে হেঁটে ফিরে এলাম আমাদের বাড়ীতে—সারাটা পথ কথা বলতে বলতে। মেরী তার কাহিনী এবার বলে চলল আরো শান্তমধুর কণ্ঠে।

'আমি জানি আমার জন্যে তুমি সব করতে। কিন্তু সে সময় কেউই নেই আমার—বুঝতে পারছ? কেউই তো আমার পাশে এসে দাঁড়াতে পারছে না! কতকগুলি বস্তু আছে যা নিজেকেই সামলাতে হয়। শেষপর্যন্ত আমি তাই শিক্ষয়িত্রীর কাজ নিলাম একটা বোর্ডিংস্কুলে। আমার অধ্যয়ন-পর্ব সমাপ্ত হলে আমি ঐ কাজে আত্মহারা হয়ে রইলাম। ঠিক এইরকম কিছুই চাইছিলাম: এমন একটা কাজ যাকে আশ্রয় করে আমি অবিশ্রাম এগিয়ে চলতে পারি রাতদিন—তেমন মেয়েদের দেখাশোনা করা যাদের বেশীর ভাগই জীবন-সম্পর্কে হয়ে উঠেছে সচেতন, কেউবা হতে চলেছে। তাদের কারু কারুকে উপদেশ-নির্দেশ দিতাম। যারা মাত্রা ছাড়িয়ে চলত শাস্তি দিতাম। সত্যিই, আমার উপরে এতটা দায়িত্ব এসে পড়ল যে আমার একান্ত নিজের ভাবনার জন্যে কোনো সময়ই পেতাম না। সব সময়েই ভেবেছি এই তোমাকে চিঠি লিখি।

সত্যি বলতে কি শত শত চিঠি একের পর এক। লিখতে যাচ্ছি কি, এই কথাটা ভেবেই মুষড়ে পড়ছি—তুমি আমার সঙ্গে প্রতারণা করলে? ফোটম্যান, তুমি ফিরে এসে ভালোই করেছ।'

'তোমার সঙ্গে আবার একত্র হতে পেরে খুবি সুখী আমি। জেনে সুখী যে ওসব এখন শেষ হয়ে গেছে—তোমার দুর্ভাবনা সব ধুয়ে মুছে গেছে।'

আমরা বাড়ীর দিকে যাচ্ছিলাম। ইতিমধ্যে অন্ধকার হয়ে গেছে চারদিক। আমাদের দেখেই মামীরা হেসে উঠল খিলখিল উচ্চহাসি। আমি আশ্রয় নিলাম আমার ঘরে। মেরীও নিশ্চয়ই তাই করত, কারণ আমি এখন আর ওকে দলের মধ্যে দেখতে চাই না।

'মেরী, ফোটম্যান! খাবে এসো!'—আমার বড় মামী গলা ছেড়ে ডাক দিল।

আমি ভাবছিলাম—ওদের সব সময়েই ঐ একই ধারা। আমাদের একটুখানি নিরালা থাকতে দেবে না! সব সময়েই আমাদের দুজনের নাম ধরে চেঁচাতে থাকবে? আমরা দুজনে যখন একটু শান্তিতে ও নিরালায় থাকতে চাই—এমন করে দুজনের নাম ধরে ডাকতে থাকবে, পরিবারের সকলেই যাতে শুনতে পায়। আমরা কেউই জবাব না দিলে আবার ঝংকার দিয়ে উঠবে ওই গলা—'আমার কথায় সাড়া দাও আর না দাও, আজ এই রাত থেকেই তোমরা দুজনে একসঙ্গে খাবে, বুঝলে? তোমাদের ওই লাজুক লাজুক ভাব দেখে যথেষ্ট হয়েছে আমাদের!'—তারপর বাড়ীর ছেলেপিলেদের উদ্দেশে বলল—'যা, চলে যা এখান থেকে, বাইরে গিয়ে খেলা কর্। নয়তো বাইরে ঘুরে আয়। তোদের মামাতো দাদা আর তার মেয়েটা এইঘরে একসঙ্গে খাবে এখন।'

'ওরা, থাকুক না। মামী, ওরা কাছে থাকলে ভালই লাগে আমার।'—বললাম আমি।

'ওরা তোমার কাছে থাকলে যে ভালোই লাগে জানি আমি। তবে, এটাও জানি ধারে কাছে কেউ থাকলে তুমি একগ্রাসও মুখে তুলবে না। তোমার ওই মেয়েটিও নয়। আহা, কী লজ্জারে বাবা।'

শেষপর্যন্ত খেতে শুরু করলাম আমরা। আমিই কথা শুরু করলাম—'জানলে, ওখানে জীবনটা খুব আরামের নয়।'

'প্যারিসে?'

'হ্যাঁ। স্টেট থেকে বা কারো বাবামার কাছ থেকে কোনোরকম ভাতা না পেলে জীবনটা খুবি কষ্টকর ওখানে। আমি তো ভাবছি তুমি এখানে এই গিনিতে আমার জন্যে অপেক্ষা করলেই বরং বিবেচকের মতো কাজ হবে। দুই কি তিন বৎসরের মধ্যে আমি ফিরে এলেই বিয়ে হবে।'

'দুই কি তিন বৎসর !'—প্রতিধ্বনি করে উঠল মেরী।

ঠিক সেই মুহূর্তেই আমার মামা আমাদের ঘরটায় ঢুকলে মেরী তাকে বলল আমার ভয়-ভাবনার কথাটাই।

মামা আমাকে সম্বোধন করে বললেন—'ফোটম্যান, তোমাদের বিয়েতে কেন আমরা মত দিয়েছি ? আমি নিজেই ব্যক্তিগতভাবে কেন সমর্থন জানিয়েছি ? যেহেতু আমি জানি মেরী বড় সরল মেয়ে, সরল মনের পরিবারেই জন্ম ওর। আর, আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকেও বলতে পারি আমরা এত বছর খাইয়ে পরিয়ে ওকে নিয়ে এই বাড়ীতে থেকেই তো দেখেছি—তোমার মামীমায়েরা ভালোমনে যখনি যাকিছু দিয়েছে খুশি হয়েই ও গ্রহণ করেছে। সব সময়টা কাটিয়েছে ভদ্রভাবে, ওর ঘনিষ্ঠদের মধ্যে যারা অনেক বেশী ভাগ্যবান বা ভাগ্যবতী তাদের কাউকেই কখনোই ঈর্ষার চোখে দেখেনি·· আমি তোমাকে এই বলছি— বারবার করে বলছি—তুমি এসব নিশ্চিতভাবেই বিশ্বাস করো।'

'ঠিক আছে, মামা। কিন্তু ওখানে যা ঠাণ্ডা। পোশাকের জন্য দাম গুণতে হবে, তারপর ঘর, আমার কলেজের মাইনে—এত সব জোগাতে হবে—কি দিয়ে জোগাব ? স্টেট থেকে তো 'স্টাডি স্কলারশিপ' পাব না। পাবার চেষ্টা করেও একটা হল না। ওখানে জীবন কাটানো বড়ই কষ্টকর, মামা !'

'তা, এসব তো ভালো কথা নয়। তুমি আমাকে বলতে চাইছ যে মেরী ওখানে গিয়ে না খেয়েই মারা যাবে ?'—হাসতে লাগলেন মামা—'তা, সে-কিন্তু তোমার সঙ্গেসঙ্গেই থাকবে, সবসময়ই তোমাদের ভবিষৎ সুখের জন্য মেরী নিজেই নিজের দিক থেকে কিছু করতে পারলে বরং খুশিই হবে। আমি সাহস করে এটাও বলতে পারি— মেরী তোমার পদ বা অর্থের জন্যেই যে তোমাকে বিয়ে করেনি সেটা দেখাবারই একটা সুযোগও পাবে। শেষ কথা বলছি তোমাকেই—এটা মনে রেখো যে তুমি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কোনো মেয়েকে বিয়ে করছ না। বিয়ে করছ তোমার মতোই এক সাধারণ ঘরের মেয়েকে··· ।'

'ঠিক আছে, মামা ।'—আমি বললাম।

মেরী খুশি হয়েই জবাব দিল—'হ্যাঁ, এই মামাদো বুঝেছেন আমার প্রাণের কথা—আমি ঠিক কী বলতে চাইছিলাম।'

মামা বললেন—'সত্যিই খোকা, তোমার শ্বশুরমশাই নতুন কাজে যোগ দিয়ে চলে যাবার আগে জানিয়ে গিয়েছেন বৈবাহিক কাজকর্ম যেন শাস্ত্রমতেই হয়। আমরাও তাই মসজিদে গিয়ে রীতিমতোই কাজ করছি। নাগরিক আইনসঙ্গত বিয়েটা যখন খুশি করে নিতে পারবে। সেটা শক্ত কিছু নয়।

কোনো টাউনহলে গিয়ে মেয়র বা অন্যকোনো পদস্থ অফিসারের সামনে হাজির হওয়া—এই আর কি।'···

কিছুক্ষণ নীরব থেকে মামা এবার গম্ভীর। একটুকরো কোলা সুপুরী মুখে পুরে সেটা চিবোতে চিবোতে মামা বলে চললেন (ছাগলের মতোই নড়তে লাগল চোয়াল)—'আমি তাহলে সানন্দেই জানাচ্ছি, আজ এই রাত থেকেই—তোমার শ্বশুরের নির্দেশ অনুসারে এবং আমাদের সমর্থন মতো, এই এখন যে তোমাদের সঙ্গে কথা বলছি এই শুভলগ্ন থেকেই মেরী হল তোমার স্ত্রী। এখন থেকে ঈশ্বরের এবং মানবের দৃষ্টিতে তোমরা দুজনে স্বামী আর স্ত্রী। আমার ছোটভাই সেকৌর ঘরটায়ই থাকতে পারো—তোমরা নতুন কোনো অভিযানে নামবার আগ পর্যন্ত। তা, জীবনটা তো কেবল অভিযানের পর অভিযান। বুঝলে ফোটম্যান, আমি তো তাই জেনেছি এবং তোমার কাছে সেটা তুলে ধরাই মনে করছি আমার অধিকার ও কর্তব্য।'

আমার শাদীর ঘটনাটা সত্যিই হ'ল বেশ একটা অভিভূত হবার মতো ঘটনা। তাহলে এখন থেকে মেরী আমার সহধর্মিণী !···মামাদো অর্থাৎ মামার ভাষণের পরেই তিনি আমাদের রেখে গেলেন—একা আমাদের ভাব-ভাবনা নিয়ে নিরালা।

মেরী জানতে চায়—'ফোটম্যান, তুমি সন্তুষ্ট তো ?'

'হ্যাঁ, খুবি সন্তুষ্ট। তুমি ?'

'আমি আজ এই দুনিয়ায় সবচেয়ে সুখী মেয়ে···'

লেখক : ভিনসেট চুক্যুয়েমেকা আইক

এই লেখক আফ্রিকীয় সাহিত্য-জগতে জীবনী-ভিত্তিক উপন্যাসের একজন বিশিষ্ট শিল্পী। পরিবার ও পারিপার্শ্বিক সমাজজীবনের নিখুত চিত্রণে লেখক সত্যনিষ্ঠরূপেই নির্ভীক—তাই বলতে পেরেছেন পারিবারিক-সামাজিক ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান-কেন্দ্রিক অনাচার ব্যভিচার অত্যাচার, অন্যায়কে আস্কারা এবং দুর্নীতির মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, এবং সেইসঙ্গেই সুনীতি ও সৎ আদর্শের দিকে আগ্রহ ও অধিকারের কথা।

লেখক তাঁর 'কুমোরের চাকা' নামক কিশোর উপন্যাসে চমৎকার তুলে ধরেছেন অবু নামক তীক্ষ্মবুদ্ধি একটি দুরন্ত বালককে। বাড়ীতে মায়ের আস্কারা থেকে তার বিবেচক পিতা তাকে সরিয়ে নিলেন, শোধরাবার জন্যেই চাকর হিসাবে রেখে দিলেন তাকে শ্বেতাঙ্গ প্রধান-শিক্ষকের বাড়ীতে, এবং সেখানে তাঁর জাঁদরেল গিন্নীর দাপটে অবু যেমন ঠাণ্ডা হতে বাধ্য হল তেমনি কঠিন পরিশ্রমে ও নিয়মানুবর্তিতায় হয়ে উঠল কর্তব্য-সচেতন। অবুকে যখন ফিরিয়ে আনা হল তখন সে এক রূপান্তরিত কিশোর—তীক্ষ্মবুদ্ধি এবং দায়িত্বশীল।

আমার এই সর্বশ্রেষ্ঠ কিশোর গল্প-সংগ্রহে আমি তুলে ধরেছি ঐ 'কুমোরের চাকা' গ্রন্থ থেকেই—অবুদের পরিবার পরিবেশ ও প্রতিবেশীদেরই একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র। লেখকের ভাষায় বর্ণনাভঙ্গী চরিত্র-চিত্রণ এবং ঘটনার বাস্তব স্বচ্ছতা খুবি উপভোগ্য।

প্রতিবেশী

॥ ১ ॥

আঙিনার বাইরে অবু তার বাবার সাইকেলের আওয়াজ পেতেই কাঠের চশমা বানানোর কাজটা রেখে ফটকের দিকে দৌড়ে এল। অবুর বাবা মাজি-লাজা নেমে পড়েছেন, কিন্তু সাইকেলটাকে তখনো দাঁড় করিয়ে দেননি।

'বাবা, আমি সব ক্লাশে প্রথম হয়েছি—সর্বপ্রথম। দিদি পাশ করতে পারেনি।' এক নিশ্বাসে বলে ফেলে হাঁপাতে থাকে অবু।

ইতিমধ্যে মাজি সাজা সাইকেলটাকে লোহার দুটো পায়ের উপর দাঁড় করিয়ে দিতেই অবু জড়িয়ে ধরল বাবাকে। বাবা অবুর মাথার কাছে নুইয়ে পড়ে আবার জিজ্ঞেস করেন—'কি বলছিলি?'

'আমি প্রথম হয়েছি।'

বাবা সগর্বে অবুকে তুলে ধরলেন মুখের সামনে, তারপর নামিয়ে দিলেন মাটিতে। অবুর খুব ভালো লাগে এটা। বাবা এবার ছেলেকে ছুঁড়ে দিলেন উপরে—একের পর এক তিনবার, ধরে নিলেন, এবং শেষবারে ছেলের কাছে বললেন যে এই ব্যায়াম দেখানোর পক্ষে এখন সে একটু ভারীই হয়ে উঠেছে।

'ও, তাহলে এটা হল তোর বইয়ের খেলা—তোর ওই বড় মাথাটার মধ্যেই সবকিছু!'—ছেলেকে নিয়ে মস্করা করেন বাবা। অবু ইশারায় জানায় আবার বাবা তাকে উপরে ছুঁড়ে দিন না?

'ঠিক আছে। আর একবারই শুধু। এখন তো আর শিশুটি নস্ রে!'—এই বলেই বাবা অবশ্য অবুকে আহ্লাদ দেবার জন্যেই আরো তিন-তিন বার ছুঁড়ে দিলেন উপরে, তারপর সাইকেলটাকে নিয়ে এলেন আঙিনার ভিতর। বাবা সাইকেল থেকে একটা মোড়ক নিয়ে খুলছেন—অবু দেখছে চেয়ে চেয়ে।

'এই যে, পরীক্ষায় এত ভালো করেছিস, সেজন্যেই তোকে দিলাম।' বাবা অবুর হাতে দিলেন চকচকে লাল টিনের লম্বা একটা বাঁশী—ছাপ মারা: 'জাপানে তৈরী'।

আহ্লাদে অবু ডগমগ, হাতে নিয়েই মুখে ধরে—বাজিয়ে চলে একটানা তীক্ষ্ন সুর। বাবা দেখিয়ে দেন বাঁশীটার গায়ের ছেঁদা আঙুল দিয়ে বন্ধ করে করে কীভাবে বাজানো যায় নানান সুরে। অবু তার বন্ধুদের কাছে তার এই নতুন সম্পত্তিটা দেখাবার আগ্রহে ছুটেই যাচ্ছিল আর কি, বাবা টেনে ধরে জানতে চান—অবু তার এই চমৎকার পরীক্ষাফলের জন্যে পুরস্কার-স্বরূপ কী চায়।

'আমাকে একটা ছাগল দেবে, বাবা।'

'বড়দিনের ছুটিতে ঠিকই পাবি। আর কিছু?'

'বাইসাইকেল চড়াটা শিখতে চাই, বাবা।'

—কিন্তু এটা তো একটা অদ্ভুত অনুরোধ। অবু এর আগেও একবার বলেছিল বটে, কিন্তু মাজি-সাজা ও অবুর মা দুজনেই একযোগে তা বাতিল করে দিয়েছিলেন। মায়ের মতে অবু এখনো এত বাচ্চা যে বাইসাইকেল চালানোটা ওর কাজ নয়। সাইকেলটা যদি ওকে নিয়েই চলে যায়, মেরেই ফেলে

ধাক্কা মেরে ? কে তাকে আর একটা ছেলে দেবে আবার (ওব্ুই তো তার সাত সন্তানের মধ্যে একটিমাত্র ছেলে) ? না, না, ও আরো একটু বড় হ'ক, আরো একটু শক্তসমর্থ হ'ক। বাবা মাজি-লাজা ব্ুঝলেন বড্ড পিছল জায়গায় দাঁড়িয়ে আছেন। পলিকার্প—অব্ুর সমবয়সী, সে তো এই ছ'মাস হল সাইকেল চালাচ্ছে। বাইসাইকেলের সিটে বসলে তো পা দ্ুটো পেডালের নাগালই পায় না। বাইসাইকেলের ফ্রেমের উপর বসেই ঠিক চালিয়ে যায়, নয়তো ফ্রেমের নিচে ঝ্ুঁকে পড়ে চালায় 'বানর-ভঙ্গীতে'।

'ঠিক আছে। আমার বাইসাইকেলটা দিয়েই চালাতে শিখে নে।'

অব্ু মহা খ্ুশিতে বাড়ী থেকে বেরিয়ে যায় এক ছ্ুটে—তার নতুন বাঁশীটা দেখাবে আর বাবা যে সাইকেল চড়ার কথা দিয়েছে সেটাও ঘোষণা করবে তার খেলার সঙ্গীদের কাছে। অটির বাড়ীর কাছাকাছি এসেই অব্ু ছাড়ল এক বিশেষ ধরণের অর্থবহ আওয়াজ, কিন্তু কোনো সাড়া পেল না। তা, এতটা এসে একবার বরং বাড়ীর মধ্যেই ঢোকা যাক—অটি হয়ত ঘ্ুম্ুচ্ছে এখনো। ওটির মার কাছ থেকে জানতে পেল—অটি গেছে স্যাম্ুয়েলের সঙ্গে তাদের বাড়ীতে।

স্যাম্ুয়েল ? সেই গ্ুণ্ডাটা, প্রতারকটা, সেই ফন্দিবাজটা। অব্ু আর অটি—দ্ুজনেই সমান ঘ্ৃণা করে ওই স্যাম্ুয়েলকে। সে কি ঘ্ৃণা, না ভয় ? অথবা অবচেতন মনের আশঙ্কা ? স্যাম্ুয়েল বয়সে ওদের চেয়ে বড়োই, তব্ু কিনা সে ইচ্ছে করেই ওদের সঙ্গে মেশে। বেঁটেখাটো চেহারাটাই আসলে ঢেকে রেখেছে ওর বয়সটা। অব্ু এবং অটি বলে ওকে বেঁটে শয়তান,—তবে শ্ুনতে পাবে না এমন দ্ুরত্বটা বজায় রেখেই। কারণ একবার শ্ুনতে পেয়েছে কি ওরকম অপমানকর কথার জন্যে ঘ্ুষি মেরে ওদের চোখের মণি বার করে তবে ছাড়বে।

…অব্ু কি এবার অটির খোঁজেই যাবে স্যাম্ুয়েলের ওখানে ? না, তা সে করবে না। কোনো ছেলেই স্যাম্ুয়েলের কাছে ধরা দেবে না। কিন্তু একটু পরেই মত বদলে ফেলল অব্ু। ধারে কাছে আর কেউই নাই তো, কারো সঙ্গে তার স্ুখবরটা তো ভাগাভাগি করে নিতে হবে। স্যাম্ুয়েল অটিকে যদি সারাটা দিনই আটকে রাখে—যা সে করতেই পারে। কিন্তু এই স্ুখবরটা অনিশ্চিত কাল বয়ে চলতে হলে তার ভারে সে তো ভেঙেই পড়বে। অব্ু দৌড়ে চলল স্যাম্ুয়েলের বাড়ী।…

কিন্তু একবার ওর খর্পরে পড়েছ কি তোমাকে দিয়ে একবস্তা গম না ভাঙিয়ে ছাড়ছে না—বাবা-মা ডেকে পাঠালে তবেই ছাড়া পাবে। অব্ু ও অটি ছাড়া পাবার একটা কৌশল বার করেছিল। কাজ করতে করতেই হঠাৎ

এক চিৎকার—'মা !', এবং বলা যে মা ডাকছে। তখন তো ছাড়তেই হয়। কারণ, এটা মুক্তি পাবার মতোই কারণ একটা। এই ফন্দীটা ভালোই কাজ করছিল—কিন্তু সেবার মোজেস নামে একটা ছেলের সঙ্গে অটির যখন ঝগড়া হল, মোজেসই বলে দিয়েছিল ওদের এই চালাকিটার কথা। সেদিন থেকেই স্যামুয়েল নিয়ম করে দিল—সে নিজকানে না শুনলে, 'মা ডাকছে' বললেই হবে না।

অবু জানে সে যদি দৌড়ে পালিয়ে যায়, স্যামুয়েল ঠিকই শুনতে পাবে পায়ের শব্দ, এবং বুঝতে চেষ্টা করবে কে ছুটে যাচ্ছে, এবং কেন? এবং তখন একবোঝা দানা ভাঙ্গতে হবেই। অবু তাই ঠিক করল কি, বিড়ালের মতো পা টিপে টিপেই সরে পড়ছে। কিন্তু স্যামুয়েল ওর চেয়েও চালাক। স্যামুয়েল বসে ছিল তার বাবার ব্যবহার-করা ফিতের চেয়ারটার উপর—বসে বসে রোদ্দুরে দাঁড়িয়ে দেখছিল অটির গম ভাঙ্গা। কিন্তু দরজার ফাঁক দিয়ে অবুর অজান্তেই সে নজর রাখছিল অবুর দিকে। হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল—'সরে পড়ছিস যে! তোকে দেখেছি আমি।'—চেয়ার থেকে লাফিয়ে পড়েই দরজার দিকে ধেয়ে গেল। দ্বিতীয় একটি লোক পাওয়া গেছে সাহায্যের কাজে, পালিয়ে না যায়। অবু ভেবেচিন্তে তখন কিছুটা-হাঁটা কিছুটা-দৌড়োনো মতো ক'রে দরজার ফটকের কাছে এসে গেছে।

'অবু, এই এক্ষুনি আয় এখানে।'

অবু বুঝল এখন আর না শোনার ভাণ করতে পারছে না। মোড় ফিরে দাঁড়াল—বিস্ময়ের ভাব দেখিয়ে।

স্যামুয়েল বলে ওঠে—'কি, পালাচ্ছিলি যে?'—দুএক পা এগিয়ে আসে অবুর দিকে।

অটি সাহস করে গম ভাঙ্গা ছেড়ে দেয়, স্যামুয়েলের অজান্তে পা টিপে টিপে ফটকটার দিকে যায়।

অবু বলে ওঠে—'আমি তো পালাচ্ছিলাম না।'

'বহুৎ আচ্ছা! পালিয়েই যখন যাচ্ছিলে না, এগিয়ে যাচ্ছিলে কেন?'—স্যামুয়েল এমন করে চেপে ধরে যে সোজাই দেখাতে চায় তার বাজে কথা বলার সময় নাই।

'আমি এসেছিলাম অটির খোঁজে, কিন্তু দরজা খুলে যখন দেখলাম কেউ নেই—চলেই যাচ্ছিলাম।'

'ও, তাই নাকি? আমি তো ভেবেছিলাম আমাকে দেখে তুই ইচ্ছে করেই পালিয়ে যাচ্ছিলি। এবারে ভিতরে আয়, দেখতেই পাচ্ছিস আমি বাড়ীতেই আছি।'

'না, এখনি আমাকে যেতে হবে অটির মায়ের কাছে, গিয়ে বলতে হবে অটি এখানে নাই।'—অবু মিথ্যে কথাই বলে যাচ্ছে—'উনি আমাকে পাঠিয়েছিলেন অটির খোঁজে—ওকে সঙ্গে করেই নিয়ে আসতে বলেছেন, একটুও দেরী না ক'রে।'

'এই তো আমি এখানে।'—চেঁচিয়ে বলে অটি, এগিয়ে আসে। হঠাৎ যেন একটা ব্যাঙ বেরিয়ে পড়ল তাজা হাওয়া টেনে নেবার জন্যেই। হাত থেকে ধুলো-গুঁড়ো ঝেড়ে নিল সে। স্যামুয়েল অমনি ঘুরে দাঁড়ায়, ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে থাকে—কি, এত বড় সাহস, তার অনুমতি পাবার আগেই বিনা গম ভাঙ্গা ও গুঁড়ো করাটা ফেলে রাখা?

স্যামুয়েল কড়াভাবেই জিজ্ঞেস করে অবুকে—'অটির মা তোকে এখানে খবর দিয়ে পাঠিয়েছে—কথাটা কি ঠিক? তোর জবাবটা দেবার আগেই জানিয়ে রাখছি—মিথ্যেটা বলেছিস তো জ্যান্তই তোর চামড়াটা তুলে নেব।'

অবু এড়ানো ভাবেই বলে—'এইমাত্রই তো আমি অটির মায়ের ওখান থেকে এসেছি।'

'ঠিক আছে। এখানেই অপেক্ষা কর্, আমি অটির মায়ের কাছ থেকে সত্যিটা জেনে আসছি।'

'বেশ, তাই হবে।'—অবুও সুযোগ নেয়, মনে মনে ভরসা স্যামুয়েল আর অতটা দূর গিয়ে জেনে নেবার মতো কসরৎটা করবে না। যদি যায়ই তো, অটি তখন পালিয়ে যেতে পারবে স্যামুয়েল ফিরে আসার আগেই। তবে কিনা, দুজনকেই তালাবন্ধ করে না যায়, এবং ও তা করতেই পারে।

অবুর কথাটা সত্যি কিনা পরখ করতে যাবার মতো ভাবখানা দেখায় স্যামুয়েল, কিন্তু সে দেখল যে একেবারে অনড় ভাবটাই বজায় রাখছে অবু। স্যামুয়েল তাই শেষপর্যন্ত ধরে নিল যে অবু খেল খেলাচ্ছে না। তাই রুষ্ট হলেও অটিকে সে ছেড়েই দিল।

অটি জিজ্ঞেস করে অবুকে—'তুইও যাচ্ছিস তো?'

'হ্যাঁ, অটির মা চাইছে আমাদের দুজনকেই।'

'ঠিক আছে। একাই পারব। তোদের ছাড়াই আমি বেশ জাঁতা ভাঙার কাজটা করতে পাব। বুঝলি, তোরা দুজনে মিলে যা করতিস তার চেয়েও জলদি।'

অটি আর অবু আলগোছে পা বাড়িয়েছে কি, স্যামুয়েলের নজরে আসে অবু কী একটা যেন তার জামার তলার লুকোবার চেষ্টা করছে। সে অমনি জানতে চায়—'অবু, জামার তলায় ওটা কি?'

'কিছু না।'—অবু তার বাঁ কনুইটা দিয়ে বাঁশীটা চেপে রেখে দুই

হাতের পাতা মেলে ধরে। স্যামুয়েলের হাতে একবার যদি ওটা পড়ে তো ও কী যে করবে তা ঠিকই জানে অবু। ওই গুন্ডাটার সব সময়েই কেবল ঈর্ষা। নিজের নাই, অথচ একটা বাচ্চাছেলেরও যদি সেই খেলনটা থাকে তো অমনি ভেঙ্গে তবে ছাড়বে।

'ঠিক আছে, যদি কিছু ধরেই না থাকিস তো, হাত দুটো মাথার উপরে রাখ্ বলছি— ঠিক যেমনটা রাখে জার্মান যুদ্ধবন্দীরা।'

অবু তুলে ধরল তার ডান হাতটাই শুধু, গাইগুঁই করে জানাচ্ছিল তার বাঁ হাতটায় ব্যথা আছে। স্যামুয়েল হঠাৎ লাফিয়ে পড়ে অবুর উপর, সুড়সুড়ি লাগায় বাঁ বগলের তলায়। এরপর দুজনে যা ধস্তাধস্তি শুরু হল তাতেই মাটিতে পড়ে গেল অবুর নতুন বাঁশীটা। স্যামুয়েল অমনি পা রাখে বাঁশীটির উপর, হুমকি দেয়—অবু যদি আর একটুও তাকে প্রতিরোধ করতে চায় তো পা দিয়ে পিষে থ্যাতলা করে দেবে বাঁশীটা। অবু নতি স্বীকার করে। স্যামুয়েল বাঁশীটা তুলে নিয়ে বিদায় জানায় ছেলে দুটোকে—অবুর বাঁশীটা নিয়ে বড় বড় পা ফেলে ঢুকে পড়ে আঙ্গিনার মধ্যে!

'ভগবান তোমাকে ঠিক শাস্তিই দেবেন।'—অবু চাপা গলায় গশগশ করে, কোনোক্রমে ঠেকিয়ে রাখে দুচোখের উপচে-ওঠা অশ্রু।

অটি পরামর্শ দেয়—'প্রথমেই আমাদের উচিত এখান থেকে চলে যাওয়া।'—স্যামুয়েলের থাবা থেকে ছাড়া পেয়ে খুশিই সে।

বাঁশীটার হাল সম্পর্কে বাবার কাছে জানাবার মতো সাহস ছিল না অবুর। যদি কোনো জিনিষ হারিয়ে যাওয়ার কথা বলে তাঁর কাছ থেকে, ব্যাপারটা শুনবার আগেই বাবা সবসময়েই ধরে নেবেন অসাবধান হবার দোষটা অবুরি! এবং তারপরেই শুরু করবেন সাবধানতার গুণ সম্পর্কে এক লম্বা বক্তৃতা— এবং আদর্শ উদাহরণরূপে তুলে ধরবেন নিজেকেই···

অবুর বরং মনে হল গোপন ব্যাপারটা প্রথমেই বলা সাজে মায়ের কাছে। মাই ভালো জানে কোন্ কোন্‌টা হারালেও অবুর বাবাকে বলা যায় না, আর কোন্‌টা দুঃখজনক হলেও জানাতেই হবে।···

গির্জা থেকে অবুর মা বাড়ী ফিরছিল হাল্‌কা খুশিতে, গুণগুণ করে গাইছিল গির্জার বিশেষ এক আনন্দ-উৎসবের গান। আর অবু তখনি এসে শোনাতে লাগল তার বাঁশীর কাহিনী।

'স্যামুয়েল আবার? সেই বুনো শুয়োরটা?'—সবটা শুনে চীৎকার করে উঠল অবুর মা। তার হাতের থলেটা অবুর হাতে ফেলে দিয়েই ঝড়ের মতো ছুটে গেল স্যামুয়েলের মায়ের বাড়ীর দিকে, সারাটা পথ চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলছিল—স্যামুয়েলই হক বা তার কোনো সাগরেদই হক, কাউকেই সে

তার একমাত্র ছেলে অবিয়ানোকে তার বুক থেকে ছিনিয়ে নিতে দেবে না। পথে পথে যে-ই জানতে চায় অবুর মাকে এত উত্তেজিত দেখাচ্ছে কেন, বলে যায় বাঁশীর কাহিনী। আর সকলেই একে একে মত দিল—মায়ের কুলাঙ্গার ছেলে ওই স্যামুয়েলের বিরুদ্ধেই।

স্যামুয়েল অবুর মার গলাবাজি আর শাসানি শুনতে পেয়েই বাঁশীটা ফেলে রাখল মায়ের কাছে—অদৃশ্য হয়ে গেল এক মুহূর্তে। কোনো রকম শাস্তির সম্ভাবনা থাকলেই সে জানে দোষটা ঢাকতে হয় কেমন ক'রে, আর যতই কেন খোঁজাখুজি করো তার পাত্তা পাওয়া ভার। সবাই বলে যেমনটা—এই আছে, এই নেই ছেলেটা? যেন ইঁদুরের গর্তে ঢোকে আর বেরোয় যখন তখন। ইস্কুলের ছেলেরা বলে—ও তো একটা ভূত।

স্যামুয়েলের মা একটা নোংরা চেহারার বাঁশী তুলে ধরে বলে—'এটাই কি খুঁজে বেড়াচ্ছ? আমি তো এটা পেলাম রান্নাঘরের নোংরার মধ্যে।' তার কথা বলার ধরনে সে স্পষ্টতই বুঝিয়ে দিতে চাইছে, জিনিসটা এতসব হৈচৈ বাধাবার মতো কিছু নয়।

বাঁশীটা এক ঝটকায় কেড়ে নিয়েই ঝাঁঝিয়ে উঠল অবুর মা— 'ওই বুনো শুয়োরটা কোথায়?'

'কাকে বলছ বুনোশুয়োর?'

'তোমার শয়তান ছেলেকে, চেনো না?'

'আমার ছেলে বুনো শুয়োর নয়, তোমার ছেলে!'

অবুর মা বলে গলা নামিয়ে বলে—'তাইতো দেখছি।' স্যামুয়েলের মায়ের আকস্মিক উদ্গার দেখে বিস্মিতই হল সে, বলতে লাগল—'ও, লোকে তাহলে ঠিকই বলে তোমার ছেলের বদকাজের জন্যে দায়ী হলে তুমিই। ওকে তুমিই আগলে রাখো, ওর পাপকে পোষো ঢাকা দিয়ে?'

'যাও যাও, যার যা নিয়ে মাথাব্যথা নিজের ঘরে গিয়েই দেখাক গে। এখানে আমার ঘরে এসে হামলা কেন। সেজন্যে এখানে এসেছ নাও, নিয়ে ভেগে পড়ো।'

'ঠিক আছে। ব্যাপারটা যদি এইভাবেই দেখো তো, ওকে আগলেই ধরে থাকো তো একদিন একেবারে পাকা ফসল ঘরে তুলতে পারবে।'

অবুর মা বাড়িটার আঙ্গিনা থেকে বাইরে বেরিয়ে বাড়ির দিকে চলতেই —মুখের পাশ দিয়েই কী যেন শাঁ করে ছুটে গেল। সেটা যে কী ঠিক বুঝে উঠল না—মুখের মধ্যে কিছুট বালি ঢুকে গেল, থু থু করে ফেলে দিল। তাড়াতাড়িই পা চালিয়ে দিল। তবে দৌড়োচ্ছেই এমনটা না দেখায়। এবং তা থেকে স্যামুয়েল বুঝল তার তাক করাটা ফসকে গেছে—ঠিক চোখ দুটোতেই

একমুঠো বালি ছুঁড়েছিল। তাক করে এমন শিক্ষা দিতে চেয়েছিল যা কখনো আর ভুলবে না। অন্ধকারের জন্যেই ঠিকমতো তাক করতে পারেনি : পায়ের শব্দ এবং দেহের উচ্চতাটা থেকেই বুঝে নিতে হয়েছিল। আর এক-বার আওতায় পাবার জন্য যদি পিছু পিছু ছুটে যেত তো ধরাই পড়ে যেত। সে তার নোংরা আঙুলটা কামড়ে ধরে রাখল—ঠিক আছে আবার দেখা যাবে। যুদ্ধের সময়কার একটা শস্তা বাঁশীর জন্যেই তাকে বলা হল কিনা 'বুনো শুয়োর'—হ্যাঁ, এজন্যে আফশোস করতে হবেই।

॥ ২ ॥

অতিকায় যে রোডাইল-মোরগটা বাবা মাজি-লাজা কিনে এনেছেন মুরগীর বাচ্চা-কাচ্চাদের জাতটা উঁচুতে তুলবার জন্যে,—সেটাই বাধা দিচ্ছিল অবুর প্রভাতী ঘুমে। ওটার গলার একখানা ডাকেই শোনা গেল প্রভাতী ঘোষণা—ঠিক এলার্ম-ক্লকের মতোই। ক ক্কক আওয়াজ করতে করতে মুরগীরা আর বাচ্চা-কাচ্চারাও ঠিক যেন কাজের ঘণ্টার সঙ্গেসঙ্গেই শুরু করে দিল দিনের দৌড়ো-দৌড়ি—গুবরে কেঁচো ও অন্যসব পোকামাকড়ের জন্যে।···আলো-আঁধারিতে অবুর মা অবুর গায়ে হাত দিয়েই যেন পরখ করে নেয় ছেলেটা বেঁচে আছে তো। তারপরেই সে ওর কোমরের কাপড়টা দেখে নেয়।

'মা!'—অবু বলে ফিসফিস ক'রে—'বাবা মাঠে যাওয়ার আগে আমি উঠছি না। উঠি তো ক্ষেতের কাজে নিয়ে যাবে। আমার খাবারটা এমন জায়গায় রাখো যেন দেখতে পাই। বাবার ঘরটা তালাবন্ধ ক'রো না—আমি আজি সাইকেল চড়া শিখব।'

'শেখাবে কে?'—মা জানতে চায় ফিসফিস ক'রে।

'ডেভিড।'

'বাইসাইকেলটা ধরে ধরে শেখাবে—এমন শক্তপোক্ত কি সে?'

'হ্যাঁ মা। ওই তো পলিকার্পকে শিখিয়েছে।'

'ঠিক আছে। তবে ওই গুণ্ডা শুয়োর স্যামুয়েলটাকে যেন তোর কাছে ঘেঁষতে দিস না। ওর প্রাণটা শক্ত হয়ে গেছে ওর মরা-বাপের মতোই। আর সেজন্যেই এত বদরাগী। ছেলেটা তোকে ভালো চোখে দেখে না, সাবধান থাকিস। বাঁশীর কথাটা মনে আছে তো···'

অবুর বাবা মাজি-লাজা বাড়ীর পিছনের দিকের পায়খানাটা থেকে আসতে আসতে জিজ্ঞেস করেন—'কী বলছিলে, অবুর মা?' অবুর মা মিথ্যে করে

বলে—'প্রার্থনা আওড়াচ্ছিলাম। বিছানা থেকে উঠবার সময় অবুর পাছায় হাত দিয়ে দেখেছি—আজ সে প্রস্রাব করে দেয়নি।'

'চমৎকার!' অবুর বাবা অবুকে তারিফ করে বলে—'আর এক হপ্তা যদি এমনি চেপে রাখতে পারিস তো তোর নামেই একটা মুরগী মারব।'

···অবুর বাবা চলে যাওয়া মাত্রই অবু লাফিয়ে নামল বিছানা থেকে। ·· উত্তেজনায় অধীর, ছুটে গেল বাবার ঘরে—বাইসাইকেলটা আয়ত্ত করতে। বাইসাইকেলটা সত্যিই আছে! কেমন ভয় হচ্ছিল যদি না থাকে। হ্যাণ্ডেলের রডটা আকড়ে ধরল। তালাবন্ধ বাইসাইকেলটা। পাগলের মতোই চাবিটা খুঁজতে লাগল সারাটা ঘরময়। কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না। খুঁজতে খুঁজতে পেয়ে গেল বাবার বিছানার তলায়। বাইসাইকেলটাকে গড়িয়ে গড়িয়ে নিয়ে এল উঠানে। সোজাই কি ডেভিডের কাছে নিয়ে যাবে, না দরজির কাছে গিয়ে বড়দিনের ছুটির জন্যে বাবা যে জামাটার অর্ডার দিয়েছে তার মাপটা দিয়ে আসবে? ··

শেষ পর্যন্ত স্থির করল অন্যকিছু চেষ্টা করার আগেই চাই বাইসাইকেল চড়া। এতটা যে দেরী হয়ে গেল ভালোই হল! স্পষ্টই মনে আছে তার—সাইকেল-চালকেরা কিরকম করে থাকে: প্রথমে বাঁ পাটা রাখে পেডালের উপর, ডান পা দিয়ে মাটি ঠুকে ঠুকে বেগ এনেই সাইকেলটাকে এগিয়ে নেয় কিছুটা দূরে। ডান পা দিয়ে আবার মাটি ঠোকে, আর তার পরেই ডান পাটায় একটা দোলা লাগিয়ে চালিয়ে দেয় পেডাল। ব্যাপারটা তো এত সোজা। যথেষ্ট চটপটে সে, সাইকেলটাকে নিশ্চয়ই ধাক্কা খেতে দেবে না। কিন্তু পেডালটায় তার পাটা বেশ খানিকটা ছড়ে গেছে—হাঁটুর হাড়ে চামড়ার তলায় খানিকটা শাদা মাংস দেখতে দেখতে হয়ে উঠেছে রক্তাক্ত। সাবধানে পাঁচিলের গায়ে বাইসাইকেলটাকে ঠেকিয়ে রেখে বাইরে এল—খুঁজতে লাগল অষুধ-পাতা! কোনোটাই না পেয়ে উঠানে ফিরে এসে কিছু তেতোপাতা হাতে পিষে থেতলে তার রসটা লাগাল ক্ষতটার উপরে।

'এখন, আমার যখন একটা ক্ষত হয়েছে, আরো কোনো কষ্ট ছাড়াই শিখে ফেলতে পারব।'

ডেভিডের বাড়ীর পথে যেতে যেতে ভাবছিল—পায়ে না হেঁটে সাইকেল চড়ে দর্জির কাছে গিয়ে জামার মাপটা দিতে পারলে কী চমৎকারই না হত!

ডেভিড জ্বরে কাঁপছে তার আউমার (ঠাকুমার) বিছানায়। কালোরঙের পুরানো একটা কাঁথায় সারাটা গা জড়ানো।···

আউমা রোগটা ঠিক ধরেছে 'ইবা'। শব্দটার অর্থ হল ম্যালেরিয়া থেকে শুরু করে সংক্রামক যেকোনো ধরণের জ্বর।···

আউমা অবুকে দেখেই বলে উঠল—'দেখছিস না, কাঁথা মুড়ি দিয়ে ওই পড়ে আছে।'—ডেভিডের বিছানাটা দেখিয়ে দেয়—'ইবা ওকে চিৎ করে ফেলেছে, আমি এবার ইবাকেই চিৎ করছি—ইবাকে আর কেরামতি দেখাতে হবে না।'···

ডেভিড মুখ থেকে কাঁথাটা সরাতেই অবু বলে ওঠে—'বাবার বাইসাইকেলটা এনেছি। আমাকে শিখিয়ে দিবি, তাই।'

'না, কানো বাইসাইকেল নয় আজ।'—আউমা জোরের সঙ্গেই বলে দিল।

অসুস্থ ডেভিডকে সমবেদনা জানিয়ে হতাশ অবু চলল সাইকেলটা ধ'রে। এগিয়ে উঠানের বাইরে আসতেই একফোঁটা চোখের জল তার ডান গাল বেয়ে নেমে এল উপরের ওষ্ঠ পর্যন্ত, চেটে নিল জিভ দিয়ে। 'ডেভিড এই কালও তো ছিল সুস্থ—অনেকদিন থেকেই তো বেশ সুস্থ সবল। আর আজ যখন সে আমাকে চড়তে শেখাবে, ইবা কেন তাকে চিৎ করে রাখল! শিকারে যাব কি, হরিণই গাছে উঠে বসল···শামুকেরই কিনা পাখা গজাল!···'

এবারে কী করবে সে? বাইসাইকেলের ব্যাপারটা এখন থাকুক,—ডেভিড সেরে উঠে তাকে না শেখানো পর্যন্ত? না, তা করবে না—মনেপ্রাণে এতটা দূর এগিয়ে যাবার পরে। অটির পরামর্শ নিতে যাবে? না। অটি তার উপর রেগে আছে তাদের নতুন মালগাড়ীটার ব্যাপারে সাহায্য করতে এগিয়ে যায়নি তাই। তা, অটি এখন চড়তে শিখবার জন্যেও অনুরোধ করতে পারে। ডেভিডের সঙ্গে ব্যবস্থা করে এটা সে এড়াতেই চাইছিল।

পলিকার্প। হ্যাঁ, পলিকার্পের কাছে গেলে সেই শিখিয়ে দেবে। ঠিক ডেভিডের মতো ওস্তাদ নাই হল বা। পলিকার্প সাইকেলে বসেই খোশমেজাজে কথা চালিয়ে যেতে পারে না ঠিকই, কিংবা একহাত দিয়ে চালাতেও জানে না। হ'ক না, সোজা তো ইস্কুলে যায় আসে— একবারও পড়ে যায় না। আধমাইল দূরে পলিকার্পদের বাড়ী গিয়ে অবু পেল অস্বস্তিকর খবর—পলিকার্প তার দাদার সঙ্গে মাছ ধরতে গেছে অবুটু নদীতে। অবুও স্থির করল—না, আজ আর নয়। পলিকার্পের মা বড় একফালি সেদ্ধ আলু শবজির ঝোলে ডুবিয়ে এগিয়ে দিচ্ছিল অবুর দিকে, অবু তা দেখি-না-দেখি করে বেরিয়ে গেল বাড়ির দিকে। এক সকালেই পর পর এতগুলি ব্যর্থতার অভিজ্ঞতা তার জীবনে কখনোই আর ঘটেনি। ভয় হল, কপালেই বুঝি লেখা নাই আজ সাইকেল চড়া। তার হাঁটুর ক্ষতটা হয়ত একটা অশুভচিহ্নই, সাবধান করে দিচ্ছে: সাইকেলটা যথাস্থানেই রেখে দিতে বলছে।

ফেরার পথে অবু সোজা এসে পড়ল স্যামুয়েলের সামনে—ঠিক যেন কুমীরের হা-করা মুখের মধ্যেই ঢুকে পড়ল এক অসাবধান মাছ। অবু

চলছিল 'ইলো' হকিমাঠের মধ্য দিয়ে। এই শতাব্দীর গোড়ায় এক জমজমাট মিশনারী ইস্কুলের পাশেই ছিল মাঠটা — এখন ইস্কুলের জায়গায় আছে তো তিনটা আমগাছ! আর, চাষের জমিগুলি এগিয়ে আসতে আসতে একেবারেই ছোট হয়ে গেছে মাঠটা। ঐ যে, ঐ তিনটা আমগাছেরই একটার গোড়ায় বসে আছে স্যামুয়েল—ফন্দী আঁটছে এবার কী শয়তানির চাল চালবে।

স্যামুয়েল ও অবু পরস্পর দেখা হতেই কেমন ঘাবড়ে যায়, তবে স্যামুয়েল তাড়াতাড়িই সামলে নেয়।

'ক্যাকড়া বড় কি ছোট নদীতে সাঁৎরে বেড়াতে পারে, যাত্রা শেষ হয় কিন্তু বুড়ীর ঝোলের বাটিতেই।'—স্যামুয়েল এই বলতে না বলতেই দখলে আনে বাইসাইকেলের হ্যাণ্ডেলটা, বলে—'এই যে ক্যাঁকড়া, এসে পড়েছিস আমার ঝোলের বাটিতে। আর ছাড়া পাচ্ছিস?'

অবু চারদিকে তাকায়—বয়সী কাউকে দেখা যাচ্ছে কিনা, কিংবা তার গলার আওয়াজ শুনতে পাবার মতো কেউ আছে কিনা। না, ধারে কাছে কেউই নাই। তার অর্থ স্যামুয়েল এবার তাকে দেখে নেবে—করবে যেমন খুশি, বড়সড় কেউই এসে পড়ে তাদের ছাড়িয়ে দেবে না। সম্ভাবনাটা খুবি কম। অবু অবশ্যি বাইসাইকেলের সিটটা ধরে রাখল— দেখাতে চাইছে সে এত সহজেই ছেড়ে দিচ্ছে না। আর, মনে মনে জোর ভাবছে কী করে সে চিতাবাঘের কবল থেকে ছাড়া পেতে পারে।

'কিরে, একেবারে বোবা হয়ে গেছিস যে! মা কাছে না থাকলে বোবা, আর কাছে থাকলে বকবকানি।'

'আমি তো তোমার মাকে দোষ দেইনি।'—অবু মিনতির সুরে বলে—'আমার মাকে নিয়ে কথা বলছ কেন? মা তো তোমার কিছু করেনি।'

'কে বলেছে?'—স্যামুয়েল সেকথা মানতে রাজি নয়, পাল্টা জানতে চায়—'তোর মা সেদিন রাতে আমার মায়ের কাছে গিয়ে মাকে গালিগালাজ দিয়েছে, আমাকেও।'

'তোমার মাকে তো গালিগালাজ দেয়নি।'

'দিয়েছে, বলছি।'

'দেয়নি।'

'দিয়েছে!'—চেঁচিয়ে ওঠে স্যামুয়েল—'আমি যখন বলছি, তোর ওই বদ চোপা বন্ধ করে থাকবি। নয়তো, চোয়াল ভেঙ্গে দেব।'

জবাব দেয় না অবু, বাইসাইকেলের সিটটা ধরেই রাখে। অবু কথা বলতে চায় না দেখে স্যামুয়েল বলে যায়—'সেদিন রাতে স্যামুয়েলে যদি স্যামুয়েল থাকত তো তোর মাকে আর পথ দেখে দেখে বাড়ী ফিরতে হ'ত না,

আমাকেও আর গালিগালাজ করতে হ'ত না। এতটা কিনা শস্তা জাপান-মার্কা একটা বাঁশীর জন্যে ?'

অবু বলে—'জানো, তুমি বাঁশীটাকে এমনভাবে নষ্ট করে দিয়েছ যে এখন আর সারানো যাবে না।'

'চোপ্ রও! সেজন্যেই কি তোর মা আমাদের বাড়ীতে এসে গালিগালাজ ঝাড়বে আমার মায়ের উপর আমার উপর ? দুই পয়সা দামের যাচ্ছেতা একটা বাঁশীর জন্যে ?'

আবারো চুপ করে থাকল অবু, যদিও স্যামুয়েলকে সে শুনিয়ে দিতে চাইছিল সেই গরীবলোকটার কথা—যে বলেছিল মাংসটা কী নোংরা, যেহেতু ওটা কিনবার মতো মুরোদ ছিল না।

স্যামুয়েল জিজ্ঞেস করে—'বাইসাইকেলটা কার ?'

'বাবার।'

স্যামুয়েল কাঠখোট্টা হাসি হাসে—'ও, এই হল সেই একশ বছরের ঝরঝরে চীজটি—সবাই বলে ওটাকেই নাকি তোর বাবা তার ছেলেপিলেদের চেয়েও যত্নআত্তি করে ?'

ক্রোধ দমন করে থাকা অবুর পক্ষে ক্রমেই কষ্টকর হয়ে উঠছে, কিন্তু হঠাৎ-কিছু করে বসার ফলটা যে কী হতে পারে সেটাও জানে।

'ওটা দিয়ে হবে কী ?'—স্যামুয়েল তার জেরাটা চালাতেই থাকে।

'সারানেওয়ালার কাছে নিচ্ছি।'—অবু মিছে কথা বলে।

'অসুবিধেটা কী হচ্ছে ? পুরানো, তাই ?'

'জানি না।'

'আমি এখনি জেনে নিচ্ছি।'—অবুর কোনো কথা বলার আগেই স্যামুয়েল বাইসাইকেলটা নিয়ে এগিয়ে যায় কয়েক পা—চড়েই ছুটে যায় দর্জির দোকানের দিকে। অবু দৌড়োতে থাকে পিছুপিছু। ছেড়ে দেয় বৃথা চেষ্টা, গিয়ে বসে থাকে আমগাছটার তলায়। রাগ পুষতে থাকে।

স্যামুয়েল ছয়-ছয়বার মাঠটাকে পাক খেল—ফি-বারেই আমগাছটার কাছে এসে আপত্তিকর ধরণের ঠাট্টা কাটছিল অবুর উদ্দেশে। পাক খাওয়া শেষ করে অবুর সামনে নেমে দাঁড়াল। অবুর দিকে বাইসাইকেলটা ঠেলে দিয়েই ফোড়ন কাটে—'এটা যথার্থই একটা রদ্দিমার্কা মাল। আমার গায়ে যে কোনো কাঁটা ফোটেনি, তাই ভাগ্যি।'

'চোপ্‌রও!'—ঠিক যেন অবুর মধ্য থেকেই বলে উঠল আর কেউ—'তোর বাবা বেঁচে থাকতে কটা বাইসাইকেল কিনেছিল ?'

স্যামুয়েল ঘুষি বাগিয়ে ধেয়ে গেল অবুর দিকে। ঠিক যেন ছোট এক-

মুষ্টিযোদ্ধার দিকে বড় কোনো মুষ্টিযোদ্ধা। আদেশের ভঙ্গীতেই বলে উঠল— 'আবার বল্ দেখি?'

'আবারো বলছি—মরবার আগে তোর বাবা কটা বাইসাইকেল কিনেছিল?' —অবু অবাক হয়, তার ভয়ডর উবে যাচ্ছে কি রকম।

স্যামুয়েল আদেশ দেয় বাইসাইকেলটা ছেড়ে দিতে। অবু তাই করে। অবুর ডান হাতটা ঠেসে ধরে স্যামুয়েল। অবু বুঝল স্যামুয়েলকে একবার যদি তার ডান হাতটাকে মুচড়ে পিঠের দিকে নিতে দেয় তো সে হয়ে পড়বে একেবারেই অসহায়। তখন স্যামুয়েল তো তাকে আমগাছটার কাছে টেনে নিয়েই মাথাটা জোরসে ঠুকতে থাকবে গাছটার গুঁড়িটাতে—যতবার তার খুশি। কাজেই প্রতিরোধ করবার জন্যে অবু নিয়োগ করল তার সমস্ত শক্তি। স্যামুয়েল ওর হাতটা মুচড়ে দেবার জন্যে চেষ্টা করতে লাগল যতরকম কায়দায় পারে, কিন্তু পারল না।

'আজ ছেড়েই দিচ্ছি, কিন্তু মনে রাখিস আস্ত একখানা ধোলাই পাওনা রইল। বড্ড বেড়ে গেছিস, না? এবার ধোলাই লাগাব আরো কোনো গুপ্ত জায়গায়—এরকম খোলামেলা মাঠে নয়, লোকজনকে আর বাঁচাতে আসতে হবে না...'

অবু বাবার সাইকেলটা তুলে নিল—স্যামুয়েলের সঙ্গে আর কোনোরকম কথা কাটাকাটির মধ্যে না গিয়ে চলতে লাগল ধীরে ধীরে। একটা কথা তার মাথার মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে: প্রতিরোধটা খাড়া করেছে বলেই তো স্যামুয়েল তার হাত মুচড়ে দিতে পারেনি। স্যামুয়েল তার উপরে চড়াও হতে পারল না—এমন ঘটনা এই প্রথম। স্যামুয়েলের গায়ের জোরই কি কমে যাচ্ছে, না অবুই হয়ে উঠেছে স্যামুয়েলের প্রতিদ্বন্দ্বী—সমানে সমান। অথবা, স্যামুয়েলটা আসলে দাঁতপড়া একটা শিকারী কুকুরের মতোই। স্যামুয়েল ছিল তো তার জীবনের এক অভিশাপ, কিন্তু বিকেলের এই অভিজ্ঞতাটাই তার কাছে খুলে ধরেছে একটা সত্য ঘটনা: সংকল্পের জোরেই স্যামুয়েলকেও ঠেকানোটা সম্ভব। এবং এই অভিজ্ঞতাটা আবারো কাজে লাগাবার মতোই।

অবুর ভাবনাধারা হঠাৎ বাধা পায় ল্যান্ডরোভার গাড়ীর উপরে বসানো এক লাউডস্পিকারের চিৎকারে। এই উমুচুকুয়ু গাঁয়ের লোকজনদের জানিয়ে দেওয়া হচ্ছে কাছের হাটমাঠে সেদিন রাতেই দেখানো হবে—বিনা পয়সার সিনেমা।

লেখক : জেম্‌স ম্যাথুজ

জন্ম ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে, কেপটাউনে। সাংবাদিক হিসাবেও কাজ করেছেন। এঁর লেখা কবিতা-সংগ্রহ 'বিক্ষুব্ধের প্রতিবাদ (ক্রাই রেইজ) প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই দুর্দান্তভাবে জনপ্রিয় হতেই নিষিদ্ধ হয়। এঁর ছোটগল্পমালা (আজিকেয়ে-লওয়া) প্রকাশিত হয়েছে বিদেশেও, এবং আফ্রো-এশীয় সংস্কৃতি-পত্রিকা 'লোটাস'-এ। সোয়াটো প্রতিরোধ আন্দোলনে থাকার জন্যে বিনা বিচারে কারারুদ্ধও থাকেন কিছুকাল।

এই গল্পকারের রচনায় কঠিন জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতার মধ্যেই সুন্দর স্থান পেয়েছে সহানুভূতি সৌন্দর্য-চেতনা ও সংগ্রামী মনোভাব, এবং সমস্ত অন্যায় ও কুশাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। এই সংগ্রহের 'পাক'' গল্পটিতেও দেখা যাবে শাদা ও কালোর কুৎসিত ভেদ-ব্যবস্থা এবং কালোর উপরে আইনগত জুলুম। এবং একদিকে মেহনতী কালো মানুষের মরণ-বাঁচন মর্মান্তিক শ্রম, অন্যদিকে শ্বেতাঙ্গের সুখী ও সাধের জীবন—ছোট্ট দুই বিপরীত চিত্র।

পার্ক

ও ঝুঁকে পড়ে দেখছে আর দেখছে—রেলিংয়ের ওপাশে ছেলেরা স্লিপারে স্লিপ খাচ্ছে—গড়িয়ে গড়িয়ে পা দুখানা ফাঁক করে নেমে পড়ছ লনের উপর, দোলনায় দোল খেতে খেতে আকাশের উঁচুর দিকে বেঁকে উঠতেই সেকী চিৎকার! নাগরদোলায় ঘুরতে ঘুরতে ফিরারেই সে কী আমোদের হৈ চৈ! ওদের দেখতে দেখতে ছেলেটার মনটা চনমন করে ওঠে, ওদের আনন্দের ভাগ নেবার জন্যে অস্থির হয়ে ওঠে সর্বাঙ্গ—পাছাটাকে ওইরকম স্লিপারের টিনে লাগিয়ে নেমে পড়া, ওইরকম হাতে ও পায়ে ইস্পাতের স্পর্শ পাওয়া! পাশেই তখন ছিল ওরি এক বাণ্ডিল কাপড়চোপড়—কাচা, ইস্ত্রি-করা, একটা কাগজে জড়ানো।

পাঁচ-পাঁচটা বাচ্চার পিছু পিছু ছুটে গেল দু-দুটো বড়সড় ছেলে—

ওকে ছাড়িয়ে চলে গেল, ওকে দেখেইনি। কিন্তু হঠাৎ বড় একটা ছেলে থেমে পড়ল, খেঁকিয়ে উঠল—'কি রে বাঁদর-বাচ্চা, হাঁ করে দেখছিস কী?'—বলতে বলতেই নুয়ে পড়ে তুলে নিল একদলা কাদা। ওই ছেলেটাকে চিনেছে অবু—আগের দিন পার্ক থেকে ওকে যখন বার করে দিয়েছিল তখন ছিল ছেলেটা। ছেলেটা ছুঁড়ে মারল কাদার দলাটা—মাথার উপরের দিকে রেলিংটায় ধাক্কা খেয়ে খানিকটা ছিটকে পড়ল ওর সারা মুখে।

ওষ্ঠের উপর থেকে কাদার টুকরোগুলি থু থু করে ফেলে দিল, রেলিংয়ের ওপাশের ছেলেদেরকে তাক করে ছুঁড়ে মারবার জন্যে কিছু একটা খুঁজতে লাগল। সামনেই তখন একে একে ছেলেটির সঙ্গে যোগ দিয়েছে এসে আরো অনেক ছেলে, সংখ্যায় ওরা এত যে দেখে ও ভয় পেয়ে গেল।

নীরবে বাণ্ডিলটা থেকে কাদা ঝেড়ে ফেলে তুলে নিল মাথার উপর—চলতে লাগল।

চলতে চলতে মনে করতে লাগল পার্কে তার সেদিনের সেই শেষদিনটা। বিনা দ্বিধায় সে গেট দিয়ে ঢুকে পড়েছিল সোজা—উঠে বসেছিল কাছের দোলনাটায়ই। দোলনাটা শুধুই উঠে যাচ্ছিল উপরে উপরে আরো উপরে—আর তার মনে হচ্ছিল একবারে শেষের উঁচুটায় গিয়েই দোলনাটা তাকে নিয়ে যাবে একেবারে আকাশে! অবশ্যি, আলগোছেই সে ধীরে ধীরে নামতে দিয়েছে দোলনাটাকে—ঠিক পেণ্ডুলাম যেমন ফিরে আসে আবার এগিয়ে যায়। একটি শ্বেতাঙ্গ ছেলে—প্রায় তার সমবয়সীই, বসে ছিল উল্টোদিকে।···হঠাৎ ওর কাঁধটা ধরে ঝাঁকুনি মারল একখানা কর্কশ হাত। মাথা ঘুরিয়েই মুখোমুখী দেখে—পার্কের দারোয়ান।

'ভাগ্!'

কুঁচকে উঠল চোখের দুপাশের চামড়া। বলে উঠল—'কেন, যাব কেন? কী করেছি?'—দোলনাটার বসে দুহাত দিয়ে ধরে রাখে দুপাশের শিকল। শ্বেতাঙ্গ ছেলেটা উল্টোদিক থেকে দাঁড়াল এসে—নির্লিপ্ত এক দর্শকের মতোই!

'তোমাকে যেতেই হবে!'—দারোয়ান এমন চাপাগলায় বলল চারপাশের ঘনিয়ে-আসা লোকজন যেন শুনতে না পায়। সে বুঝিয়ে বলতে থাকে—সরকার বলে দিয়েছে আমরা কৃষ্ণাঙ্গরা কখনোই শ্বেতাঙ্গদের দোলনাতে উঠতে পারব না। তোমাকে তাই তোমাদের এলাকার পার্কে যেতে হবে!'—শ্বেতাঙ্গ-নিযুক্ত দারোয়ানের বিশেষ পোশাক পরে তবেই শ্বেতাঙ্গদের পার্কে কাজ করবার অধিকার সে পেয়েছে, এবং তার কাজ হল শ্বেতাঙ্গদের শিশুরা যেন খেলাধুলা করার সময় কোনোরকম আঘাত না পায়—এজন্যে তার

কণ্ঠস্বরে ধরা পড়ে যেন একটা অপরাধীর ভাব, ছেলেটি একটা ফ্ল্যাট বস্তিবাড়ীর দিকে হাত বাড়িয়ে বলে—'আমরা যেখানে থাকি কোনো পার্ক নেই তো। অন্য এক জায়গায় শহরে আছে একটা, কিন্তু কোথায় ঠিক জানি না।' তারপর সে চলতে লাগল: পথে পথে মায়েদের বুকে জড়িয়ে-ধরা শিশুরা, ঘাসের উপর গড়াগড়ি খাচ্ছে শিশুরা, পার্কের সেই ছেলেটা, নার্স মেয়েরা—বিশেষ ধরণের পোশাক পরা জামার উপর 'ব্যাজ' লাগানো মাথার উপরে বিশেষ ধরণের ক্যাপ! তার পাশে পাশেই সেদিন হাঁটছিল দারোয়ান লোকটি। পার্কের ফটকে এসে সে অভিযোগের মতোই আঙুল উঁচিয়ে তুলে দেখিয়েছিল একটা নোটিশ বোর্ড—'ঐ যে, নিজেই পড়ে দেখো না।' কোনোরকম অপরাধ করার দোষ থেকে নিজেকে মুক্ত করে নেয়।

ছেলেটি চেষ্টা করে করে পড়ে শাদার উপরে লাল অক্ষরে লেখাটা: কালা আদমীদের জন্যে নিষিদ্ধ। একমাত্র শ্বেতাঙ্গদের জন্যে সংরক্ষিত। সে গেট দিয়ে বেরিয়ে পড়েছিল—আর তার পিছনদিকে ক্যাঁচ্ ক্যাঁচ্ শব্দে দুলতে লাগল নাগরদোলাটা, ঘুরতে লাগল মজার চক্করগুলো।

তারপর থেকেই তো সে ফিবারেই পার্কটার পাশ কেটে যেতে বাধ্য হয়।

মাথার উপরের বোঁচকাটা আর একটু কায়দা-মতো রাখল—কাঁধের মাংস-পেশীর যন্ত্রণাটায় কিছুটা আরাম হ'ল যা-হ'ক। আমি যদি দোলনাটায় একটু চড়তামই কী দোষটা হত? তাতে দোলনার দোলানোটা কি থেমে যেত? স্লিপারটা ভেঙ্গে যেত? মাথায় বোঝাটা চেপে বসেছে—একটানা একটা স্নায়ু ধরে যন্ত্রণাটা বাড়ছে, কিন্তু সে কোনোই জবাব খুঁজে পেল না তার যুক্তিপূর্ণ প্রশ্নগুলির।

সমস্ত পার্কটা—তার চওড়া চওড়া লনগুলি, আর সারি সারি ফুলের বাগান, আর শিলার পাহাড়, আর বেঁটেখাটো গাছগুলো—এসবের কিছুই তাদের জন্যে নয়। লাল ও সবুজে সুন্দর রঙকরা টিউবগুলি, চকচকে শিকলগুলি, আর ক্ষয়েরী রঙের বেড়াগুলো, আর ঐ যে যানবাহনগুলো কোথায় চলেছে কে জানে—এ সবি তার মন জুড়ে আছে।

একবার বহুদিন আগে—সেই একবার মাত্রই সে যেন ভুল করেই চড়ে বসতে পেরেছিল, আর সপাং সপাং বাড়ি মেরে চালিয়ে নিয়েছিল তার কাঠের ঘোড়াকে। সেবার তার বাবা তাকে নিয়ে গিয়েছিল—যেটা বড় একটা হয়ই না কখনো—নিয়ে গিয়েছিল এক মেলায়। কাঠের ঘোড়ার পর ঘোড়া, কী সুন্দর গিল্টি-করা তাদের বল্গাগুলি, বসবার জিনগুলি কেমন সুন্দর লালচে রঙের—আর ঘোড়াগুলো ঘুরপাক খাবার সময় তালে তালে বাজনা বাজে!

একটু সময়ের জন্যেই সে চড়ে বসতে পেরেছিল একটা ঘোড়ায়, মনে মনে

প্রার্থনা করছিল এমনটা যেন চলতেই থাকে চিরকাল। আর ভাবতে না ভাবতেই কিনা শেষ হয়ে গেল। তারপর সে দাঁড়িয়ে ছিল তার বাবার প্যাণ্টটা আঁকড়ে ধরে,—আর অন্যদেরকে দেখছিল ঘোড়ার পিঠে।

আর একবার মাথার বোঁচকাটা সামলে নিতেই পোঁছে গেল বাড়ীতে। তার মা গামলার মতো একটা পাত্রে ফুটন্ত জলে যে সব কাপড়জামা সেদ্ধ করে নেয় আর বাষ্পে তখন আচ্ছন্ন হয়ে ঘেমে ওঠে তার মায়ের মুখখানা—সেইসব কাপড়জামাই নিয়ে এসেছে সে। তখন কথাবলার সময় তার মায়ের গলার স্বর শোনায় বড়ই মোলায়েম আর কেমন জড়ানো জড়ানো—ঠিক তার চারদিক ঘিরে-থাকা বাষ্পের মতোই।

গেটটা খুলে পিছন দিকটা ঘুরে দেখে নেয় বুড়ো ল্যাপডগটাকে, আর সেই কুকুরটাও অমনি ছুটে এসে গড়াগড়ি খেতে থাকে ওর পায়ের চারদিকে, আর ভোঁতা দাঁত দিয়ে আলগোছে কামড় মারতে থাকে ওর হাঁটুটার দিকে।

এগিয়ে আসে গোলগাল-মুখ একটি আফ্রিকান মেয়ে, পরণের কড়া মাড়-লাগানো শাদারঙের পোশাকে তার গায়ের কালোরঙ দেখাচ্ছিল আরো চকচকে। সে এসে রান্নাঘরের দরজা খুলে দিয়ে ভিতরে আনে ছেলেটাকে। টেবিলটা পরিষ্কার করে দিলে ছেলেটা তার মাথায় বোঁচকাটা রাখে টেবিলের উপর।

'এক্ষুনি মাদামকে ডেকে দিচ্ছি।'—কথাটা সে উচ্চারণ করে বেশ ছেড়ে ছেড়ে এবং একটু উঁচু গলায়। যেন ইংরেজীটা বলতে কষ্টই হচ্ছে। আঁটসাট গাউনে তাঁর পাছাটা যেন ঠেলে বেরিয়ে আসছে,—চলতে গিয়ে দুলছে। আর পিঠের দুপাশটা চকচক করছে চর্বির গুণে।

'সবকিছুই ঠিকমতো এনেছিস তো ?'—বোঁচকাটা আনতেই ফি-বারে সে এগিয়ে দেয় কথাটা। ফি-বারেই বুঝে নেয় প্রতিটি কাচা কাপড়চোপড়, আর ফি-বারেই দেখা যায় খোয়া যায়নি কোনোটাই। ছেলেটি ওই মেয়েটির দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ঘনিয়ে আসতে আলগোছে বলে—'সবি রয়েছে, মাদাম।'

এর পরে যেটা তা তিনজনের মধ্যে ধরাবাঁধা ব্যাপার।

'কিছু খেয়ে এসেছ কি ?'—উনি জানতে চান।

ছেলেটা মাথা নাড়ে।

'না, তোমাকে তো এভাবে চলতে দিতে পারি না।'—শ্বেতবসনা এক মহিলা আফ্রিকান মেয়েটির দিকে ফিরে বলেন—'কি আছে দেখো তো ?'

মেয়েটি রেফ্রিজারেটরের দরজাটা একটানে খুলেই বার করে আনে এক প্লেট খাবার। টেবিলের উপর রাখে, পাশেই রাখে এক-গ্লাস দুধ।

ছেলেটি বসে পড়লেই শ্বেতাঙ্গিনী মহিলাটি চলে যায় রান্নাঘর থেকে—সেখানে থাকে শুধু ছেলেটি ও কৃষ্ণাঙ্গী পরিচারিকাটি।

এবারে সংকোচের ভাবটা কেটে যায়—নজর ঘনিয়ে আসে প্লেটের খাবারে।

একমুঠো মটর, একদলা আলুসেদ্ধ, একটা টমাটো চাকচাকা করে কাটা, আর গুঁড়োমশলা—ভাত নেই।

এই শ্বেতাঙ্গরা ভারী মজার লোক,—নিজের মনেই বলছিল ছেলেটা। ঐটুকু খেয়েই কী করে পেট ভরাতে পারে? এ তো বড়নড় একদলাও নয়—আমার মা যেমনটা খাবার দেয় আমাকে।'

দুধ দিয়ে খেয়ে ফেলে। 'ধন্যবাদ, এনি!'—গ্লাসটা একপাশে সরিয়ে রাখতে রাখতে বলে। এনি হাসল—হাসিমুখে তার দাঁতগুলি দেখাতে লাগল চীনেমাটির মতো সাদা।

ছেলেটা বসে ছিল কেমন অস্থিরভাবে, অধীর এখান থেকে চলে যাবার জন্যে। তার চারদিকে কেমন চকচক করছে টালির মেজে আর স্টিলের কাপ-বোর্ড, বাসনের শেলফ ঝকঝক করছে ঠিক হাসপাতালের মতো—খাবার ভরা রেফ্রিজারেটরের পাশে ঠিক মানানসই।

'তোমার খাওয়া হয়ে গেছে তো?'—কথাটা শুনে চমকে ওঠে ছেলেটি। উনি একখানা খাম এগিয়ে ধরেন—ভিতরে দশশিলিং-এর নোট: কাচাকাচির বাবদ তোমার মায়ের পরিশ্রমের মজুরী। 'এটা তোমার!'—দু আঙুলের লম্বা লম্বা নখে ওর হাতের পাতায় একটু খোঁচা লাগিয়ে দিয়ে দেন ছয়-পেনি।

'ধন্যবাদ, মাদাম।'—গলার স্বর প্রায় শোনাই যাচ্ছিল না।

'মাকে ব'লো মাসখানেকের জন্যে আমি ছুটিতে বাইরে যাচ্ছি, ফিরে এলে জানাব।'

এবার তাকে ছেড়ে দিয়ে উনি হাইহিলে ঠুকঠুক শব্দ ক'রে বেরিয়ে গেলেন রান্নাঘর থেকে। যেতে যেতে আফ্রিকান মেয়েটির দিকে মাথা নেড়ে ইশারা করলেন। কাছেই একটা পাত্র থেকে উপচে পড়ছে নানারকম ফল, তা থেকে সে একটা আপেল নিয়ে ছেলেটার হাতে তুলে দিতে দিতে হাসির আলোতে ভরে উঠল মুখখানা।

হেঁটে যেতে যেতে বড় বড় কামড়ে খেয়ে ফেলল আপেলটা।

গেটে পৌঁছবার আগেই কুকুরটা পিছু নেয় ছেলেটার, ওর গরম নিশ্বাস লাগে ছেলেটার পায়ে পায়ে। ঘুরে দাঁড়িয়ে পায়ের আঙুলগুলো ঢুকিয়ে দেয় কুকুরটার মুখের মধ্যে। প্রতিবাদে ঘড় ঘড় করতে থাকে কুকুরটা—সারা মুখে ক্রোধের দৃষ্টি। তাই দেখে মজা করে হাসতে থাকে ছেলেটা, আর কুকুরটার চেহারাটা দেখায় তখন কেমন যেন এক বুড়োমানুষের মতো।

'আবার কর্ তো দেখি?'—পাটা বাড়িয়ে দেয় কুকুরটার বোঁচা নাকটার

সামনে। সরে যায় কুকুরটা, উল্টোদিকে ঘুরে গিয়ে ল্যাজ নাড়তে থাকে—আত্মমর্যাদাটা খোয়া গেল।

'এক পেনি দিয়ে একটা মিঠাই কিনব—টক স্বাদটা প্রায় নেবুর মতোই, এক পেনি দিয়ে এক প্যাকেট সরবতের গুঁড়ো—সঙ্গে একটা নল, আর তারা-মার্কা একটা টফি লাল রঙেরটা—যাতে জিভ লাল হয়ে যায়, থুথু ফেললে মনে হয় লালরক্ত!

গলার ভিতরে পেশীগুলি শিউরে উঠল—মুখের ভিতরটা ভরে উঠল লালায়। যে দোকানটা সামনে পেল ঢুকে গেল ভিতরে। সামনেই ট্রে-ভর্তি দামী দামী চকোলেট, আর সেখানকার সেই ভারতীয় দোকানটাতেই তাকের উপর সাজানো রয়েছে যে কলসীগুলি তাতে কি আছে দেখা যায় না কখনোই। বেরিয়ে এল—কোনো কিছু না কিনেই।

পার্কের দিকে এগোতেই পা চলেছে না আর। নার্স মেয়েরা বাচ্চাদের নিয়ে চলে গেছে, সেখানে এসে বসেছে বুড়োরা—দুহাত দিয়ে ভুঁড়ি আগলে ধরে আছে। অসন্তোষের দৃষ্টিতে লক্ষ্য করছিল তাদের মুখোমুখী একটা হট্টগোল বেধেছে।

শট খেয়েই একটা বল বিপজ্জনকভাবেই ছুটে এসেছে এক বুড়োর কাছে, একটা ছেলে পিছু পিছু এসে যেই লুফে নিতে যাবে তো বুড়ো তার হাতের মোটাবেতের লাঠিটা উঁচিয়ে ধরেছে—সাহস থাকে তো এগিয়ে আয়।

দলের ছেলেরা বলটা নিয়ে আসতে বলে।

ছেলেটা ঘনিয়ে আসছে তো বুড়ো লাঠি বাগিয়ে বাড়ি মারল, কিন্তু আঘাতটা লাগল গিয়ে ফুট খানেক দূরে। ছেলেটা পিছিয়ে গিয়েই চট করে ছুটে গেল বলটা বগলে নিয়ে। খেলাটা শুরু হল আবার।

রেলিংয়ের বাইরে থেকে কৃষ্ণাঙ্গ ছেলেটা দেখছিল ওদের: ছেলেরা শট মারছে বলে, বাচ্চাকাচ্চারা বসে আছে ঘাসের উপর—এমন কি বসে বসে আছে বার্ধক্যগ্রস্ত বুড়োরাও। তবে, প্রায় সব বাচ্চারাই আমোদ করছে—এবং ঐ রকম সব আমোদ থেকেই তো তাকে বঞ্চিত করে রাখা হয়েছে। অথচ ওদের মধ্যেই ওদের একজন হবার জন্যেই অধীর হয়ে উঠছে তার সারাটা দেহ।

'থুঃ!' ঘাড় উঁচু করে দেখল কেউ শুনেছে কিনা।

'থুঃ থুঃ!'—আরো জোরে এবারে। 'থুঃ থুঃ, ওদের গায়ে। থুঃ থুঃ ওদের পার্কে, ঘাসে, দোলনায়, বেঞ্চিতে—সবকিছুতে।'

'থুঃ থুঃ 'থুঃ!'

মাথার উপর উঁচিয়ে-থাকা রেলিংটা ধরে ঝাঁকুনি মারতে লাগল অসহায়ের মতো।

এটা সে স্পষ্টই টের পেল—পুরো মাসটা সে পার্কটা দেখতে পাবে না, এখানে আসবার মতো কোনোই অজুহাত থাকবে না। হতাশায় ভরে উঠল সারাটা বুক! তার ক্ষোভের চাপটা হালকা করবার জন্যে একটা কিছু করতে হবেই এখন।

আস্তাকুঁড়ের ঢিবিটার উপর দেখা যাচ্ছে বাঁশের মাথায় লাগানো একটা ভাঙ্গা ঝুড়ি—ফলের খোসায় ভর্তি। ওটা নিয়ে এসে পাগলের মতোই ছুঁড়ে দিল রেলিংয়ের উপর দিয়ে। কি হল ঘটনাটা দেখবার জন্যে না দাঁড়িয়ে ছুটে চলল।

তিন-তিনটা সড়ক পার হয়ে হাঁফাতে হাঁফাতে গতিটা এবার মন্থর করল—বুকের মধ্যে একটা যন্ত্রণা হচ্ছে খুব। ঐ কাণ্ডটা করে কোনো স্বস্তি হল না, বরং আগ্রহ বেড়ে উঠল আরো কিছু করবার জন্যেই।

পাশ দিয়ে কারা আসছে যাচ্ছে কিছুই খেয়াল করছে না—শুনছেও না রাস্তা পার হওয়ার সময় গাড়ীর বাঁশী। একবার কেউ যখন তাকে সরিয়ে দিল ধাক্কা মেরে, চেয়েও দেখল না লোকটা কে।

চিরপরিচিত চেঁচামেচি আর চেনা-চেনা গন্ধই বলে দিচ্ছে সে বাড়ী এসে গেছে।

ভারতীয় বিপণীটা দেখেও তার বিষন্ন ভাবটা সরে গেল না—পকেটেই রয়ে গেল পকেটের ছয়-পেনি।

চওড়া একটা বাঁধানো জায়গায় কয়েকটা ছেলে খেলছিল গাড়ীর টায়ার দিয়ে। ওদের একজন ডাক দিল, কিন্তু ও কান দিল না। নেমে পড়ল পাশের এক সরু গলিতে।

দোতলা একটা বাড়ীর সমতল এক পোস্তার উপর উঠে পড়ল। বাড়ীর সামনের দিকটা একসময় রঙ করা হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু এখন দেখাচ্ছে রঙ জ্বলে-যাওয়া ধুঁয়োটে রকম—জায়গায় জায়গায় দেখা দিচ্ছে লাল লাল ইঁট!

সামনের বারান্দাটা পেরিয়েই ঘরটা প্রায় অন্ধকার। এলোমেলো কতকগুলো আসবাবের মধ্য দিয়ে এগিয়ে গেল জানাশোনা লোকের মতোই—যাকে পথ দেখিয়ে দেওয়ার দরকার হয় না।

মা আছে রান্নাঘরে, একটা প্রেসার-স্টোভের সামনে ঘুরঘুর করছে।

টেবিলের উপর রাখল খামখানা। মা তার হাতের চামচটা রেখে খামটার তলাটা আঙুল দিয়ে ছিঁড়ে ফেলল আধখানা। তাকের উপরে ঢাকনা-নেই একটা টি-পট, তার মধ্যে রেখে দিল দশ-শিলিংয়ের নোটখানা।

'ক্ষিদে পেয়েছে?'

মাথা নাড়ে।

মা এক কাপ ঝোল ঢেলে দিল, সঙ্গে মোটা একখণ্ড বাদামীরঙ্ রুটি।

এক-এক কামড় রুটি আর এক-এক চুমুক ঝোল খেতে খেতে গলা জ্বালা করছিল, আর তখনি সে বলল—'সামনের হপ্তায় আর কোনো কাচাকাচির কাজ আসছে না।'

'কেন? কি হয়েছে? কী করেছি আমি?'

'তুমি কিছু করোনি। মাদাম বললেন– মাসখানেকের জন্যে বাইরে যাচ্ছেন, ফিরে এসে জানাবেন।'

'এখন আমি কী করি?'— মায়ের গলার স্বরে যেন আর্তের কান্না, চোখের করুণ দৃষ্টি সেই টাকা-রাখা টি-পটের উপর। সেই অবস্থায় ক্রমেই তার কঠিন অবস্থাটা রূপান্তরিত হল ভর্ৎসনায়—'কেন, কেন জানালেন না—উনি চলে যাচ্ছেন? আমি আর একজন মাদামের সন্ধান নিতে পারতাম'

একবার থামল। 'এত খেটে যাচ্ছি, পিঠের যন্ত্রণাটা ছাড়ছে না কিছুতেই। আর উনি যে চলে যাচ্ছেন—সেটুকু আগে জানাতেই এত কষ্ট। ওখান থেকে যে টাকাটা পাই তাতে একরকম ভালোই চলে যায়। এবারে ফাঁকা গর্তটা ভরব কী ক'রে?'

খেতে খেতে ছেলেটা ভাবছিল—এই যে দশ-শিলিং নিয়ে এলাম এতেই কেমন করে একরকম ভালোই চলে যায় তাদের। তাদের খাবারে তো কোনোই রকম-ফের হয় না। প্রতিদিন তা যথেষ্ট নয়। আর, একমাত্র বড়দিনের উৎসবের সময়েই পরতে পায় তারা নতুন জামা-কাপড়।

'কবরখানার জন্যে দিতে হবে কিছু, সামনের ঘরটার জন্যে দরকারী কিছু দড়ি আনতে বলতে হবে। কাঠের ফ্রেমের কাপড়টা ছিঁড়ে আছে, ও আমি আর দেখতে পারি না। কিন্তু কাপড়টা আনতেও বলতে পারছি না। টাকা ছাড়া কোনো-কিছুই তো আশা করা যায় না—শনিবারে যেমন মদ জোটে না পকেট খালি থাকলে।'

ছেলেটা তাড়াতাড়ি খেয়ে নিচ্ছে—মায়ের দুঃখের কথাগুলো আর শুনতে পারছে না,·· মায়ের দুঃখকষ্ট বসে বসে আর সহ্য করতে পারছে না।

বাইরে ছেলেরা তখনো খেলে চলছে টায়ারগুলো নিয়ে। ওদের সঙ্গে যোগ দিল আধখানা মন নিয়েই। একটা টায়ার ঘোরাতে ঘোরাতেও তার মনপ্রাণ চলে গেছে পার্কের দোলনায়। তার সামনে তো কোনো বাধা নাই, যা খুশি করতেই পারে তো। এই সরু গলি থেকে সে চলে গেছে অনেক দূরে—এই চেঁচামেচি-করা বাচ্চাদের কাছ থেকে, ধাবন্ত গাড়ীগুলো থেকে অনেক অনেক দূরে। সে রয়েছে সবুজ ঘাসের দেশে, লাল রঙের দোলনায়

দোল খাচ্ছে রুপোলি শিকল ধ'রে। টায়ারটা চলে গেল আওতা ছাড়িয়ে। আঁকড়ে ধরতে চেষ্টা করল না।

'কে, টায়ারটা ধর্ গে।'

'ঘুমোচ্ছিস নাকি!'

'কিরে, খেলবি না আর?'

—এদের সব কথাই এড়িয়ে যায় সে, চলে যায় অন্যদিকে।

ভিতরে আগুন জ্বলছে—ক্রোধে। ক্রোধ ঐ সব পাঁচিল-ঘেরা বাড়ীগুলির উপর—যার ভিতরে গিশগিশ করছে কত লোকজন। ক্রোধ এমন এক কানুনের উপর যা তাকে বহিষ্কার করে রেখেছে পার্ক থেকে।

হাউহাউ করে কাঁদিতে লাগল। দুই হাত দিয়ে দুই চোখ আর দুই গাল চেপে ধরল—কান্না থামাবার জন্যে।

হাত দুটো নামাল—মুখোমুখী একটা ছেলেকে একটুখানি দেখতে পেয়ে। 'না আমি কাঁদিছি না, ভাগ্! আলাতে চোখে কী একটা পড়েছে, তাই চোখ রগড়াছিলাম।'

'আমার মনে হচ্ছে—কাঁদছিলি।'

ছেলেটা এই বলেই ওর পাশ কেটে এগোতে থাকে দোকানের দিকে, পিছু থেকে ধাওয়া করতে থাকে ওর গলা—'কাঁদুনে পুতুল!'

দোকানটার সামনেটায় লোহার জাল-আঁটা জানালায় বহু লোকের ভিড়। কমলানেবুর পাশেই রয়েছে লেখার কাগজ; শুকনো ডুমুর ছড়ানো রয়েছে ইস্কুলের বাচ্চাদের স্লেটের উপর; জামা-কাপড় আর বাসনকোসনের উপর জমে রয়েছে ধুলোর আস্তরণ। জানালা বরাবর একটা আরশোলা অলস মেজাজে এগোচ্ছে—শুঁড়টা সতর্কভাবে উঁচিয়ে।

দোকানের ভিতরটায় ভিড় ঠিক জানালাটার সামনের মতোই। মেঝেটা জুড়ে আছে ব্যাগের পর ব্যাগ—মাঝখানটা দিয়ে কাউণ্টারে এগোবার মতো কোনরকম একটু পথ।

দোকানদার—এক বুড়ো 'ভারতীয়'। টান্-করা মুখখানা ফাটা-ফাটা চামড়ার মতো, রোদপোড়া। কাউণ্টারে ভর করে দাঁড়িয়ে। 'হ্যাঁ, খোকা?'—পান খেতে-খেতে লালচে হওয়া দাঁতগুলি বেরিয়ে পড়ল—'হ্যাঁ বলো? কী চাও? সারাদিন এখানে দাঁড়াবার জায়গা নয়।' লালচে দাঁতে সুপারী আটকে আছে, চোয়াল দুটো কাজ করে যাচ্ছে।

ও পছন্দমতো অনেক জিনিষ বেছে বেছে নিয়ে নিল দুএকটাই শুধু।

মিষ্টিটা পকেটে রেখে ঢাকনা কাগজটা ছিঁড়ে মেজেতে ছুঁড়ে ফেলল, বাইরে

চলে এল। পিছন দিকে ঐ 'ভারতীয়' দোকানদারটি গজগজ করছে, চোখে রুক্ষ দৃষ্টি—দুই চোয়াল চলছে আরো দ্রুত।

রাস্তাটার একটা দিকে ছায়া। অন্যদিকে সূর্যের শেষ আলোটা। দেয়ালে পিঠ রেখে বসল।

পিপারমেণ্ট, একটু কোনো সুগন্ধি—একসঙ্গে দলা পাকিয়ে গালের মধ্যে। একমুহূর্তের জন্যে ভুলে গেল পার্কটা।

এগিয়ে আসছে একটি মেয়ে—দেখেও দেখছে না। 'মা বলেছে এখনি এসে খেতে।' উঁচিয়ে-ওঠা গালটার দিকে একদৃষ্টে লক্ষ্য করছে মেয়েটা, আর এক হাত দিয়ে নাক ঘষছে।

'দে না?'

ও মেয়েটাকে দিয়ে দিল, অমনি ও তার নাকের দুদুটো ফুটোর পাশে মুখের হা-য়ের মধ্যে সেটা ঢুকিয়ে দিল।

আদেশের ভঙ্গীতেই বলে উঠল ছেলেটা—'নাকের কফটা মুছে ফ্যাল।' নিজের প্রাধান্যটাই জাহির করতে চায়। চলে যাচ্ছে এবার। মেয়েটিও পিছু পিছু, খাবারটা চুষছে আর গন্ধ শুঁকছে।

ভাইবোন দুজনে মিলে রান্নাঘরে ঢুকতেই দেখে বাবা খাবার টেবিলে বসে গেছেন আগেই।

মা বলে উঠলেন—'সবসময়েই তোকে খুঁজতে লোক পাঠাতে হয় কেন?

খাবার জায়গায় আলগোছে বসে পড়েই হঠাৎ উঠে পড়ে হাতমুখ ধুতে,—মা আবার কোনো দোষ বার করবার সুযোগ না পায়।

খাওয়ার ব্যাপারটা সবটাই নিঃশব্দ ব্যাপার, একমাত্র ব্যতিক্রম হল প্লেটের উপর চামচ আঁচড়ানোর আওয়াজ, আর মাঝেমধ্যে বোনের মুখে চুমুক দিয়ে খাওয়ার শব্দ।

খাওয়া প্রায় শেষ হয়ে আসছে এমন সময় একটা কথা মনে পড়ল। বসেই আছে, হাতের চামচটা উঁচিয়েই রয়েছে। ভাবনাটার গুরুত্ব তাকে আগলে ধরেছে। সন্ধ্যার পরে পার্কে গেলে হয় না? বুড়োরা কাচ্চাবাচ্চারা, ধাইয়েরা, সঙ্গে তাদের বাচ্চাদের গাড়ী—সবাই গেট দিয়ে চলে যাবার পরেই। তখন কে আর থামায় তাকে?

আর ভাবতে পারছে না। ওকথা ভাবতেই মাথাটা হালকা লাগছে। মা বাবাকে বলছিল তার সারাদিনের কথা। কিন্তু ওসব শুনতে শুনতে ওর কষ্ট হচ্ছিল না, মনে হচ্ছিল মৃদু হাওয়া বয়ে যাচ্ছে যেন।

শহরের ওদিকটায় সন্ধ্যার পরে যাইনি কখনোই। এক দঙ্গল ভয়ের মূর্তি বুকের মধ্যটা যেন আটকে ধরছিল, ভিতরটা কুঁকড়ে ফেলছিল। খাবার গিলতে কষ্ট হচ্ছে। হাতের চামচটা শক্ত করে ধরে রাখল।

ঠিকই যাব আমি। আমাদের খাওয়া হলেই পার্কে যাব। খুব কষ্টে-সৃষ্টে সামলে রাখল নিজেকে। প্লেটে যা খাবার ছিল গপ্‌গপ করে খেয়ে ফেলল, একটু চঞ্চল ভাবেই দেখছিল অন্য সবাইর খাওয়াটা কতদূর হয়েছে। জলদি করো, জলদি।

বাবার খাওয়া শেষ হতেই শেষ প্লেটটা সরিয়ে রেখে সিগ্রেট ধরালেন। আর, তাড়াতাড়ি ও টেবিলটা পরিষ্কার করে ধোয়াধুয়ির কাজে হাত দিল।

রান্নাবান্নার প্রত্যেকটি জিনিষপত্র ধোয়া হতে হতেই এক একটা তুলে দিচ্ছিল বোনের হাতে···

পাত্রগুলি ধোয়ার পরেই রান্নাঘরটা ঝাঁট দিল, ময়লাভরা টিনটা বয়ে নিল বাইরে।

'এবারে কি যেতে পারি, মা? খেলা করব।'

'আবার যেন তোকে ডাকতে পাঠাতে না হয়।'

বাবা বসে আছেন চুপচাপ—খবরের কাগজে ডুবে আছেন।

'তুই যাবার আগে'—মা থামিয়ে দেয় ওকে—'আলোটা জেবলে বারান্দায় ঝুলিয়ে রাখ।'

লণ্ঠনটায় প্যারাফিন ভরল, ফিতেটা উ'চিয়ে তুলল, ঝুলিয়ে রাখল। ডোরা-কাটা কাচের মধ্য দিয়ে জবলছিল ক্ষণ আলো।

চাঁদটা মনে হল একটা ঝলমল বল,—আর তারাগুলো ও থেকে কেটে ফেলা কতকগুলো টুকরো। রাস্তার আলোর নিচে তাসখেলার মরশুম। ওটা ছাড়িয়ে যেতে যেতে নাকে সুড়সুড়ি লাগছে। আবছা অন্ধকারেও দরজা দিয়ে দেখা যাচ্ছে গা জড়াজড়ি করে শুয়ে আছে নারী-পুরুষ।

এ অঞ্চলটা ছাড়িয়ে যেতেই চলতে লাগল—ঝোঁকের বেগে দোকানে দোকানে ঝলমল জানালার পর জানালা—যেন রূপকথার দেশ। ওসব পেরিয়ে যাবার সময়েও চলার বেগ কমাল না একটুও। পার্কের কাছাকাছি আসতেই আবেগটা থমকে যেতে লাগল, পায়ের চলা মন্থর।

সামনেই পার্কটা। ঐ তো গেট, আর লোহার রেলিং। রেলিংয়ের পিছনেই থামে বাঁধা তাকিয়ে আছে নোটিশবোর্ডটা। ওটার কিছুদূরেই দেখা যাচ্ছে দোলনাটা। দেখেই জোর এল।

এগিয়ে গেল সে—শ্বাস পড়ছে ঘনঘন। না, ধারে কাছে কেউই নেই। একটা গাড়ী রাস্তার কোণ কেটে ওর দিকেই এগিয়ে আসছে—ইঞ্জিনের শব্দ শুনেই চমকে উঠল। গাড়ীটা চলে গেল—টায়ারগুলো আলগোছে চেটে চেটে চলেছে পিচ।

রেলিংটা ধরতেই মনে হল বরফের মতো ঠাণ্ডা—এর প্রতিক্রিয়াটাতেই সে এগিয়ে গেল কাজে। দুহাত বাড়িয়ে—ঠিক বানরদের মতোই। দেহটাকে

দুমড়ে নিয়ে রেলিংয়ের মাথায় উঠেই দে এক লাফ—একেবারে নতুন চষে-রাখা মাটির উপর।

শিশির-ভেজা ঘাস। ওর উপর দিয়ে পা দুটো বুলিয়ে নিল। এবার ছুটতে লাগল। ভিজা ঘাস নুয়ে নুয়ে পড়ছে ওর খালি পায়ের চাপে।

ছুটে এল স্লিপারটার কাছে। হাতের চাটুতে ইস্পাতের স্পর্শ।

মই বেয়ে বেয়ে একেবারে মাথায়। দাঁড়িয়ে রইল আকাশের পটে। একটা পাখী সে—একটা ঈগল। মাথাটা নিচুর দিকে, পেটের উপরে দেহটা—দ্রুতবেগে স্লিপ খাচ্ছে। সড় সড় সড়াং। ঘাসের উপর পড়তেই গড়াগড়ি খেয়ে চিৎ হয়ে রইল। এক পলক দেখল চাঁদটাকে, তারপর পায়ের উপর দাঁড়িয়ে পড়েই ছুটে এল স্লিপারটার সিঁড়ির কাছে—আবার আবার ওই আমোদটা দখল করবার জন্যে। যতবারই ও স্লিপ খাচ্ছিল—মনে হচ্ছিল এটা যেন শেষ না হয়ে যায়—যেন সে নামতেই থাকে গড়িয়ে-গড়িয়ে গড়িয়ে-গড়িয়ে।

ঢেঁকি-কচ্‌কচিটাকে এক মাথায় ধাক্কা দিয়ে অন্যমাথাটাকে ঘাসের উপর জোর এক ঠোক্কর দিয়ে চলে যায় অন্যদিকে—কিছুটা অনিচ্ছায়ই যদিও।

নাগরদোলাটাকে বেগে ঘুরিয়ে দেবার চেষ্টায় গশ গশ করতে লাগল। দুই পা ছড়িয়ে উরুর মাংসপেশী উঁচিয়ে—মারল এক জোর ধাক্কা। নাগরদোলাটা ঘুরতে শুরু করল। আরো জোরে ধাক্কা দিয়েই উঠে বসল লাফিয়ে—একটা ঠ্যাং ঝুলিয়ে রাখল, বেগটা কমে গেল ধাক্কা লাগাবে। নাগরদোলাটা ঘুরতে ঘুরতে দুলতে লাগল। না, এর চেয়ে আরো মজা ওই দোলনাটাতেই—ছুটে এল সেদিকে।

উঠেই পা দুটো ছড়িয়ে দাঁড়াল, দুহাতে রুপোলি শিকল দুদিকের। দেহটায় ঝাঁকুনি মেরে ঝোঁক দিয়ে বেগ আনল দোলনাটায়। একবার আধাআধি নুয়ে—জোর দৌড়ের ভঙ্গীতে, তার পরেই উঠে দাঁড়ায় সবেগে। আর এমনটা করতে করতে দোলনাটা উপরে উঠতে থাকে অর্ধবৃত্তের আকারে। ক্রমেই উঁচুতে আরো উঁচুতে, আরো। আকাশে উঠে যাচ্ছে। চাঁদটাকে ধরা যায় হাত দিয়ে। তা, একটা তারাকে বুকে এনে লাগায়! উঃ, কত নিচে ওই পৃথিবী। তার মতো এত উঁচুতে কোনো পাখীই তো উড়তে পারেনি কখনো। উচুতে এগিয়েই চলেছে।

পার্কটার দূর প্রান্তে জ্বলে উঠল একটা আলো। অন্ধকার পার্কে ছোট একটি হলদে দাগ। দরজাটা খুলে গেল, দরজায় দেখা যাচ্ছে একটি বলোরঙের চেহারা। দরজাটা এবার বন্ধ হয়ে গেল, ঐ চেহারাটা এগিয়ে আসছে তার দিকেই। ও জানে—ও হল সেই দারোয়ান। জ্যোৎস্নার ভিতরেই একটা টর্চের আলো দুলছে লোকটার পাশে পাশে।

ও তো দোল খেয়েই চলেছে দোলনাটায়।

সামনেই দাঁড়িয়ে পড়ে লোকটি—দোলনাটার ওঠা-নামার আওতা থেকে দূরে। লোকটা টর্চের আলো ফেলল ওরই উপর। দোলনাটা তখন উঁচিয়ে উঠেছে মাঝামাঝি পর্যন্ত।

দারোয়ান গর্জে ওঠে—'কী ভয়ানক! তোকে বলিনি দোলনায় উঠবি না কখনোই।'

কিন্তু ও দোলনাটাতে পা সরিয়ে বসতে কেবলমাত্র জবাবটা হল ওই শেকলের ঝনঝন্ শব্দ।

'কেন, ফিরে এসেছিস আবার? কেন?'

'দোলনার জন্যে, দোলনাটায় দোল খাবার জন্যে।'

আমাদের এই কালো রঙের জন্যেই কি পার্কটাকে আমাদের পক্ষে নিষিদ্ধ রাখা হয়েছে—দারোয়ানটি একে একে ভেবে নিচ্ছে। তবে, কর্তাদের মর্জির উপরেই তো ঝুলে আছে তার চাকরীটাও।

'শাদা চামড়ার শয়তান সব! সবি ওদের?'

দারোয়ানের সমস্ত অনুভব বলছে—ছেলেটা থাক না তার মতো, ওর খুশিমতোই একটু আনন্দ করুক না। কিন্তু কেউ যদি তাদের দেখে ফেলে—এই ভাবনায়ই সে কঠিন হয়ে উঠল।

'চলে যা, বাড়ী চলে যা!'—সে চিৎকার করে উঠল, গলার স্বর কর্কশ। যে ব্যবস্থা তাকে চেতিয়ে দিচ্ছে নিজেরই বিরুদ্ধে—সেই ব্যবস্থার বিরুদ্ধেই জেগে উঠছে সমস্ত ক্রোধ। 'তুই যদি চলে না যাস তো পুলিশে খবর দেব। জানিস তো, তখন কি হবে?'

দোলনাটা দুলেই চলেছে এগিয়ে আর পিছিয়ে।

দারোয়ানটা ঘুরে দাঁড়িয়েই ছুটে গেল গেটের দিকে।

'মা! মা!'—ছেলেটির ওষ্ঠ কাঁপছে। সে চাইছে রান্নাঘরে জ্বলন্ত ষ্টোভটার কাছে তার মায়ের পাশে দুই হাঁটু জড়িয়ে ধরে বসে থাকে এখন। 'মা! মা!'—তার গলার স্বর ক্রমেই উঁচিয়ে উঠছে গলা চিরে—আকাশের দিকে ক্রমেই উঁচিয়ে উঠতে-থাকা দোলনাটার সঙ্গে তাল মিলিয়ে। দোলনা আর মা-মা চিৎকার! উঁচুতে, আরো উঁচুতে, আরো। দুই মিলে এক।

পার্কের ফটকে নোটিশবোর্ডটা দাঁড়িয়ে আছে মাথা-উঁচু। তার ছায়াটা বড় হতে হতে এগিয়ে এসেছে ওর দিকে!

লেখক : আল্‌ফ ওয়ান্নেনবুর্গ

জন্মেছেন দক্ষিণ আফ্রিকার রাজধানী কেপটাউনে, ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে। ম্যাট্রিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার পরে কাজ করেছেন বিভিন্ন পেশায় : জমি-জরিপদারের সহকারী, দোকানে বিক্রেতা, করণিক, বিপণি-সজ্জাদার। প্রথমে লিখতে শুরু করেন প্রবন্ধ, তারপরেই ছোটগল্পের লেখকরূপে আত্মপ্রতিষ্ঠা।

কেপটাউন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করেছেন ১৯৭৩ খ্রীষ্টাব্দে।

এই কিশোর শ্রেষ্ঠগল্প সংকলনে গৃহীত গল্পটি 'প্রতিধ্বনি' লেখা হয়েছে নিষ্ঠুর-কঠিন এক বাস্তব-সূত্রে। দক্ষিণ আফ্রিকার এক খনি দুর্ঘটনায় মারা যায় চারশ'র বেশী শ্রমিক। গল্পটিতে আছে : তিনজন শ্রমিক জান নিয়ে ফিরে আসছিল তাদের বাড়ীর দিকে : সরকারী ব্যবস্থায় গাড়ী পেতে ক্রমেই দেরী হচ্ছে, তাই তারা বাড়ীর আপনজনদের কাছে তাড়াতাড়ি পেঁছানোর অধীর আগ্রহে ভয়ংকর রৌদ্রে ও ঠাণ্ডায় মরুপথে দিনেরাতে হেঁটেই রওনা হয়ে চলছিল কয়েকদিন ধ'রে—সোজাপথে সাহেবদের নিষিদ্ধ এলাকা দিয়েও। এবং তার ফলে প্রচণ্ড খিদের সময় রান্না-করা সাধের মাংস খাওয়ার আগেই গুলি খেয়ে মৃত্যু হল একজনের, পালিয়ে বাঁচল বাকী দুজন।

॥ প্রতিধ্বনি ॥

ধুলোর মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে তিনটি লোক—তাকিয়ে আছে রাস্তার সাইন-বোর্ডটার দিকে। ত্‌সোলো বলে উঠল—'দুদিনের মধ্যেই দেশের বাড়ীতে পেঁছে যাব আমরা!' ত্‌সোলো মাকি ও টেম্বা কতদিন ধরে একটানা চলছে হাজার-পাহাড়ী উপত্যাকার সড়ক ধ'রে। সারাটা দিন হাঁটে হলুদে ধুলোময়লার মধ্য দিয়ে। উপরদিকে থাকে সূর্য। রাতের বেলা সড়কের পাশে আগুন জেবলে বিশ্রাম : ক্লান্তি ঝেড়ে ফেলে তৃষ্ণার্ত মাটির বুকে! বড় একটা কথা বলছে না—যে জায়গা থেকে চলে এসেছে তার ভয়াবহ রূপ তাদের মধ্যে জেগে আছে।

দুর্ঘটনাটায় মারা গেছে খনিমজুর-ভাইদের চারশয়েরও বেশী। পাথর ধবসে পড়ায় যারা আটক রয়েছে ভিতরে—তিনদিন ধরে চেষ্টা করা হল তাদের

কাছে পৌঁছবার জন্যে, কিন্তু সব চেষ্টাই বৃথা হতে সব কিছুর উপরেই নেমে এল মৃত্যুর যবনিকা। নিস্তব্ধ বিভ্রান্ত শোকার্ত এবং বুদ্ধিহত মেয়ে-ছেলেরা ও আত্মীয়েরা ঘুরে ফিরেছে খনির পাঁচিলের চারদিকে—তারপর ফিরে গেছে। আর সেই সব জায়গায় তারকাঁটায় ছেঁড়া-ছেঁড়া খবরের কাগজ আটকে রয়েছে হাওয়ায় হাওয়ায় উড়ে উড়ে। ধূসর আকাশের পটে নিঃশব্দ ওই ঘোরানো ঘোরানো কীসব দেখাচ্ছে কালো রঙের ছবির মতো। ওই জায়গাটার এখন কাজকর্ম যা তা হল—বাস্তুহারাদের সরিয়ে ফেলবার জন্যে হতাশাব্যঞ্জক এক আয়োজন।

'ঘাড়ে পিঠে রোদ জ্বলছে, সাহেবদের আইনকানুনের জ্বলুনির মতোই।' হাতের বোঝাটা পায়ের তলায় ধুলোর মধ্যে ফেলে দিয়ে হাত দুটোকে মুক্ত করে বলে উঠল ত্সোলো—

'অথবা বললেই হয় খনিতে আমাদের মতো দেহাতী লোকের যন্ত্রণার মতোই।'—বলে মাকি।

ত্সোলো বলে ওঠে—'কোনো কোনো বিষয়ে কিন্তু আমাদের কথা বলা ঠিক নয়। তা, আমরা শাদা-চামড়া সাহেবদের আইনকানুন পালটে ফেলব নিশ্চিতই, কিন্তু খনি-জীবনের যে যন্ত্রণা তার কিছুই সুরাহা হবে না।'

কিছুক্ষণ ওরা কেউ-ই আর কথা বলছে না—খনির মধ্যের সেই যন্ত্রণার কথা মনে পড়ছে বড় দুঃখে।

'এখানে রাতটা কাটানো যাক, তারপর কাল সকাল হতেই গায়ে বল ফিরে পাব—আবার চলবার মতো।'

কথাটা বলল টেম্বা।

মাকি বাধা দেয়—'না, তার চেয়ে বরং সারাটা রাতই হাঁটব। এখন তো বাড়ীর কাছকাছিই এসে গেছি। আমার পা দুটোয় তাই জোর বেড়ে গেছে—না, আর কহিল মনে হচ্ছে না।'

মাকি পাঁচিলের ভাঙ্গা একটা ফোকর দিয়ে পথ দেখিয়ে চলল আগে আগে, অন্য দুজন পিছু পিছু। এবড়ো খেবড়ো খাড়া-পাড় একটা শুকনো নদীর উপর দিয়ে।

এবং এটাই ছিল বরাবরের চালু পথ। ত্সোলোই তখন থাকত ওদের নেতা। বাড়ীতে সবাই যখন একত্তর হত, এই ত্সোলোই সবাইকে নিয়ে মাঠে নামত চাষের কাজে। আর তারপর ছোট ছোট জমিতে হল করুণ দশা—আর তার উপর সেবার যখন অজন্মা হল—ওরা সবাই এই ত্সোলোর সঙ্গেই চলে এসেছিল মজুর-নিয়োগের দপ্তরে। একবার তো ওর সঙ্গেই ঢুকেছিল শ্রীঘরে।

কিন্তু ওসব অনেক অনেক আগের কথা। তবে হ্যাঁ, ওর ইচ্ছেটাই ছিল সবার মধ্যে জোরালো। এবং এমনটা হয়েছে সব সময়েই।

নদীটার খাড়াপাড়ের পাশেই কম্বলটা ফেলে রেখে বলে উঠল ত্সোলো—'জায়গাটা বেশ।' মাকি বলল—'নদীটা যেখানে বাঁক ফিরেছে সেখানে গেলেই কিন্তু ভালো হত, সড়ক থেকে দেখা যেত না। এখানে বিপদ আছে।'

নিস্তব্ধ চতুর্দিক। হঠাৎ শোনা গেল তারই কণ্ঠস্বর—'এখানে বিপদ আছে···বিপদ আছে···বিপদ···'

মাকি বলে ওঠে—'আমাদের ঠাট্টা করছে কে?' ত্সোলো জবাব দেয়—'ওটা পাহাড়ের চালাকি।'

ত্সোলোর পাশেই টেম্বা তার কম্বলটা বিছিয়ে দেয় বালুর উপর চেপে চেপে; তারপর সায় দেয়—'হ্যাঁ, জায়গাটা ভালোই।'

কিছুক্ষণ এবার ওরা বসে রইল জুড়িয়ে-আসা বালুর উপর, দেখতে লাগল উঁচু ছায়াটা কেমন করে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছে নদীখাতের উপর দিয়ে।

ত্সোলোই এবার প্রথম কথা বলছে—'একটা পাঁচিলের ফোকর দিয়ে গলে এসেছি আমরা, মনে পড়ছে?'

'হাঁ, তুমিই তো ফোকরটা দেখালে আমাদের।'—বলে টেম্বা।

'আমরা পাঁচিলের ফোকরটা দিয়ে গলে এসেছি—তাতে হলটা কী।'

'এই হল যে আমরা আছি এখন এক শাদা-চামড়া চাষীর জমিতে।'

'তাহলে এবার তো বলতে হয়—পেটটা খিদেয় চোঁ চোঁ করছে।'

'তাহলে বলতে হয়—এখানে এইরকম চাষের জমিতে ভেড়া চরে বেড়ায়।'

'আঃ, কী যে ভালো তুমি, টেম্বা। তোমাকে কীভাবে যে বলি···? ভালো লোক তুমি—খুবি ভালো লোক!'—ত্সোলোর পিঠ চাপড়াতে চাপড়াতে আবার বলে টেম্বা—'তুমি হলে যাকে বলে খুবি ভালো লোক!'

ভালো লাগে টেম্বার, বলে—'এসব কথা তো তোমার কাছ থেকেই শিখেছি।' মাকির চিন্তাভাবনার পশ্চাৎ-পটে ওদের কথাগুলো শোনায় কেমন অস্পষ্ট। মাকি ভাবছিল কেবল সামনের দিনে বাড়ী ফেরার আনন্দের কথা। আর, পিছনের দিকে ফেলে-আসা সেই দুঃখের জায়গাটার কথা: খনি-মজুরেরা চাপা পড়ল পাথরের কবরের মধ্যে, আর সে বেরিয়ে আসতে পারল। এ সব দুর্ঘটনার জন্যে দায়ী তো ঐ শাদা-চামড়া সাহেবরাই—খনি-মজুরদের নিরাপত্তার জন্যে কোনো ব্যবস্থাই তো তারা করেনি। সে ভাবছিল তার দোস্ত মোজেজের কথা। খনি ছেড়ে যেতে বাকী ছিল মাত্র দুটো দিন—মাত্র দুটো দিন আর, এক দিনের মধ্যেই দুর্ঘটনায় মারা গেল সে—বাড়ীতে তার পরিবারের

মধ্যে আর ফেরা হল না। বাড়ীর কথা বলবার সময় কী সুখী দেখাত তাকে —দুই চোখে ঝিলিক মারত কী সুন্দর হাসি। তারপর, প্রকাণ্ড এক কামানের গোলা পড়ার মতো কী এক ভয়ংকর শব্দ, আর এক মুহূর্তেই তার স্বপ্নের উপর ভেঙে পড়ল খনির ছাদটা।

কিন্তু প্রায় সময়টাই ভাবত সে তার বাড়ীর কথা। আর প্রতীক্ষার সময়টার কথা।···মোজাম্বিকে যারা ফিরে চলছিল উঠে পড়েছে তাদের রেল-গাড়ীতে···কিন্তু এদের তিনজনের নিরপত্তার কথা ভেবে ভেবে এদের স্ত্রীরা তো কত উদ্বিগ্ন ও অস্থির হবে থাকবে···অথচ দেশে পাঠাবার জন্যে রেল-গাড়ীর ব্যবস্থা করতে দেরী হবে আরো দু-দু সপ্তাহ। ত্সোলো অমনি তার কম্বলগুলি গুটিয়ে নিয়ে রওনা হল; সঙ্গেসঙ্গে আমরাও তার পিছু পিছু।

'ও হল এক স্বাপ্নিক—ঐ মাকি।'—বলে ত্সোলো।

টেম্বা বলে উঠল—'হ্যাঁ, এবং একটা বোকা। আমরা যখন ভেড়ার কথা বলি তার অর্থ খাদ্যের কথাই বলি।'

মাকি বলে—'আমি যখন অনেক বড় বড় কথা ভাবছি, তখন কিনা খাদ্যের কথা বলে আমাকে বিরক্ত করছ। তা, এই তো দুদিনের মধ্যেই চলে যাব বৌয়ের কাছে। আমার ছেলে জানতে চাইবে—কি কি দেখেছ সেসব গল্প বলো, বাবা।' আমরা তখন আগুনের কাছে বসব, বসে বসে বলব দুঃখকষ্টের সেই সব কত কথা—যা সব দেখেছি। আমার পরিবারের সকলের মধ্যে যাওয়ার চেয়ে বড় হবে কিনা আমার পেটের ভাবনা! তার অর্থ কি, আমি এক স্বপ্ন-পাগলা?'

ত্সোলো জবাব দেয়—'জীবনের কথা যা শিখেছ সেটা হল কিছু-না। শিখেছ কয়লা কাটতে কাটতে স্বপ্ন দেখা—জ্ঞানগম্যির কিছুই নয়।'—তার কথায় রাস্তার ধুলোর মতো ঝাঁঝ!

টেম্বাও বলে—'স্বপ্ন দেখেই তো আমরা বাঁচতে পারি না।'

ত্সোলোও যোগ করে—'বাড়ী? বাড়ীর কথা বলছ—এক চিলতে তো জমি! আমরা যদি খনিতে কাজ না নেই—বাড়িতে টাকা না পাঠাই, আমাদের বৌয়েরা আর বাচ্চাকাচ্চারা তো অনাহারে মরবে। আর, তুমি কিনা এই বাড়ীকেই ভাবছ স্বর্গ? তুমি এক স্বপ্ন-পাগলা। ঠিক সেই লোকটার মতোই, সবাই যাকে ভাবত মোজেজ।'

টেম্বাও জোর গলায় বলে—'হ্যাঁ, তুমি ঠিক মোজেজের মতোই।'

আর পাহাড়গুলি অমনি চেঁচাতে লাগল—'তুমি ঠিক মোজেজের মতোই ···মোজেজের মতোই···তুমি মোজেজ···'

মাকি বলে—'জায়গাটাকে আমার ভালো ঠেকছে না। আমাদের

উঠে যাওয়া দরকার ছিল সড়কে। তা না করে আমরা কিনা ভেড়া চুরির কথা বলছি—আর সেজন্যেই আমাদের ঠাট্টা করছে পাহাড়গুলো।'

টেম্বা বিদ্রূপ করে—'তাহলে আমাদের স্বাপ্নিকটি বিনা ভয় পাচ্ছে প্রতিধ্বনিকেই।'

ত্সোলো বলে—'না, আর নয়। ও থাকুক ওর স্বপ্ন বা ভয় নিয়ে, আমাদের কাজ আছে—পুরুষের কাজ।'

কিন্তু মাকি বাধা দেয়—'ও কাজ আমরা করতে যাচ্ছি কেন, বাড়ীর এত কাছেই তো এসে গেছি। আমাদের যদি ধরে ফেলতে পারে তখন তো বাড়ীর পথ ধরতে আরো দেরী হয়ে যাবে। এই সাহেব চাষীরা আমাদেরকে ভয় পায়, তারা তো আমাদের জানে না! এই ভয়ের জন্যেই ওরা মাঝেমাঝে এমন কিছু করে বসে আমাদের পক্ষে যেটা ভয়ংকর।'

টেম্বা সেদিকে কান না দিয়েই বলে—'ছুরিটা তৈরীই আছে, এবারে একটা ভেড়া খুঁজে নেওয়া যাক।'

ত্সোলো ডাক দেয়—'তাহলে আর দেরী নয়। আমরা কাজে বেরিয়ে যাচ্ছি, মাকি এখানে থেকেই আগুন ধরিয়ে নেবে।' ওরা দুজন নদীতীর ছাড়িয়ে যেতে যেতে মাকি বলে দূর থেকে—'যদি ধরে ফেলে তো দেরী হয়ে যাবে অনেক দিন।'

ওরা জবাব দেয় না, কিন্তু পাহাড়গুলো জবাব দেয়—'অনেকদিন দেরী হয়ে যাবে···দেরী হয়ে যাবে···হয়ে যাবে···'

তারপর নিস্তব্ধ অন্ধকার নেমে এল নদীর খাতে, আর নিস্তব্ধতার হিম নিশ্বাস বয়ে এল তার উপর। ওপারে উঁচিয়ে-উঠা অন্ধকারের উপর আলো চুঁইয়ে পড়ছে অদেখা এক চাঁদ থেকে, চাঁদোয়ার নীল-নীল সুতোর মতো দেখাচ্ছে আকাশটা।

কোনো এক সময়ের বন্যায় নদীর পাড়ে আটকে-পড়া একখণ্ড কাঠ খুঁজে পেল সে, শুকনো নদীখাতে পাথরের চাঁইর মধ্যে রেখে আগুন জ্বালল। আগুনের উষ্ণতায় সে তার পরিবারের সান্নিধ্যই অনুভব করছে। আর সবকিছুর কথা বাদ দিলেও এই নাচতে-থাকা হলুদ-রঙ শিখাগুলিকে তার মনে হল তাদের কুঁড়েঘরটার দেয়াল, আর দেয়ালের ঘেরেই রয়েছে তার স্ত্রীর মধুর ভালোবাসা, আর সেখানেই শুনছে তার ছেলের শত শত উৎসুক প্রশ্ন। মনে মনে সে পরিকল্পনা করতে লাগল—কেমন করে ছেলেকে সে বলে যাবে তার দীর্ঘ সুদীর্ঘ পথের কথা ও কাহিনী—এমনভাবে বলবে যেন ছেলেটা সঙ্গেসঙ্গে থেকেই শুনে যাচ্ছে।

'এখনো স্বপ্ন দেখেই চলেছ!'—অন্ধকার থেকেই ভর্ৎসনা করে ওঠে

তুসোলোর কণ্ঠস্বর। মাকির দিকে দুজনের চেহারাটা অন্ধকার থেকে এগিয়ে আসতেই স্বপ্ন-ভাবনার ঘর থেকে ছাড়া পায় মাকি। প্রথমেই এগিয়ে আসছে তুসোলো—হাতে ছুরিখানা। পিছনে টেম্বা—কাঁধের উপর ঝোলানো চামড়া-ছাড়ানো একটা আস্ত ভেড়া।

টেম্বা বলে ওঠে—'বাঃ আগুনটা ঠিকমতো জ্বলল কিনা তাও দেখোনি—নিভে যাচ্ছে যে ?'

তুসোলো মাকিকে ছুরিটা দিয়ে বলে উঠল—'এই যে ধরো। আমরা যা করবার করেছি। এখন, প্রাণ যার মেয়েদের মতোই সে-ই মাংসটা রান্না করুক বসে বসে।'

মাকি অমনি বলে উঠল—'কিন্তু আমাদের কারো হাতে যদি ভেড়ার রক্ত দেখতে পায় তো তাকে আর বাড়ী ফিরতে হবে না।'

'কালই যদি বাড়ীর দিকে যাত্রা করার মতো জোর আনতে হয় তো খেতে হবে না ?'—বলে টেম্বা।

তুসোলো ঠাট্টা করে—'বিপদের স্বপ্ন দেখছ, এখানে তো নেই কেউই।'

পাহাড়গুলি সায় দেয়—'এখানে তো নেই কেউই···নেই কেউই···কেউই···'

মাকি উঠে দাঁড়াল জ্বলন্ত কাঠের সামনে—হাতে ছুরিখানা। বলে—'যেটা অন্যের মাল তা থেকে কখনোই আমি শক্তি পাই না।'

রেগে ওঠে তুসোলো—'আমরা কয়লা কাটি বেন, ওরা ধনী হবে—তাই না। আমরা সড়ক বানাই—ওরা তার উপর দিয়ে গাড়ী চালাবে, তাই না ? অথচ আমাদের কিন্তু চলতে হয় পায়ে হেঁটেই ? আমাদের যা কিছু সবি কি তারা আমাদের কাছ থেকে কেড়ে নেয়নি ? একটা ভেড়া নিয়েছি বলেই চিন্তিত হয়ে পড়েছ। ওরা তো আমাদের সবি নিয়েছে—এমনকি আমাদের সব শক্তিও।'

মাকি জোর গলায় বলে ওঠে—'কিন্তু আমি তো এর মধ্যেই জোর পাচ্ছি খুব, বাড়ীর কাছাকাছিই এগিয়ে আসছি তো ?'

ওদের উপর দিকের নদীতীর থেকে হঠাৎ এক প্রতিরক্ষীর কণ্ঠ, এবং সঙ্গে সঙ্গেই বন্দুকের কর্কশ আওয়াজ।

তুসোলো আর টেম্বা আলো থেকে সরে গেল—মিলিয়ে গেল অন্ধকারে—নদীটা যেখানে বাঁক দিয়ে চলে গেছে, রাস্তা থেকেও আর দেখা যায় না সেদিকটায়।

আগুনের আলোর ঘেরটার ঠিক পাশেই ক্ষীণ আলোকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে তিন-তিনটা কম্বল। আর, আগুনের পাশেই পড়ে আছে দু-দুটো কী এলোমেলো বোঝার মতো : ভেড়া আর মাকি।

আর, পাহাড়গুলো ঠাট্টা করছে—'বাড়ীতে প্রায় এসেই গেছি·· প্রায় এসেই গেছি···এসেই গেছি···'

লেখিকা : স্যানিয়ে ইউয়ুস

আধুনিক আফ্রিকার ছোটগল্পের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কারিগর স্যানিয়ে উয়ুসের জন্ম দক্ষিণ-আফ্রিকার কেপটাউন নগরী। মাতৃভাষা 'আফ্রিদি', কিন্তু ইংরেজী ভাষায় গল্প লিখেছেন অনেক। প্রথম উপন্যাস 'সমতল ভূমি' প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই তিনি জনপ্রিয়তা অর্জনে সমর্থ হন। পেশায় স্কুল-শিক্ষয়িত্রী। বৃহৎ যৌথ পরিবারের পরিচালিকা এবং পুত্র ইউয়ুস ক্রীগ আফ্রিকার অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাসিক। কালো মানুষের সুখদুঃখ বিশেষত শহরবাসী মধ্যবিত্ত পরিবারগুলির সমস্যার এবং নিচুতলার বাসিন্দাদের বিচিত্র মানসিকতার উপর রচিত ছোটগল্পসমূহ যে কোনো লেখকের কাছে ঈর্ষার বস্তু। ২২ বছর বয়সে প্রথম গল্প প্রকাশিত হয়। উপন্যাসের সংখ্যা দুই। জাতীয়তাবোধ ও স্বদেশপ্রেম-চিন্তায় উদ্বুদ্ধ এই নারীর রচনায় মৃদু কৌতুক-মিশ্রিত বিদ্রূপ এবং এমনকি অশ্লীল বিষয়কেও সরল রঙে রেখায় পরিবেশনের ক্ষমতা অসাধারণ।

পাপিয়া গান গায়

জেকব আর আমি সকালের জলখাবার খেতে বসেছি।

মেলা টেবিলে দিয়ে গেছে শুয়োরের মাংস আর ডিম। খেতে খেতে জেকব বলল—এখানে এই পাহাড়েতলীতে যা গরম! এবার ছুটি নিচ্ছি। দুয়েক সপ্তাহ সমুদ্র তীরে থেকে এলে ভালোই হবে—আমি তো ভাবছি তুমিও যাচ্ছ।'

'কোথায় যাচ্ছ?'—জানতে চেয়ে বললাম—'তুমি তো জানো, কোলে তিনমাসের বাচ্চা নিয়ে কোথায়ও যাবার কি উপায় আছে আমার!'

জেকব আমার দিকে রাগের ভঙ্গীতেই তাকিয়ে বলল—'ক্রিস? তুমিও তো জানো একটিমাত্র জায়গাই আছে আমার যাবার মতো। এবং সেটা হারমানাসে আমার আত্মীয়স্বজনের কাছে। হোটেল বা বোর্ডিংহাউসের খরচ কুলোবার মতো অবস্থা নয়। তুমি যাচ্ছ তো?'

আমি মাথা নেড়ে বললাম—'না জেকব, আমি থেকেই যাচ্ছি। বোট্

'রিজিয়া থেকে ঘোড়ায় আর গরুর গাড়ীতে অত লম্বা পথ, আর যা গরম! যাতায়াতে শরীরে আর কিছুই থাকবে না। আর, তোমার আউমার ঘর তো রাতদিনই লোকজনে ঠাসাঠাসি।' আরো একটা কিছু মনে উঠতে বললাম—'মেলার জন্যও তো জায়গা হবে না। এখানে তো ওকে একা একা ফেলে রেখে যেতে পারি না…'

'তা নিশ্চয়ই পারো না, কারণ ফিরে এলেই দেখতে পাবে তোমার পোষা ঐ দামী পাপিয়াটি ডানা মেলে উধাও হয়ে গেছে!'—জেকব মৃদু-মৃদু হাসছিল, আমাদের এই শ্বেতাঙ্গিনী ঝিটির প্রসঙ্গে কোনো মন্তব্য করতে গেলে সবসময়েই হাসে যেমনটা। আরো বলছিল—'দেখো ক্রিসি, তুমি যদি আমি হতাম তো ওর বিষয়ে এতটা বিশ্বাস রাখতাম না।'

'জেকব, আমাকে এভাবে হতাশ করার চেষ্টা করো না।'—আমি মেলার পক্ষেই কথা বলে চলেছি। আমিই তো ওকে খুঁজে নিয়ে এসেছি আমাদের বাড়ীতে কাজ করবার জন্যে, এই কয়েকমাস আগেই। তাই বলছিলাম—মেলার মতো এমন শ্বেতাঙ্গিনী কাজের মেয়ে আর পাইনি কখনোই। কথাবার্তা সুন্দর, সুন্দর আচরণ। যে স্কুলে শিক্ষালাভ করেছে সেই স্কুলকে তারিফ করতেই হয় বৈকি।'

'ঐ শিক্ষার ব্যাপারে আমার বড় একটা আস্থা নেই। ঐ সব শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান মেয়ে সংগ্রহ করে তো অনাথ আশ্রম থেকেই; এবং তখন তো তারা আর বাচ্চা নয়—চরিত্রটা তো গড়ে উঠেছে আগেই।' জেকব ঘড়িটার দিকে তাকাল—'ইস্, এক্ষুনি বেরুতে হবে, নয় তো দেরী হয়ে যাবে। মেলাকে নিয়ে মাথা ঘামিও না। ও এখন খুকী নয়…'—টেবিল থেকে উঠে দাঁড়াল জেকব।

আমি বললাম—'কোসিকে ও থাইসকে সঙ্গে নিয়ে যাও, তোমার ঘরে তোমার সঙ্গেই শুতে পারবে, আমিও এদিকে কিছুটা বিশ্রাম পাব।'

'মরণের আগে পর্যন্ত কখনোই বিশ্রাম পাবে না। মানুষের অমানুষিক সব দুঃখভোগের শাস্তিটাই হবে তখন তোমার শাস্তি।'

জেকব রাস্তায় নেমে পড়ে চলে গেল। কয়েক মিনিট আমি বসে বসে নিজের ভাবনায়ই হারিয়ে গেলাম। কিন্তু মেলা কোথায়? তাই তো, একি, এখনো কেন টেবিলটা পরিস্কার করে রাখেনি? মেলা…মেলা…ফিলোমেলা? মনে জেগে উঠল এক জিজ্ঞাসা—মেয়েটির বাবা-মার মনে কী করে উদয় হল অমন একটি নাম? শব্দটা তো গ্রীক শব্দ—জেকবই ব্যাখ্যা করে বলেছিল—নামটার অর্থ পাপিয়া।

'মা-মণি!'—আমার দ্বিতীয় ছেলে যিউস হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল রান্নাঘর থেকে—'শিগগির এসো। খোঁড়া লোকটা এখানে। দুধের বিল নিয়ে এসেছে।'

'বল, আমি আসছি।'—উঠে পড়লাম, এক-পা খোঁড়া হ্যান্সের সঙ্গে কথা বলতে নেমে এলাম দুধের হিসাব নিয়ে।

হ্যান্স কাজ করে গোয়ালার। আমাদের বাড়ী থেকে বেশী দূরে নয় তার গোয়াল ঘর, সিংহমাথা-পাহাড়ের ঢালের গায়ে। ওখান থেকেই দুধ আসে আমার। ও কেবল গয়লাই নয়, চালিয়ে নিয়ে আসে দুধের গাড়ীও। ভোর থেকে সন্ধ্যা টানা কাজ করে।

এ আর এক বেচারা—গ্রামজীবন থেকে ভেসে এসেছে শহরে। স্রোতের মুখে এক টুকরো কাঠের মতোই···

লম্বাটে রোগা চেহারা, মুখে সব সময়েই কেমন একটা বোকা বোকা ভাব। কপালের উপর ঝুলে ঝুলে পড়েছে লম্বা লম্বা চুল, আর তাতেই আরো বোকা বোকা দেখায়। খাড়া লম্বা নাকটা ঝুঁকে পড়েছে, মুখখানা হাড়-বেরোনো ত্রিকোণ ধরণের। উধাও হয়ে গেছে সামনের দিকের দাঁতগুলো, দেখা যাচ্ছে কতকগুলো মাড়ি শুধু। নাপিতের কাছে যাতায়াত নাই বড় একটা, গোছা গোছা চুল তাই ঝুঁকে পড়েছে জামার কলারের মধ্যে। মাঝেমাঝে গোয়ালঘরের কড়া ঝাঁঝ পাই হ্যান্সের গা থেকেই। খুব সম্ভব ওই একই জামাপ্যাণ্ট পরে ঘুমোয়। তাই তো মনে হয়। তা, শীতকালে যদি শেষরাতে উঠতে হয় তো আগে থেকেই জামাপ্যাণ্ট পরা থাকলে ভালোই হয়।

'মি—মিসিস, দুধবাবু বলছে দুধের দাম বেড়ে গেছে আধ আনা।'—হ্যান্স বিড়বিড় করে—'খড় আর মাড় আমাকে—কর্তাকে কিনতে হয়, তা মাগ্গী হচ্ছে দিন দিন।'

'আর, দুধও তাই হচ্ছে দিনে দিনে—'আমি বলতেই যাচ্ছিলাম হ্যান্সকে—'আধ-আনা বাড়তি দিচ্ছি, আর আমার বাচ্চা তিনটিকে খাওয়াচ্ছি কিনা জলমেশানো নীলচে দুধ?' একথাটা ভাবতেই ভয়ানক রেগে উঠলাম হ্যান্সের বুড়ো মালিকের উপর।

'নোটের ভাঙানি আছে?'

'না, মি-মিসিস, ঐ কোণের গ্রীক দোকান থেকে পেয়ে যাব, ফিরতি পথে দিয়ে যাব।'

হ্যান্সের কথার উচ্চারণ এত খারাপ যে বুঝে ওঠা দায়। মুখের ভিতর তালুটায় কোনো একটা কিছু গণ্ডগোল আছে বেচারার। হ্যান্স রাস্তার কোন ঘুরে অদৃশ্য হয়ে গেলে আমি রান্নাঘরে ঢুকে কিছু কাজের ফরমাস দিলাম। বাচ্চাটাকে চান করাতে হবে, স্টোভের উপরে খাবারটা রাখতে হবে। লেনার পাশে এসে দাঁড়াতেই বারবার শতবার করে দেখছি: কোয়ে ককেভেল্ড থেকে আসা এই হৃষ্টপুষ্ট মেয়েটা দেখতে হয়েছে আরো বেশ মনে ধরার মতো।

ওখানকার ঠাণ্ডাই দিয়েছে ওর অমন সুন্দর রঙ। উনিশ বছর বয়স, ঝিলিক-মারা বাদামী চোখ, গোছা গোছা চুল, উজ্জ্বল চামড়া, আর গোলাপী গাল।

ফিলোমেলা ট্রেন থেকে নেমে এসেছিল, তখন সঙ্গে ছিল ছোট্ট এক টিনের ট্রাংক। ভিতরে ওর যাকিছু পার্থিব সম্পদ: কালোরঙের একটা স্কার্ফ, একজোড়া ব্লাউজ, তুলোর তোষক, একজোড়া উলের মোজা, আর বাইবেল ও প্রার্থনা পুস্তক। গায়ে ছিল পাৎলা রকম একটা জামা, জামার উপরে পুরানো কোট, মাথায় একটা টুপি—দিয়েছে ওর আগের মনিব। একবার বুড়ো ডোমিনি আমাদের গাঁয়ে এসেছিল, আর কী বিষয় নিয়ে কথা শুরু করব ভেবে না পেয়ে শুরু করেছিলাম ওর বাচ্চাদেরই প্রশংসা—'হ্যাঁ, সবার ছোটটিকে নিয়ে খুব আশা আছে।' আমারো একটা উঁচু প্রত্যাশা ছিল ফিলোমেলা সম্পর্কে।

হ্যাঁ, এবারে ভাগ্যটা আমার ভালোই হবে। শক্ত সমর্থ স্বাস্থ্যবতী ফিলোমেলা খুব কাজের মেয়েই হবে। শুরুতেই অনাথ আশ্রমে পেয়েছে ভালোরকমের ধর্মশিক্ষা, তারপরে এক শিল্প-শিক্ষালয়ে। আমি ওকে সূচী-শিল্পেও উৎসাহী করে তুলব, কিছু বন্ধুও জুটিয়ে দেব। তবে, বড় এই শহরে তা তত সহজ হবে না, কারণ এখানে আমিই তো নতুন। আর, মেলার মতো মেয়ের পক্ষে কেপটাউন মোটেই নিরাপদ নয়।

তখন ১৯১৮-র জানুয়ারী, পথেঘাটে সৈন্যদের ভিড়। মেয়েরা বড় বড় কারখানা থেকে বেরিয়ে আসতেই দেখা যেত জুটে গেছে এক এক সঙ্গী। কিন্তু ফিলোমেলাকে নিয়ে আমার দায়িত্ব আছে। এখনো তেমনটা বড়ো হয়নি, ওর মা নেই, ওর বাবা মায়ের মৃত্যুর পরেই পরিবার ছেড়ে কোথায় যে গেছে জানে না কেউ। আমার একমাত্র কাজ ফিলোমেলাকে শেখাব ভালোটা গ্রহণ করতে, আর ত্যাগ করতে যেটা খারাপ।

দু' এক মাসের মধ্যেই ওর ছেলেমানুষ চেহারায়ই দেখা দিল এক লক্ষনীয় পরিবর্তন। ওর উৎসুক চোখ যে বড় বড় দোকানের জানালা দিয়ে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে, কিংবা রাস্তার মেয়েদের সুন্দর সুন্দর পোশাক দেখে তারিফ করতে থাকে—তা তো অকারণে নয়। ওর সেই পাৎলা পোশাকটা ছেড়ে ও ধরেছে এখন ছিমছাম ধবধবে ফ্রক, মোটারকম কালো উলের মোজার বদলে পরেছে লাল রেশমীটা। কিন্তু শহরে যে নানা ধরণের আপদ বিপদ! এবং ফিলোমেলা দেখতে সুন্দরী। আমি ভাবছি এসব। ওর প্রসঙ্গে একটিমাত্র অপছন্দের হ'ল ওর কণ্ঠস্বর। যেমন কর্কশ ও চড়া, তেমনি বিশ্রী।

জেকব একবার মন্তব্য করেছিল—ওর নাম হল পাপিয়া, কিন্তু গলার স্বরটা বরং কাকেরই। এ এমন এক পাপিয়া যে কখনোই গান গায় না…'

আমি বলেছিলাম—'শহরে আছে বহু রকমের বিপদ। ওর বিশ্রী গলার স্বরটা শুনলে বরং সব যুবকেরাই সাত শ' হাত দূরে থাকবে।'

সকালবেলায় কিছু পরেই আমি ওকে ডেকে বললাম—'মেলা, বাবু দুদিনের জন্যে বাইরে যাচ্ছে ছুটিতে। কোসির আর থাইসের জামাপ্যান্ট ঠিকঠাক করে রাখবে। আমি যাচ্ছি না।'

'মাদাম, আপনার এখানে একা থাকতে ভয় করবে না?'

'ভয়ের কী আছে?'

'মাদাম, কেবলি তো শুনছি চোরে জানালা-দরজা ভেঙ্গে ঘরে ঢুকছে—চুরি করে নিচ্ছে সব। আর, ঐ যে সৈনিকেরা কেবল ঘোরাফেরা করছে, ওদের মতলবও তো ভালো নয়।'

'মেলা, চোরেরা ঠিকই জানে কোথায় তারা বড় রকমের দাঁও মারতে পারবে। এ বাড়ীতে কখনোই টাকাপয়সা রাখা হয় না। আর, আমার হীরাজহরতও নেই, দামী দামী পোশাকও নয়। ওদের পছন্দমতো জায়গা শহরতলীই—ওখানেই বাস করে ধনীরা।'

'কিন্তু মাতাল সৈনিকেরা?'

'মাতাল সৈনিকদেরও ভয় খাই না। তার উপর তুমি আছ বেশ শক্তসমর্থ—এক ধাক্কা মেরেছ তো চিৎপাত।'

দুএকদিন পরেই চলে গেল জেকব। তা, শেষ মুহূর্তে কিনা দিয়ে গেল বিশ পাউণ্ড? বলল—হিসাব মিটিয়ে দিতে লাগবে। পুরুষ জাতটা বড়ই অদ্ভুত। নিজেই মিটিয়ে দেয়নি কেন? ফর্দমতো পাওনাটা না মিটিয়ে কিনা শুয়ে শুয়ে পত্রিকাই পড়ে গেল। বিশ পাউণ্ড! আমার হাতে কখনোই তো এত টাকা আসেনি, এবং এটা আমার ভালোও লাগছে না। টাকাকে আমি ভয় করি—আসতে বহু কষ্ট, কিন্তু উড়ে যেতে সময় লাগে না। আমার ভুলো মন। সহজেই হারিয়েও বসতে পারি। ঘরে আগুন লাগতে পারে। তখন তো খোকাকে নিয়েই ব্যস্ত থাকব, টাকাটাও মার যাবে। এতগুলি নোট এখন কোথায় যে রাখি? আমার জামাকাপড়ের আলমারীটায় অনেকগুলি কাপড়ের তলায়ই রেখে দিলাম সাবধানে।

সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলেই বন্ধ করে দিলাম সামনের দরজা, বন্ধ করে দিলাম খড়খড়িগুলো, খিল দিয়ে দিলাম অন্যসব দরজায়। কিন্তু একি, রান্নাঘরের চাবিটা দেখছি না তো। বাচ্চারা ফেলেই দিল নাকি? মেলা এসে খুঁজল আমার সঙ্গে সঙ্গে। উঁকি মেরে মেরে দেখতে লাগলাম প্রতিটি কোনকানাচ, উলটপালট করে ফেললাম ড্রয়ারের জিনিসপত্র। কোথায় চাবি? কিন্তু এখন আর কিছুই করার নেই। অগত্যা আমি কাঠের দুর্বল খিলটাই লাগিয়ে

দিলাম আঙিনার দিকের দরজায়। পাঁচিলটা অবশ্য বেশ উঁচুই, ওটা বেয়ে ওঠাটা অত সহজ নয়। নিজেকেই ভরসা দিচ্ছিলাম। আমার ঘুমও পাৎলা। একটু শব্দেই জেগে উঠব ঠিকই।

জেকব যদি ফিরে আসত তো পাওনাটাও মিটিয়ে দিতে পারত, রান্নাঘরের তালাটায়ও ঠিক বন্ধ করে রাখতে পারত। জেকবের উপরে এবং পাওনাটার উপরে এবং চাবির উপরে রাগ ও বিরক্তি নিয়েই ঘুমিয়ে পড়লাম।

মাঝরাতে ধড়ফড় করে জেগে উঠলাম। বিছানায় উঠে বসলাম, ঢিপঢিপ করছে বুক। কোথাও থেকে অদ্ভুত একটা আওয়াজ হচ্ছে দুপ্… দুপ্… দুপ্…এ আবার কিরকম শব্দ এ বাড়ীতে। আলোটা জেলেই বিছানা থেকে নেমে পড়লাম। আওয়াজটা নাই আর।

প্রথমেই মনে পড়ল জেকবের দুশো টাকা। কোথায় লুকিয়ে রাখি এখন? চোরে নিশ্চয়ই আলমারীটা খুঁজবে। মাদুরের তলায়? নাঃ, ওই চালাকিটা ওদের খুবি জানা। কিন্তু ফন্দী একটা আঁটতেই হবে। আমার মোজার মধ্যে নোটগুলি ঢুকিয়ে দিয়ে দলা পাকিয়ে ছুঁড়ে দিলাম আলমারীটার উপরে। একটা নামজাদা বীর পরিবারের সন্তান আমি—সেটা তো আর মিথ্যে নয়…এবারে খুঁজে বার করব কোথায় আছে সেই বাটপাড়।

আমি গাউনটা পরে নেমে গেলাম, রান্নাঘরের দরজাটা খুলে সন্ধান করছি আঙিনাটায়। সবকিছুই নীরব নিস্তব্ধ, আঙিনার সিমেণ্টের মেঝেতে ঝলমল করছে জ্যোৎস্না।

মেলার ঘরের দিকে ছোট্ট একটা গা-বারান্দা। দরজাটা বন্ধ। মেয়েটাকে জাগাতে ইচ্ছে করছে না। একটুতেই ভয় পেয়ে চেঁচামেচি শুরু করতে পারে—তখন এই পাগলীটাকে কেমন করে সামলাব?

ঘরে ফিরে এসে শুয়ে রইলাম—শ্বাস বন্ধ করেই শুনছি। ক্যাঁচ-ক্যাঁচ আওয়াজ করছে ছাতের বিমটা, লোহা দীর্ঘশ্বাস ফেলছে। কত সব বিচিত্র আওয়াজই যে শোনা যায় ঘরের ছাতে। মাঝে মাঝে মনে হয় একেবারে মানুষেরই কণ্ঠস্বর। এবারে আবার ওই দুপ্… দুপ্… দুপ্।…হ্যাঁ, আমি জেগেই তো শুনছি—আমার কল্পনা নয়।

উঠে পড়লাম। এবারে খুঁজে খুঁজে দেখব একটার পর একটা ঘর। বৈঠকখানার জানালাটা অর্ধ বৃত্তাকার, ওখান থেকে দেখা যাচ্ছে সামনের দিকটা। তাকিয়ে দেখছি জ্যোৎস্নায় রাস্তাটা একপাত রুপো। থাইস কয়েকদিন আগে যে ঘরের মতো একটা তৈরী করেছিল কাগজের টুকরো ও দেশলাইর বাক্সগুলি দিয়ে সেটা উল্টোদিকের ঘরটায় ফেলেছে তার ছায়া। ছায়াগুলি

দেখাচ্ছে বেশ স্পষ্ট এবং কালো, এবং শক্ত কিছুই যেন। রাস্তা জনশূন্য, ফাঁকা, এবং চারদিকেই শুধু নিস্তব্ধতা···গভীর নিস্তব্ধতা···

আমি ভাবছিলাম, দু এক ঘণ্টার মধ্যেই তো দুধের গাড়িটা এসে ভেঙে দেবে মাঝরাতের এই সুন্দর নিস্তব্ধতা—খটখট শব্দে এগিয়ে আসবে পাথুরে রাস্তা ধরে। আর প্রথম যে মানুষটি এই নিস্তব্ধতা ভেঙে দেবে সেই হল একপা-খোঁড়া হান্‌স। ওর আগমন তখন ভালোই লাগবে, আমি যা ভয় পেয়েছি। ঘুমের এখন আর প্রশ্নই ওঠে না।

আমার ঘা ঘেঁষে কি যেন চলে গেল—পিছিয়ে গেলাম এক লাফে। ফ্যাকাশে হয়ে উঠেছি বাইরের জ্যোৎস্নার মতোই। না, ওটা এক কলাবাদুড়। ও ব্যাটা কী করে ঘরে ঢুকল? তা, এখনি তো আমি বাদুড় শিকার শুরু করতে পারছি না। কে বা কিসে ওরকম অদ্ভুত শব্দ করছিল সেটাই এখন আমাকে খুঁজে বার করতে হবে। কিন্তু আমাকে এগোতে হবে সাবধানে, কারণ আমি এগোলেই বন্ধ হয়ে যায় শব্দটা।

বিছানায় ফিরে এলাম···নিঃশ্বাস যেন রুদ্ধ করে রেখেছি। দুপ্···দুপ্···দুপ্···আবার। খুব ঠাণ্ডা মাথায় কাজ করতে হবে এবং নিঃশব্দে···

পায়ে স্যাণ্ডাল না পরেই পা টিপে টিপে এগোচ্ছি বারান্দার দিকে। অন্ধকারে থেমে পড়ে পিঠটা চেপে রেখেছি দেয়ালে। হাতে রয়েছে কুড়ুলটা! কেউ দরজা খুলে ঢুকেছে কি, ঐ কুড়ুলিটা দিয়েই দুফাঁক করে ফেলব ওর মাথাটা।

দেয়ালের গায়ে দাঁড়িয়ে আছে একটা টিনের বাক্স—ওটায় করেই সেই কতদিন আগে বোর্ডিং-স্কুলে নিয়ে যেতাম আমার জিনিষপত্তর। উঃ, কী বিশ্রীই না লাগত ওটাকে। তারপর ওতেই রেখেছি ময়দা। কয়েকবছর হল এখন খালিই পড়ে থাকে। যুদ্ধের দরুণ এখন ময়দা তো দুর্লভ বস্তু, আমার ভাইয়েরাও আর এই দিদিকে ভেট পাঠায় না।

ভয়ে আর ভাবনায় এমন নেতিয়ে পড়েছি যে ঐ টিনটার উপরে বসতেও ভয় পাচ্ছি। আর, বসলেও দুমড়ে যাবে। একটা ইঁদুরের মতোই নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে গেছি দেয়ালের গায়ে। ঐ তো আবার! দুপ্···দুপ্···দুপ্··· একেবারে কাছে থেকেই। আবার শুনে নিলাম। হ্যাঁ, ওই টিনের বাক্সটা থেকেই। খুব সাবধানে তুলে ফেললাম ডালাটা। টিনটার মধ্যে একটা ইঁদুর কিনা লাফাচ্ছে এদিক থেকে ওদিক। ঝপাং শব্দে বন্ধ করে দিলাম ডালাটা।

বিখ্যাত বীর পরিবারের মেয়ে, তুমি কিনা কুড়ালি দিয়ে দুফাঁক করে দিচ্ছিলে একটা লোকের মাথা, আর মারতে পারছ না একটা ইঁদুরকেও।···

তা, ইঁদুরটাকে মারতেই হবে। নইলে তো আর ঘুমোতে পারব না। মেলাকে ডাকতে হচ্ছে। মেলা হিংস্র হয়ে উঠবার সুযোগ পেলে খুশিই হয়, এটা দেখেছি আমি। কখনো কখনো ও যেভাবে আমার কচি বাচ্চাটাকে হিঁচড়ে নিয়ে সজোরে বুকে ঠেসে রাখে। আমি তাতে আঁৎকেই উঠি।

মেলার দরজাটা খুলে আলোটা টিপে দিলাম।

দাঁড়িয়ে পড়লাম স্তম্ভিত,—মুখে কথা সরছে না। ফিলামেলা শুয়ে আছে খোঁড়া হ্যান্সের বাহুর ভাঁজে। দুজনেই গভীর ঘুমে নিঃসাড়। হ্যান্সের মুখখানা ঈষৎ হাঁ হয়ে আছে—ঝুলে পড়েছে কিছুটা। দেখা যাচ্ছে তার ভাঙা-ভাঙা ক্ষয়ে যাওয়া দাঁতের মাড়ি। আর, মেলার সুগঠিত শক্ত-সমর্থ একটি হাত আলগোছে যেন বিশ্রাম করছে হ্যান্সের রোগা বুকের উপর। মেলার দুইগালে পাকা ডালিমের রঙ, ঘন কালো চকচকে চুল গোছায় গোছায় নেমে আছে তুষার-শাদা বালিশের উপর।

শুয়ে আছে মেলা। যেন একটি নিরীহ শিশু। দুজনেই ঘুমোচ্ছে এত গভীর ঘুম যে আকস্মিক এই আলোর ঝলক, আমার নড়াচড়া ও উত্তেজিত নিশ্বাস— কিছুতেই ওরা জাগল না।

আমি স্তম্ভিত, ক্রুদ্ধ। কিন্তু আমি তো বরং ভীরুই। ঘুরে দাঁড়ালাম, দরজা দিয়ে বেরিয়েই দড়াম শব্দে বন্ধ করে দিলাম দরজাটা।

ভেবেছিলাম ঐ শব্দেই এমন কি তার ঘুমের মধ্যেই হ্যান্সের মনে পড়বে আস্তাবলের দরজা বন্ধ করার আওয়াজ,—জাগিয়ে দেবে তাকে মধুর স্বপ্ন থেকে। এবং তাহলে সে সময়মতোই হাজির হতে পারবে তার কাজে। যদি দেরী করে ফেলে তো, ওর খিটখিটে মনিব নিশ্চয়ই ওকে ছাড়িয়ে দেবে।

ময়দার টিনটার মধ্যে ইঁদুরটা এখন একেবারেই চুপচাপ।

বেড়াল পালালেই তবেই তো ইঁদুর শুরু করে তার খেলা···

কিন্তু আমি এবার কী করি ভেবেই পাচ্ছি না। এ কী সমস্যায় পড়লাম! হা ভগবান, হে প্রভু···

একের পর এক ভেড়ার পাল গুণছি, না এতেও ঘুম আসছে না।

আমার ক্লান্ত ভাবনার মধ্যে ক্ষীণ সুরে অবিরাম একটানা এক সুর বাজছে গানের ধুয়ার মতোই: পাপিয়া গান গায়, পাপিয়া গান গায়···কী মধুর গান···

লেখক ঃ উয়াস্ ক্রৌগ

বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী এই লেখক আধুনিক আফ্রিকার অন্যতম শ্রেষ্ঠ লেখক। কবি-নাট্যকার-প্রাবন্ধিক, সমালোচক-গল্পকার, এবং স্পেনীয় কবি গার্সিয়া লোরকার রচনার অনুবাদক। সাঁতার-প্রশিক্ষক রূপে জীবন শুরু। ১৯৩১-১৯৩৫ সাল পর্যন্ত ইউরোপে পেশাদারী রাগ্‌বী খেলোয়াড় রূপে দীর্ঘ জীবন অতিবাহিত। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে তোব্‌রাকে জার্মান সেনাদের হাতে সাংবাদিক রূপে কাজ করার অপরাধে বন্দী হন। ইতালীয় জেল থেকে পলায়ন এবং ১৯৪৪ সালে মার্কিন সেনাদের ইউরোপীয় অংশে যোগদান। যুদ্ধের শেষ পাঁচ সপ্তাহ পাঁচটি ভাষায় খবর-প্রচারক রূপে ল'ডনের বি-বি-সি বেতার-কেন্দ্রে কাজ করা তাঁর ঘটনাবহুল জীবনের উল্লেখযোগ্য অংশ। তিনি একটি উপন্যাস এবং শতাধিক ছোটগল্পের লেখকরূপে বহু সাহিত্য-পুরস্কারে ভূষিত। ১৯৫৮ সালে নাটাল বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সাহিত্যে সম্মানসূচক ডক্টরেট উপাধিতে ভূষিত করেন। এখানে গৃহীত 'কফিন' গল্পটিতে একটি গ্রাম্য পরিবারের ইতিহাসই নিখুঁত ভাষায় বর্ণিত। লেখকের নিজের ভাষায় তাঁর সাহিত্যের মূল প্রেরণা আফ্রিকার অন্যতম শ্রেষ্ঠ লেখিকা স্যানিরে ইউয়ুস—এই লেখকেরই মা। এখানে গৃহীত গল্পটি বার্লিন থেকে প্রকাশিত 'ফলোরিং দ্য সান' সংকলন থেকে অনূদিত।

এক কফিনের ইতিহাস

॥ ১ ॥

শেষরাতে আমি জন্মেছিলাম। বৃদ্ধ লরেন্সের প্রথম নাতির সম্মান আমার কপালেই লেখা হল। মায়ের কাছে শুনেছি ঠাকুর্দা নাকি সেইরাতে এক ফোঁটাও ঘুমোননি। অস্থিরভাবে বিচরণ করেছেন সারা ঘর-ওঠোন, আর মাঝে মাঝে রান্নাঘরের পাশে বসে এলাচ চিবোতে চিবোতে দূরে আকাশের বিভিন্ন নক্ষত্রের অবস্থান সম্পর্কে হিসাব করে অংক কষেছেন। কোন্ তিথি, কোন্ লগ্ন, কোন্ নক্ষত্রে আমার জন্ম সেসব কথা আমি এই উঠতি বয়সে একদম ভুলে গেছি। মায়ের কোলে কবে উঠেছি কিংবা ভূত-পেত্নীর গল্প ঠাকুমা কবে

বলেছেন কোনো কথাই আজ আর মনে নেই। তবে মাসী-পিসিদের মুখে যেটুকু শুনেছি মনে হয় ঠাকুর্দা আমার জন্মটা দেবতার এক আশীর্বাদ বলেই মনে করেছিলেন। বিশেষত, উষালগ্নে আমার পৃথিবীতে আগমন কিনা।

ঠাকুর্দার বয়স তখন সবে ষাট, শরীরটা এতটুকুও ঝুঁকে পড়েনি। ঠাকুমা যখন খবর দিয়ে বললেন—'এক ফুটফুটে খোকা হয়েছে তোমার বড় ছেলের।' ঠাকুর্দা শুধু আনন্দে ঠাকুমাকে প্রায় জড়িয়ে ধরেই বলেছিলেন—'এবার আমি দাদু হলাম।' এসব ঘটনার পরেই তিনি ভেড়ার পাল নিয়ে দূর পাহাড়ের নিচে চলে গিয়েছিলেন। পাহাড়গুলি বেশী উঁচু নয়। আমার বাবা ওই পাথরেই পা শক্ত করেছেন, আর তাঁর ছেলে হয়ে আজকাল প্রায়ই আমি ওই পাহাড়ের মাথায় উঠে চুপচাপ বসে থাকি। এখানে আলো ও ছায়ার খেলা দেখবার মতনই বটে। বিশেষত দূরের গ্রামটাকে মনে হয় কাঠের খেলনা। এইখানে অন্ধকারে বসে থাকা বেশ বিপজ্জনক। রাতে বিষাক্ত সাপ গুহার ফোকর ছেড়ে নিচে নেমে আসে ইদুর, পাখির ছানা, মুরগী আর খরগোসের লোভে। তবে আমার ঠাকুর্দা এসবে কোনদিন পিছপা হননি, বুকভরা সাহস নিয়েই মেরেছেন অনেক অনেক সাপ। তার প্রমাণ? ঘরের দেওয়ালে আটাশটা রকমারী সাপের কাটা মুন্ডু। আমাদের গ্রামের কেউ পাহাড়গুলিতে যেতে ভরসা পেত না। কেননা, এক পাহাড়ের কাছে দাঁড়িয়ে একবার আওয়াজ করলে সাত পাহাড়ে সেই শব্দটা একে একে বেজে উঠত। লোকে বলে, ওখানে কবর থেকে জেগে উঠে প্রেতাত্মারা দিনে দুপুরে নেচে বেড়ায় গান গায়, হাসে-কাঁদে। আমার জন্মের রাতে এই পূবের পাহাড়ের গায়ে শত শত ছেঁড়া মেঘ এসে জমা হয়েছিল। তারপর নেমেছিল বৃষ্টি। আশ্চর্য, আলো ফুটবার সঙ্গে সঙ্গেই সমস্ত আকাশটা পরিষ্কার হয়ে গেল। আমার মা আমাকে বুকের মাঝে রেখে দুধ খাওয়াচ্ছিলেন। কাঁচা হলুদ-বাটা রোদ এসে পড়েছিল তার মুখে আমার বুকে। আমি যে তাদের প্রথম সন্তান—প্রোজ্জ্বল ভবিষ্যৎ। গাছের পাতায় পাতায় তখনো হাজার শিশির বিন্দু জ্বলজ্বল করছিল মুক্তোর মতন। গ্রামের চৌ-মাথার মোড়ের পাইন গাছটার পাতাগুলি ঝরে গেছে আগেই। এই গাছটা আমার ঠাকুর্দা নিজহাতে লাগিয়েছিলেন। তখন তার বয়স মাত্র বছর বারো। মা প্রায়ই বলেন, এই গ্রামের গাছটার মধ্যেই আমাদের আশা-ভরসা স্বপ্ন—সব ভূত-ভবিষ্যৎতের ইতিহাস বিস্তৃত রয়েছে শত শত ডালপালার মতন। বংশের শিকড় প্রবেশ করেছে মাটির গভীরে।

আমি প্রায়ই ঠাট্টা করে বলতাম—'দাদু, গাছটার জায়গায় তুমি দাঁড়ালেই ভাল হতো।' গাছটার জন্মবৃত্তান্ত দাদুর ভালোই জানা, কিন্তু আমাদের বংশের উৎপত্তিটা কোথায়? আমার কাকা ফ্রাংক বসে বসে গাছের তলায় ছবি

আঁকতেন। দাদু পাশে দাঁড়িয়ে বলতেন—'হ্যাঁ, খোকা। আমার একটা ছবি এঁকে রাখিস। কবে আছি কবে নেই, সবি ভাগ্য তো।' ফ্রাংক সারাটা বছর গ্রীষ্ম বর্ষা শীতের সীমানা ডিঙিয়ে শুধু তুলির রঙের আঁচড় টেনে চলতেন। দাদু গর্ব করে শুধু গ্রামের লোকদের ডেকে বলতেন—'আমার ছেলে শিল্পী। শহরে পাঠান হয়েছে ওর আঁকা ছবি।' কাকা আমার একটা প্রতিমূর্তি এঁকে দিয়েছিলেন জন্মদিনে। রোজি আমাদের বাড়িতে কাজ করত। এই কালো বুড়ির কোলে পিঠেই আমার বাবা-কাকা বড় হয়ে উঠেছিলেন। আমাদের বাড়ির বুড়ি শুধু নয়, তার চেয়ে উঁচুতেই তার আসন। বয়সের হিসাবে রোজি গ্রামের অনেকের চেয়ে বড়। আমার ঠাকুর্দাকে ডেকে বলেছিল—'লরেন্স, বাইরে না গিয়ে, গাছটার দিকে দিনরাত না তাকিয়ে ঘরের নাতিটাকে কোলে বসিয়ে গান শোনা। নাতি যা কান্না শুরু করেছে।' লরেন্স একটা বড় হাই তুলে বলতেন—'একটা ডাল দেখলে কি আর গাছটাকে চেনা যায়। রোজি, তুমি বলো দেখি আমার নাতি বড় হয়ে আমার মতন হবে কিনা। আমরা পুরোনো আমলের মানুষ। নতুনেরা হয়তো গাছপালা সব আগুন জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ফেলবে।'

ঠাকুর্দা আমাদের ঘরের মধ্যে এলেন। আমি আর মা দুজনেই শুয়ে ছিলাম। আমার ছোট্ট দেহটির দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে কি যেন দেখলেন। তারপর মায়ের হাত দুটোতে স্নেহ-চুম্বন দিয়ে বললেন—'আন্না, তোমার ছেলে রাজা হবে। আমরা সবাই এজন্য গর্বিত ও আনন্দিত।' কথাগুলি শেষ করে তিনি রান্না ঘরে চলে গেলেন। একের পর এক তিনকাপ গরম কফি খেয়ে আবার ফিরে গেলেন মাঠের মাঝে। আমার জন্মদিনকে স্মরণীয় করে রাখবার জন্য ছ-খানা মোটা মোটা ভেড়া জবাই দেওয়া হয়েছিল। প্রথম ভেড়াটা ঠাকুর্দা দান করলেন আমাদের বাড়ির লোকদের জন্য, দ্বিতীয় ভেড়াটা রোজি আর তার পরিবারের জন্য, তৃতীয়টা গ্রামের রাখালদের। ঠাকুর্দা এবার একটু ভেবেচিন্তে সমাগত আগন্তুকদের বললেন—'চার্চের স্কুলের মাস্টার ডোমিনিকে একটা ভেড়া দেওয়া হবে। তাঁর প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ, এবং আশাকরি আমার বংশের নতুন শিশুটিকে উনি সৎ শিক্ষাই দেবেন।' পঞ্চম ভেড়াটা আমাদের পাশের বাড়ির বুড়ো ভ্যান-গ্র্যানকেই দেওয়া হল। যদিও এই দুই বুড়ো বছর দুই হল নিজেদের মধ্যে একটি শব্দও বিনিময় করেনি। ভুট্টা ক্ষেতের জমিটার মালিকানা নিয়েই যত গোলমাল। আমার ঠাকুর্দা এই শুভদিনে পুরোনো বিবাদ মিটিয়ে ফেলতে চান। কেন না, ভ্যানের নাতি আর আমি যখন বড় হব তখন যেন নতুন করে লড়াই শুরু না হয়। ঠাকুর্দা লরেন্স এবার শেষ ভেড়াটাকে এই গ্রামে আজ সকালে যে নতুন পথচারী এসেছে সেই যুবকের হাতেই তুলে দিলেন উপহার-স্বরূপ। এইভাবে দানপর্বের পালা শেষ হল।

॥ ২ ॥

দুপুরবেলা ঠাকুমা দরজার পাশে বসে সেলাই করছিলেন। পাশেই ঘরের আলমারীতে এক বোতল জেলী রাখা আছে, সোনালী তামাক পাতার গন্ধে ভরে উঠেছে চারদিক। খাটের নিচেই ঠাকুর্দা সেই বিরাট কফিনটা রেখে দিয়েছিলেন। পাইন কাঠে তৈরী এই বড় বাক্সটার মধ্যে শুকনো আপেল ও আঙুর থেকে শুরু করে চা চিনি সমস্তই সারি সারি সাজান আছে। কফিনটার মাথার দিকে রয়েছে একটা কৌটো—যার মধ্যে আছে গোটা পঞ্চাশেক চুরুট। আমার ঠাকুমা হঠাৎ কফিনটার দিকে তাকিয়ে আশ্চর্য হলেন। ভেতরে কে ঘুমোচ্ছে? অবাক ব্যাপার! তাঁর স্বামী কফিনের ভিতর শুয়ে ঘুমোচ্ছেন। স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে ঠাকুমা একটু হাসলেন। তাঁর মনে পড়ে সেই দিনগুলি, তখন নিজের বয়স কম ছিল। লোক বলত লরেন্সের বউ নাকি সুন্দরী। আয়নার সামনে আজকাল দাঁড়ালে শুধু দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে ঃ কোথায় সেই রাত, কোথায় রূপ। চুলে পাক ধরেছে। মুখে বয়সের ছাপ কত গভীর। বড় দুষ্টু ছিল লরেন্স। প্রায়ই পিছন থেকে চোখ দুটো চেপে ধরে বলত—'বল দেখি কে?' কিংবা জানলা দিয়ে সাপের কাটা মাথাটা তুলে ধরত! লরেন্সের স্নেহ ভালবাসা ছিল কত গভীর। আজো চুপিচুপি কাছে ডেকে বলেন শিকারের কাহিনী। হাতের কাথাটায় সুতের ফোড় দিতে দিতে ঠাকুমা বললেন—'এই দিনের বেলায় কফিনের মধ্যে ঢুকেছ কেন, লরেন্স? শীতের রাত নয় যে ঠাণ্ডার ভয়ে বাক্সে ঘুমোতে হবে?' লরেন্সের হাত ধরে ডাকতেই চোখ দুটো খুলে গেল—'বড় জ্বালাতন করছো, বউ। একটু ঘুমোতেও দেবে না? কফিনটার মধ্যে আমার বাবা ঘুমিয়েছেন, দাদারা ঘুমোতেন আর আমি একটুখানি শুয়েছি, সেটা বুঝি বেশী দোষের হয়ে গেল? আমি এই কফিনের মধ্যেই জন্মেছি। এই কফিনের মধ্যেই মরতে চাই।' একটা চুরুট ধরিয়ে ঠাকুর্দা উঠে বসেছিলেন। ঠাকুমা স্বামীর হাত দুখানি নিজের কাছে টেনে নিয়েছিলেন। 'আমার বুকের হাড় কখানার ইতিহাসের চেয়েও প্রাচীন আমার এই কফিন। আমার বাবা এই কফিনটা মরার আগে আমাকেই দিয়ে গেছেন। ভাবছি বাকী কটা দিন তুমি আর আমি এইখানেই বিছানা পেতে রাত কাটাব।' ঠাকুমা হেসে বললেন—'এই সময় কি ছেলেমানুষী শুরু করলে, ছেলেরা এসে পড়বে।' সোনালী ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে ঠাকুর্দা বললেন—'বউ, এবার খাবার জোগাড় করো। আপেল সেদ্ধ আর ভেড়ার মাংসের চপ।

তোমার হাতের রান্না খেতে চাই।' ঠাকুমার নামটা বলতে আমি একদম ভুলে গিয়েছি। ঠাকুমার নাম সান্তা। বুড়ো লরেন্সের কথা শুনে আমার বুড়ি ঠাকুমা সান্তা উঠে দাঁড়ালেন। 'হ্যাঁ, চলো তবে রান্নাঘরে। খাবার সব টেবিলেই সাজান আছে। তুমি ঘুমিয়ে পড়েছিলে বলে আর ডাকিনি।' লরেন্স উঠে দাঁড়ালেন। কফিনের ঢাকনাটা আটকে রেখে সান্তার ঠোঁটে ও চিবুকে চুমু খেলেন—'তুমি এখনও ঠিক আগের মতনই সুন্দর।' ঠাকুমা মৃদু হেসে বললেন—'অভিনয় বন্ধ করে এবার রান্না ঘরে চলো। খাবার তৈরী।' রোজির গলা শোনা যেতেই দুজনে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলেন বাইরে।

॥ ৩ ॥

আমি যেসব দিনের কথা বলছি তখনকার দিনে আমার ঠাকুর্দার মতনই বাকী সব চাষীরা চার্চের পাঁচিল থেকে কিংবা শহর থেকে বেশ দূরেই সপরিবারে বাস করত। কবরখানা ছিল গ্রাম থেকে বহু দূরে পাহাড়ের পাশের জনশূন্য সমতলে। মৃত্যু অবশ্যই শহর কিংবা গ্রাম—এই ব্যবধানটা মনে রেখে হাজির হয় না। তা শীতকালের দমকা ঝড়ের মতই আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিত। কোন্ সময় এসে কাকে ডাক দিয়ে যাবে বলা মুশকিল। সুতরাং, প্রত্যেক মানুষকেই তার কফিনটা আগে থেকে সাজিয়ে রাখা উচিত। তবে আমার ঠাকুর্দার কফিনটা এই অঞ্চলের যে কোনো কফিনের চেয়েও বেশী মূল্যবান। কাঠের গায়ে কারুকাজ-করা, লতাপাতাফুল প্রভৃতি ছবি আঁকা। মোয়েলডাম শহরের দোকানের কালো কফিনগুলির পাশে খয়েরী রঙের এই বাক্সটাকে সাজিয়ে রাখলে প্রত্যেকটি লোকে এই কফিনের মধ্যেই মরাটা বেশী সৌভাগ্যজনক বলে মনে করবে। ভিতরে নরম গদি-বালিশ সবই আছে। বন্ধু জন ষ্টিফেনের বাড়িতে যাবার সময়ও ঠাকুর্দা এই কফিনটাকে ঘোড়ার গাড়ির মধ্যে তুলে নিয়েছিলেন। আমার স্পষ্ট মনে আছে সেদিন বিস্কুটের প্যাকেট খুঁজতে এসে দেখি ঠাকুর্দার ঘরের মধ্যে ইয়া-বড় এক কাঠের বাক্স। ঢাকনা খুলতেই দেখি আঙুরের আচার, শুকনো ন্যাসপাতি, আর বোতল ভর্তি আপেলের রস। বিস্ময়ে একটা চুরুটে কামড় দিয়েছিলাম। বড়ই তেতো। পকেটের মধ্যে কতকগুলি বাদাম ভরে নিয়ে তাড়াতাড়ি পালিয়ে এসেছিলাম। তারপর থেকে রোজই দুপুরবেলা চুপিচুপি কফিনটার মধ্যে একবার ঢুকতাম। কয়েকদিন যেতেই দেখি কফিনটা একদম খালি। ঠাকুমা কতকগুলি বাসনপত্র আর চা-চিনির কলসী ভরে রেখেছেন। সুতরাং কফিনের মূল্যটা আমার কাছে ক্রমেই

গেল। একদিন ফ্রাংকলিনা বলল—ঠাকুর্দা নাকি গরুর গাড়ীতে করে ট্রান্স্‌ভালে যাবেন কোন্‌ এক আত্মীয়ের বিয়ে খেতে। সত্যিই কথাটা বাস্তবেই প্রমাণিত হল! নাতনী ফ্রাংকলিনাকে নিয়ে তিনি এক সকালে যাত্রা শুরু করলেন। ঠাকুমা তার আদুরী নাতনীর মাথায় লাল রুমাল বেঁধে দিলেন, আর স্বামীর জন্য দিলেন এক বোতল আঙুরের জেলী ও আপেলের আচার। ঠাকুর্দা এইসব খুবি পছন্দ করেন। গাড়িটা চলে গেল পাহাড়ের আড়ালে। ফ্রাংকলিনা হাত নেড়ে বিদায় জানাচ্ছিল। দীর্ঘ নয় মাস পর ঠাকুর্দা ফিরে এলেন। ফ্রাংকলিনাও এল, শুধু ফিরে এলো না কফিন। প্রশ্ন করে জানা গেল: বুশীতলের পথে লুইস বলে একজন লোক সিংহের থাবায় মারা যায়, তার দেহ কবরখানায় নিয়ে যাওয়া হয়েছিল ঠাকুর্দার চিরসাধের এই কফিনে করেই। অবশ্য ঘরে ফেরার পথে ঠাকুর্দা মোলেনডাম গ্রামের এক ছুতোরের কাছে নতুন কফিন তৈরী করার অর্ডার দিয়ে এসেছেন। এইসব দিনে কফিন ভাড়া দেওয়া বা ধার দেওয়ায় কোনোই অপরাধ ছিল না। কেন না, কোনো লোকের কোথাও হঠাৎ মৃত্যু হলে তাকে কবরখানায় নিয়ে যাবার জন্য কোন সহৃদয় গ্রামবাসী নিজের কফিনখানা ধার দিত। মৃতের শেষ-যাত্রায় সাহায্যের সঙ্গে সঙ্গে নিজের স্বর্গলাভের পথটাই প্রশস্ত হ'ত এবং পুণ্যের ভাগ বেড়ে যেত। আমার ঠাকুর্দার কফিনে করে কম পক্ষে তিনজন মৃত মানুষ তার শেষযাত্রার স্থলে পেঁছিতে পেরেছিল। প্রথমত, কুশ্‌ ব্যাডেনকে আমার ঠাকুর্দা আর তার ভায়েরা মিলে 'স্বাদু-সলিল' কবরখানায় নিয়েছিল এই ঐতিহাসিক কফিনের ভিতরই। দ্বিতীয়ত, কবর দেওয়া হয়েছিল অপুলাস গীর্জার পাশের ভোরিসকে। পথটুকু সে এই কফিনের মধ্যে শুয়েই কাটিয়েছিল শেষবারের মতন মাটি নেবার আগে। আর শেষ ঘটনাটা ঘটেছিল গত বছর—সেই ভুঁড়িয়ালা ইয়া-মোটা হ্যান্সকে হানিংবাস্টের কবরখানায় পেঁছে দেওয়া হয়েছিল।

॥ ৪ ॥

সুদীর্ঘ গ্রীষ্মের ছুটিটা আমি তখন গ্রামের বাড়িতেই কাটাচ্ছিলাম। এখানে আসার দ্বিতীয় দিনেই আমাদের প্রতিবেশী নিক্‌ কুবাসের সঙ্গে ঠাকুর্দার পুরোনো ঝগড়াটা আবার নতুন ক'রে শুরু হল। ঠাকুর্দা উত্তেজিত কণ্ঠে বড়ছেলে ওমপিরেটকে আঙুল দেখিয়ে একটা সমস্যা বিশদভাবে বুঝিয়ে দিলেন: আমি কুবাস্‌কে বলেছি পশ্চিমের মাঠটার অর্ধেক তার, বাকীটা আমার। তার জমিতে সে যা ইচ্ছা করুক কিন্তু আমার যবক্ষেতে যদি ভেড়া ঢোকে তবে আর দ্বিতীয়

বার ফেরৎ দেওয়া হবেনা। একবার, দুবার, তিনবার দেখব, তারপর যা ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন সবি আমি নেব। শান্তির জন্য লড়াই করা তো ভালোই। শঠের সঙ্গে শঠতা। পিয়েট, আমরা নদীর পাশের জমিটায় চাষ শুরু করব। দেখি কে বাধা দেয়? দিন কয়েকের মধ্যে ঠাকুর্দার মধ্যে একটা আকস্মিক পরিবর্তন লক্ষ্য করলাম। রোজ দুপুরে ঠাকুর্দা কোথায় যেন চলে যান। নদীর তীরে কিংবা গমের ক্ষেতেও খোঁজ পাওয়া যায় না। এক বিকেলের রোদে নদীর তীরে ধরে আমি হাঁটছিলাম। বাড়ি থেকে প্রায় মাইল দুয়েকের পথ। চার পাহাড়ের মাঝে এক বিরাট সমতল। এখানে নদীর স্রোতটা খুবই গভীর। কুল কুল রবে বেজে চলছিল জলতরঙ্গ। একটা অস্ফুট শব্দ শুনতে পেলাম 'খুক। খুক।' কোনো—পাহাড়ী পশুর ডাক? না, ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। আর খানিকটা এগিয়ে গিয়ে দেখি ঠাকুর্দা উঁচু পাথরের উপর বসে আছেন। জলের মধ্যে বারবার হাত ধুচ্ছিলেন। আর প্রত্যেকবার মুখ বিকৃত করে কিসব-অদ্ভুত আওয়াজ করছিলেন। এমন অবস্থায় দাদুকে আগে কখনও আমি দেখিনি। আমার দিকে চোখ ঘোরাতেই আমি একটু হতভম্ব হয়ে পড়লাম। দাদু মুখের ভঙ্গী পালটে ফেলে একটু হাসলেন। তারপর কাছে ডাক দিলেন আমাকে। আমার পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে বললেন—বুঝলি কিনা আমরা তখন ছোট ছিলাম, তিন ভাই মিলে এই নদীর ধারে পাখি শিকারে আসতাম। বালুর উপরে ঘুমিয়ে দুপুর কাটাতাম।' দাদু দীর্ঘশ্বাস ফেললেন—'কোথায় —সেইসব সোনালী দিন?' কথাগুলি বলবার সময় যেন দাদুর হাত দু'টি কাঁপছিল, গলা আবেগে গাঢ় হয়ে এসেছিল। আমরা দুজনে তখনও হেঁটে চলেছি। কেমন করে তীর মারা শেখা যায়, কোন্ পাহাড়ে ঈগল থাকে কিংবা কোথায় চিতাবাঘ—দাদু সব বুঝিয়ে দিলেন। ঠাকুর্দা মাথায় একটা মোরগের পালকের টুপী পরেছিলেন। বেশ দেখাচ্ছিল দাদুকে। সন্ধ্যাবেলায় বাড়ি ফিরে আমি দাদুর সঙ্গেই খেতে বসেছিলাম। বেশ লাগছিল আমাদের এই দুই বন্ধুকে—যাদের মাঝে আছে রক্তের দৃঢ় বন্ধন ঠাকুর্দা ও নাতির সম্পর্ক। আমি দাদুকে সেদিন কাশতে দেখেছিলাম, বুকে হাত চেপে বসে পড়েছিলেন। কাশির শব্দটা যেন বুকের হাড়ের ফাঁক থেকে বেরিয়ে আসছিল, সঙ্গে রক্তের ফোঁটা। আমার হাতের ইংরাজী বইটার প্রথম পৃষ্ঠাতেই একটা সংক্ষিপ্ত শব্দ ছিল টি. বি.। সোজা কথায় 'যক্ষ্মা বা ক্ষয়রোগ'—বুকের পাঁজরে বা হৃৎপিণ্ডে যে ক্ষয়রোগ হয়। মাস খানেক পর যখন শহর থেকে ঘুরে এলাম দাদুর শরীর সত্যিই ভেঙে গেছে। নোংরা জামা গায়ে ভাঙা খাটের উপর বসে কি যেন ভাবছিলেন। এই ঘরটায় সাধারণত বাইরের অতিথি এলে খুলে দেওয়া হয়। গ্রীষ্মে ঘরটা ঠাণ্ডা এবং শীতে বেশ গরম রোদের আমেজ। বাড়ির

এক প্রান্তে এই ছোটঘর। ঠাকুমা আমার কপালে চুমু খেয়ে বললেন—'ভিতরে আয়। তোর দাদুর অসুখটা বেড়েছে।' দিন চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুমার মুখের হাসিটুকুও যেন শুকোতে শুরু হয়েছিল। চোখ দুটো নিষ্প্রভ এবং চিন্তায় চিন্তায় ক্লান্ত অবসন্ন। বেঁকে গেছে শরীরটা। তবু স্বামীর প্রতি ভালোবাসা যেন আরও গভীর হয়ে উঠেছে। ঠাকুর্দার মুখে এখনো লেগে আছে একমুঠো হাসি। যেন শরতের আকাশে সাদা মেঘ। আমার সঙ্গে আগের মতোই গল্প শুরু করলেন। কতকগুলি মজার ধাঁধা শোনালেন। হাতের তাসগুলি ভাগ করতে করতে বলছিলেন,—'বয়স কম হল না। এবার বিদায়ের পালা।' দাদুর প্রতিটি বাক্য ছিল মধুর-তীক্ষ্ম ব্যংগ-কৌতুক মেশানো। কাউকে আক্রমণ করে অথবা নিন্দা করে কথা বলতেন না, গল্পের ছলেই উপদেশ দিতেন—বিশেষ ক'রে ব্যক্তিগত জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার ঘটনাগুলি। অনেক সময় গল্প শুনতে শুনতে আমাদের চোখে অশ্রুধারা নেমে আসত। মর্মস্পর্শী হৃদয়-বিদারক কাহিনী। তারপর দাদুর যাদু-ছোঁয়ায় যেন আবার বাস্তব জগতে ফিরে আসতাম। মনের মাঝে পরম শান্তি খুঁজে পেতাম। ঠিক যেন বৃষ্টির পর পাহাড়ের বুকে এক ফালি সোনালী রোদ। দাদু বলতেন—'যারা হাসতে ভয় পায় তাদের প্রাণ বলে কোনো পদার্থ নেই। হাসবার ক্ষমতাটা ভগবানের এক সুন্দর উপহার। জীবনে শুধু কান্না নয়, হাসিও প্রয়োজন। পরাজয়কে জয় করতে হলে মুখে হাসি জমিয়ে রাখা প্রত্যেকেরই কর্তব্য। বীরেরা হাসিমুখেই মৃত্যুর আলিঙ্গন গ্রহণ করে।' দাদুর মেজভাই যখন মারা গেলেন তখনো তাঁর ঠোঁটে যেন আনন্দের ও সন্তোষের রেশ লেগে ছিল। মুখে ছিল না কোন ক্ষোভ বা দুঃখ হতাশার চিহ্ন। দাদুর একটা কথা আজো আমি অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলি—'একমাত্র হাসি দিয়েই দূরকে নিকট করা যায়। শত্রুকে মিত্র। আকাশের নক্ষত্রের দুষ্টু হাসি মানুষের মন জয় করে, আর নারীর বাঁকা চাঁদের হাসি গম্ভীর পুরুষকে। জীবনটাকে যদি আনন্দের পাত্রে ধরে রাখা যায় তবে স্বর্গ লাভ করা আমাদের পক্ষে এমন কিছু কঠিন কাজ নয়।'

॥ ৫ ॥

এক ভোরে ক্ষেতের ধারে আমাদের খামারের মধ্যে মিয়েতাকে মৃত অবস্থায় পাওয়া গেল। একশো বছরের বুড়ি সে। লরেন্স পরিবারের প্রায় সবাই নব্বই বছর ধরে আছেন। অর্থাৎ তিনি আমার ঠাকুর্দার বাপের আমলের লোক। বুয়োর

সম্প্রদায় থেকেই আমাদের গ্রামে এসেছিল। ঠাকুর্দাকে খুব ভালবাসত। কেননা, বুড়ির নিজের কোনো সন্তান ছিল না। ঠাকুর্দা কোনো নতুন কাজ শুরু করার আগে বুড়ি মিয়েতার পরামর্শ নিতেন। সূর্যদেবের বন্দী হবার গল্পটা কিংবা অমাবস্যায় চাঁদের মৃত্যু—এই সমস্ত গল্প মিয়েতার কাছেই আমি শুনেছিলাম। গ্রামপ্রান্তের মাটির ঘরেই মিয়েতার বাস। বাড়ির উঠোনে বসে সুতো কাটতেন একমনে। মিয়েতার মৃতদেহের পাশে এসে দাঁড়ালেন আমার ঠাকুর্দা। 'ঘণ্টা-খানেক আগেও তিনি যার সঙ্গে কথা বলেছেন সে আর বেঁচে নেই। দাদুর মুখের হাসি মিলিয়ে গেছে। সেখানে শুধু বিস্ময়ের চিহ্ন। আমার কাকা এডুন কোথা থেকে একটা কফিন জোগাড় করে এনে দিল। সেটার দিকে চোখ পড়তেই দাদু উত্তেজিত স্বরে বললেন—'তোমরা কি পাগল হয়েছ, আমার মাসী ঘুমোবে এই ভাঙা কফিনে। তোমাদের লজ্জা হওয়া উচিত। স্বার্থপরের মতন কেবল নিজের সুখ নিয়েই ব্যস্ত, পরের জন্য ভাবতে শেখোনি। যাও এডুন, আমার কফিনটা ঘর থেকে নিয়ে এস।'

ঠাকুর্দার নিজের কফিনটার মধ্যেই সযত্নে মিয়েতার দেহ রাখা হ'ল। আমাদের পরিবারের প্রত্যেকেই শোকযাত্রায় যোগ দিল। দাদু নিজে দাঁড়িয়ে মন্ত্রপাঠ করলেন। আমরা ঈশ্বরের কাছে সমবেত স্বরে প্রার্থনা জানালাম। মনে আছে কবরখানায় যাবার পথে ঘোড়ার গাড়িতে গাড়ির চালক হয়ে বসেছিলেন দাদু নিজেই। পাশে বসেছিলেন দাদুর ভাই নিকোলাস। গাড়ির মধ্যে ফুল দিয়ে সাজান ছিল খয়েরী রঙের দামী কফিন। এডুন এবং পরিবারের বাকি সবাই কেউ গাধার পিঠে কেউ বা ঘোড়ায়—পিছনে পিছনে গীর্জার দিকে এগিয়ে গেল। পথে একবার বুনো মোষের দল দেখে আমাদের ঘণ্টা খানেক থামতে হয়েছিল একটা সেতুর এপারে। তার উপর আবার প্রচণ্ড বৃষ্টি নেমেছিল। ঠাকুর্দা কিন্তু নির্ভীক ও নির্বিকার—দ্রুত বেগে গাড়ি চালিয়ে বাকি পথটুকু শেষ করলেন। আমরা সত্যিই ভীষণ ভয় পেয়েছিলাম। গীর্জার কাছে পেঁছিতে রাত হয়ে এসেছিল। আমরা মশাল জ্বালালাম এবং দাদু ভাঙা স্বরে গান ধরলেন—'হে অজেয় আত্মা! তোমায় আমার প্রণাম, এই পৃথিবীর বুকেই অনন্ত বিশ্রাম।' কবরে মাটি ভরার সঙ্গে সঙ্গে মিয়েতা চিরদিনের জন্য হারিয়ে গেল লোকচক্ষুর আড়ালে। দাদু তখনো বার্চগাছের তলায় চুপ করে বসে ছিলেন। আজি প্রথম যেন তার চোখে জল দেখলাম। নীরব পদক্ষেপে আবার ফিরে এলাম সবাই। আলোছায়া মাখা গ্রামখানি যেন কুয়াশার চাদর গায়ে ঘুমোচ্ছে।

॥ ৬ ॥

এতদিনে আমরা সবাই বড় হয়ে উঠেছি। কিন্তু মৃত্যু আমার ঠাকুর্দাকে এখনো কাছে ডাকেনি। বসন্তকালের বিকেলে মাঠের সোনালী ফসল ওজন করেছিলেন দাদু, এই সময় তাকে খবর দেওয়া হল ঠাকুমা মারা গেছেন। হঠাৎ হার্টফেল। নীরবে অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে শেষ-বিদায় জানালেন দাদু তাঁর এই সুন্দরী বৃদ্ধা বউকে। মোলেনডাম স্কুলের মাষ্টারি ছেড়ে দিয়ে আমার দিদি ফ্রাংকলিনা আবার ফিরে এল বাড়ি। দাদু তার প্রিয় নাতনীকে কাছে পেয়ে আবার যেন সুস্থ স্বাভাবিক হয়ে উঠলেন। পাশের জমির মালিক ওম কুবাসকে ঠাকুর্দা এই প্রথম চিঠি দিলেন নববর্ষের অভিনন্দন জানিয়ে। কিন্তু কুবাস কোনো উত্তর দিল না। ঠাকুমা মারা যাবার মাস খানেকের মধ্যেই দেখি দাদুর মাথার সব চুল সাদা, গায়ের কোটটা ঢলঢলে, যেন কতকগুলি হাড়ের উপর জামা-প্যান্ট ঝোলানো। স্প্রিং-দেওয়া কাঠের পুতুলের মতন মাথাটা বুঝি হাওয়ায় দোলে। গ্রীষ্ম আসতেই সমস্ত মাঠ-ঘাট শুকিয়ে উঠল। আকাশ এক শূন্যদেশ। যে দিকে তাকানো যায় ধু ধু মাঠ! মাঝরাতে শোনা যাচ্ছিল নক্ষত্রগুলির কান্না। সেইসঙ্গে আর একটা কান্নার শব্দ ভেঙে দিল সমস্ত নিস্তব্ধতা। ঠাকুর্দার সকচেয়ে বড় শত্রু ওম কুবাস মারা গেছে! কুবাসের ছেলে ও মেয়েদের আর্তনাদ আমার ঠাকুর্দাকে মৃত কুবাসের কাছে নিয়ে গেল। পুরোনো শত্রু বিদায় নিল। এড্রুন যদিও কুবাসের ওই ছেলে ভ্যানগ্রান্টের সঙ্গে একটি কথাও বলত না, তবু দাদুর হুকুমে এড্রুন এবার ভ্যানকে আলিঙ্গন জানাচ্ছিল। দাদু শুধু দুঃখ করে একবার বললেন—'কুবাস এতদিন ধরে অসুস্থ সে কথাটা যদি আগে জানাত তবে নিশ্চয়ই আমি যেতাম। আমরা যে একই গ্রামের মানুষ। একই সঙ্গে বড় হয়েছি।'

কবরখানায় আমরা সবাই গিয়েছিলাম। দুই পরিবারের বিবাদটা এইবার যেন মিটে এল। বিশেষত কুবাসের নাতনী লিজার সঙ্গে কেমন করে আমার দিনে দিনে একটা গোপন ভালবাসা জন্মে গেল। দিনে দিনে দাদু আরো বুড়ো হলেন। বহুদিন অসহ্য গরমের পর প্রচুর বৃষ্টি হয়েছিল গতরাতে। ঠাকুর্দার অবস্থা খুবি সংকটজনক হয়ে উঠছে। শ্বাস নিতেও কষ্ট হচ্ছে। বিছানায় শুয়ে ছিলেন। চোখ দুটো বোজা, শরীর ঠান্ডা। গ্রামের ডাক্তার একটু আগে বলে গেছেন—নাড়ীর স্পন্দন থেমে যাচ্ছে। সুতরাং, বাঁচার আশা খুব কম। বিছানার পাশে বসে ঠাকুর্দার মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে ফ্রাংকলিনা ডুকরে

ডুকরে কাঁদছিল। পিয়েট বিবেচনা করে দেখল—ঘরে যে কফিনটা আছে তার মধ্যে দাদুকে শোয়ানো যাচ্ছে না। ছয় ফুট তিন ইঞ্চি লম্বা আমার ঠাকুর্দা ছিলেন এই অঞ্চলের যে কোনো লোকের চেয়ে বেশী উঁচু। কুবাসের ছেলে অবশ্য জানাল—দুদিন সময় পেলে শহর থেকে বড় কফিন নিয়ে আসবে। কিন্তু এই সময় তো বিলম্ব করা উচিত নয়। ঠাকুর্দা ধীরে ধীরে শেষবারের মতন যেন চোখ খুললেন—আমাদের সবাইকে কাছে ডাকলেন। ফ্রাংকলিনার হাত দুটো নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে বললেন—'লিনা, এই সময় চোখে জল কেন? জীবন শুধু মুহূর্তের জন্য, জন্মের সঙ্গেই মৃত্যুর সহ-অবস্থান। আমি পূর্ব-পুরুষদের ডাক শুনতে পাচ্ছি।' জানালা দিয়ে ল্যান্সবার্গের দিকে আঙুল দেখিয়ে জানালেন—'লিজা, মনে আছে ওই শহরে আমরা গত বছর বেড়াতে গিয়েছিলাম। হাজার লোকের ভীড়ে আমি হঠাৎ হারিয়ে গেলাম!' তারপর চোখের জল মুছে নিয়ে নিজের ছেলেদের কাছে ডাকলেন। পিটার, ম্যাথুজ, জ্যাকব, ক্রিস্টাফাস এবং আমার বাবা আর্নল্ড বৃদ্ধপিতার পাশে এসে দাঁড়ালেন। 'আমি আজ চলে যাচ্ছি। এই বংশের সমস্ত ভার তোমাদের হাতেই দিয়ে যাচ্ছি। আশাকরি লরেন্স বংশের মান-সম্মান-সম্পত্তি সবকিছুই তোমরা এক হয়ে দেখবে।' ঠাকুর্দা তাঁর কাছের চিন্তিত মুখগুলিকে বললেন—'ভাবনার কিছু নেই। গোলাবাড়িতে যে কফিনটা আছে আমার জন্য সেটাই যথেষ্ট। ওই ভাঙা বাকসের মধ্যেই নিশ্চিন্ত চিত্তে ঘুমোনো যাবে। সেই কফিনটা নিয়ে এস।' আমাকে অস্ফুট স্বরে অনুরোধ করলেন---'ভিকটর, তুমি যে একজন শিল্পী। আমার মৃত্যুর দৃশ্যটা তুলি আর রঙে ধরে রেখো। আত্মা শান্তি পাবে। তারপর আমার জন্মদিনে ছবিটার সামনে এসে তোমরা সকলে দাঁড়ালে আমি তোমাদের মাঝে ক্ষণেকের জন্য ফিরে আসার সুযোগ পাব।'

বড়ছেলে পিয়েটকে বললেন---'তোমার উপর আমার যথেষ্ট বিশ্বাস আছে। পরিবারের শান্তি রক্ষার ভার তোমাকেই দিয়ে গেলাম। ভ্যান কুবাসের পরিবারের সঙ্গে তোমাদের কোনো বিবাদের প্রয়োজন নেই। তোমাদের যখন প্রচুর জমি রয়েছে তখন একটুকরো মাঠের জন্য দাঙ্গা-হাঙ্গামা করাটা উচিত নয়। আমি ওই জমিটুকু কুবাসের ছেলেকেই দিয়ে যাচ্ছি। তোমাদের আপত্তি করা অন্যায়। আমি এবং কুবাস দুজনেই এই কাজের সুফল ভোগ করতে পারব। ঈশ্বর নিশ্চয়ই খুশী হবেন।' কুবাসের ছোটছেলে বার্নেস আমাদের ঘরের মধ্যেই দাঁড়িয়ে ছিল। তার প্রতি লক্ষ্য রেখেই দাদু বললেন—'পরপারে কুবাসের সঙ্গে দেখা হলে সে অবশ্যই আমাকে আলিঙ্গন করে অভিনন্দন জানাবে। আমাদের বন্ধুত্ব সুদৃঢ় এবং অক্ষয় হবে। শেষ কথাটা বলছি,

মন দিয়ে শোন, আমার নাতি শিল্পী ভিক্টর কুবাসের নাতনী লিজাকে ভালোবাসে। তোমরা ওদের বাধা দিও না। ওদের নতুন ঘর সাজাতে তোমরা সাহায্য ক'রো। আমি সুখী হব। ভিক্টর, তোমাদের জন্যে আমার আশীর্বাদ রইল।' কথাটা শেষ করে দাদু আমার দিকে তাকিয়ে একটু মৃদু হাসলেন। আমি লজ্জায় সকলের সামনে মাথা নিচু করে ছিলাম। আমাদের প্রেম তবে দাদুর চোখকে ফাঁকি দিতে পারেনি। তিনি সব জানেন।

জানালার দিকে মুখ ফিরিয়ে দাদু চিরদিনের জন্য তার সবকথা শেষ করলেন। দূরে পাহাড়ের বুকে তখন মুছে যাচ্ছে দিনের রাঙা আলোটুকু। রাতের অন্ধকারেই সেদিন দাদুকে একটা সাধারণ কফিনের ভিতরে রেখে স-সম্মানে কবর দেবার ব্যবস্থা করা হল। মাটির সন্তান মায়ের বুকে চির-কালের জন্য ঘুম চেয়ে নিল। সেই কনকনে ঠাণ্ডায় ভোরে বাড়ি ফিরে এসে সবাই শুনলাম—গতরাত্রে দাদার নাতনী রোজার একটি ছেলে হয়েছে। অর্থাৎ নাতির ঘরে পুতির আবির্ভাব ঘটেছে।

লেখক : এজেকিয়েল ম্ফাহ্লেলে

এজেকিয়েল ম্ফাহ্লেলে—জন্মেছেন দক্ষিণ আফ্রিকার ট্রান্সভাল রাজ্যে প্রিটোরিয়া শহরের এক বস্তিতে। তেরো বছর বয়স পর্যন্ত ইস্কুলে যাওয়ার সুযোগ হয়নি। বাল্যকাল কেটেছে মায়ের সঙ্গে কাজ করে। মাকে করতে হত সাহেবদের ধোবানীর কাজ—তিনতিনটি বাচ্চার মুখে দুমুঠো তুলে ধরবার জন্যে, সময়মতো ইস্কুলে পাঠাবার জন্যে। সবরকমের বাধা সত্ত্বেও এজেকিয়েল উচ্চবিদ্যালয়ে শিক্ষা সমাপ্ত করেন, এবং শিক্ষান্তে ইংরেজী ও আফ্রিকান ভাষার শিক্ষকরূপে নিযুক্ত হন। শিক্ষার দিকে আরো অগ্রসর হন এবং সসম্মানে ইংরেজীতে স্নাতক হন, এবং লাভ করেন স্নাতকোত্তর উপাধি দক্ষিণ আফ্রিকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। এরপর গবেষণা-গ্রন্থ রচনা করেন, বিষয়: দক্ষিণ আফ্রিকার কথাসাহিত্যে অ-শ্বেতাঙ্গ চরিত্র। নাইজেরিয়া রাজ্যের ইবাদান-বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজীর অধ্যাপক হন, এবং কেনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়েও। তারপর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কলোরাডো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক।

এজেকিয়েলের আত্মজীবনী 'ডাউন সেকেণ্ড এভেন্যু' (২ নং বীথিপথে নিচের দিকে)—ইংরেজীতে লণ্ডন থেকে প্রকাশিত হলে (১৯৬২ খৃষ্টাব্দে) সমালোচকদের উচ্চ প্রশংসা লাভ করে।

এজেকিয়েলের ছোটগল্প প্রধানতই তাঁর জীবনের নাইজেরিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকার বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে রূপায়িত। এই সংশ্লিষ্ট শ্রেষ্ঠগল্প সংগ্রহে নিয়েছি 'জীবন ও মৃত্যু' গল্পটি, এখানে আফ্রিকার অনেক শ্রেষ্ঠ লেখকদের মতোই লেখক তুলে ধরতে পেরেছেন শাদা ও কালোর জাতিগত বিপরীত ও বিরুদ্ধ জীবন-ধারা, এবং কালোমানুষের জীবনের বেদনার্ত রূপ এবং সহৃদয় সৌন্দর্য।

জীবন ও মৃত্যু

...স্টেফেল ভিসের রেগে আছে, রেগে আছে নিজেরি উপর—যেহেতু নিজেকে কেমন বোকা বোকা লাগছে। সবকিছুই ভুল হয়ে যাচ্ছে। আর তার সারাটা বিশ্ববিদ্যালয়-জীবনে সে যা শিক্ষা গ্রহণ করেছে তা হল শেষ পর্যন্তই সব-কিছু শেষ করা চাই নির্ভুল রকম।

স্টফেল বলছিল ডপ্‌পি ফৌরির কাছে—'হাঁ, সবটাই হল জ্যাকসনের দোষ। কাল সে চলে গেল, কিন্তু এখানে আমার খাবার তৈরী করার জন্যে এই সন্ধ্যাবেলায়ও এল না। এখন এই সকালবেলায়ও এখানে নেই—আর ঠিক সময়টিতে আমার খাওয়াটা হচ্ছে না, আমাকেই করতে হবে যে। আর তুমি জানো, রোজ সকাল সকাল আমার মোটারকম জলখাবার চাই-ই। গোদের উপর বিষফোড়া, আমার ঘড়িটাও বিগড়ে আছে—আমার সঙ্গে বেয়াদপি। আর এই সময়টাতেই কিনা আমাকে জাগিয়ে দেবার জন্যে হারামজাদা জ্যাকসনটা এখানে নেই। তাই ঘুম লাগিয়েছি বেহুঁস—আর যা হয় বুঝতেই পারছ, কাল রাতের ওই আড্ডার পরে। এখন শুক্রবার, সকাল পাঁচটা বাজে—আর এখনো কিনা হারামজাদাটার হদিশ নেই। সময় মতোই—এই সকালের কেপটাউন ট্রেন ছেড়ে দেবার আগেই কী করে এখন কাগজপত্তর তুলে দেই রেন্‌সের হাতে?

ফৌরি বলল—'স্টফেল, আমি ভাবছি কি—না ভেবে পারছি না—সব ব্যাপারটাই হল গুরুতর ধরণের। মন্ত্রীমশাই সময়মতো রিপোর্টটা পাবেন না —অধিবেশন শুরু হবার আগেই।'

'তা, জরুরী মেইলে পাঠালে এখনো সময় আছে।'

স্টফেলের মন ফিরে এল তার ঘরে—বিশেষ করে জ্যাকসনের দিকে। জ্যাকসনকে সে পছন্দই করে, তারই রাঁধুনে। এই চার বছর ধরে পোষা এক জানোয়ারের প্রভুভক্তি নিয়েই কাজ করে আসছে, আর জুগিয়ে দিচ্ছে তার এই অবিবাহিত জীবনের খেয়াল-খুশি ও খাওয়াদাওয়ায় সব রকমের সাহায্য। ফ্ল্যাটবাড়ীতে থাকে বলে জ্যাকসনকে করতে হয় না সাফসাফাইর কাজ, বাড়ী-ওয়ালার লোকই ও কাজ করে।

নিয়ম-মাফিকই বিষ্যুদবার বারটায় ছুটি নিয়েছিল জ্যাকসন। গেছে শ্যাঁট-শহরে। তার ছেলে দুটোকে নিয়ে, সেখানেই তার শাশুড়ী থাকে। ওখান থেকে ওদের নিয়ে চিড়িয়াখানায় যাবে। চিড়িয়াখানায় নিয়ে যাবে—বহুবারই বলেছে। জ্যাকসনের স্ত্রী কাজ করে আর এক শহরতলীতে। সে নিয়ে যেতে পারবে না, কারণ বাচ্চাদের জন্যে সেলাইফোঁড়াইয়ের কাজটা করে রাখতে হবে।

গোটা দিনটা ছুটি নেবার পরে জ্যাকসন প্রত্যাশা মতোই আসে, কিন্তু এল না এই দ্বিতীয়বার। প্রথমবারে পরের দিন সকালেই এল একবারে দীন প্রার্থনার প্রতিমূর্তি। স্টফেল তো বিস্মিত। এই নচ্ছার কাফ্রীটা গিয়েছিল কোথায়? কিন্তু জ্যাকসনের কত রকমের কত কী হতে পারে—সেই সব ভেবে সে নিজেকে সামলে রেখেছিল।

স্টফেলের মনটা ঘুরতে লাগল বহু চক্রের আকারে, কিন্তু খুঁজে পাচ্ছিল না নির্দিষ্ট কোনো কেন্দ্র। এইটা, ওইটা, সেইটা—তারপর সবটাই। তার

মাথার মধ্যে অবিরাম বাজতে লাগল সাম্প্রতিক সভা-সমিতিগুলির বিপন্ন কণ্ঠস্বর। তার মতো লোকের দ্বারা ক্রমান্বয়ে উত্তেজিত বাসিন্দাদের ক্রুদ্ধ কণ্ঠস্বর: প্রত্যেকের বাড়ী থেকে ভৃত্যসংখ্যা কমাতে হবে, কারণ তা নইলে কালা আদমীদের দিয়ে শহরতলীর সাহেবী খামারগুলো চালানো অসম্ভব—এ ধরণের বিরুদ্ধ কণ্ঠস্বর। অন্য ধরণের সভাসমিতি থেকে ক্রুদ্ধ কণ্ঠস্বর: চাকর-বাকরদেরই যদি দূরে সরিয়ে দেওয়া হয় তো সময়মতো তারাই বা কী করে কাজ করতে আসে, আর আমরাও আমাদের কাজে যাই? অন্য কণ্ঠস্বর: কে বলছে আমাদের ঘর-বাড়ীতে এত চাকর-বাকরের দরকার নেই? তারপর অন্য সবাই: যতগুলো পারি আমরা রাখবই তো।

আর, কণ্ঠস্বরগুলো ক্রমেই ক্ষিপ্ত হতে হতে শেষে ভেঙেই ফেলছে তার শান্ত-তৃপ্ত অবস্থাটা। কণ্ঠস্বরগুলোতে বিভিন্ন ভাষা, বিভিন্ন যুক্তি, কিংবা একই নীতির ভিত্তিতে নানারকমের আশ্বাস···

মূলীভূত যুক্তিগুলির মধ্যে স্টফেলের মন ঘুরপাক খাচ্ছে: তোমাদের জন্যে চরম নিষেধাজ্ঞা। আমরা নিষেধজ্ঞা ভাঙবই! আমরা পারি। তোমরা পারো না। কখনো করবে না। করবেই; কেন করবই? কেন করব না?

কাফরি দরদীদের মধ্যে কেউ কেউ তো বেজায় বিক্ষুব্ধ—আমরা যদি কালা আদমি ভৃত্যদেরকে তাদের বাসস্থানেই পাঠিয়ে দিই তো চাওয়ামাত্রই জমিদারী চালে যা-সব সুখ-সুবিধা পেয়ে যাচ্ছি তা থেকে বঞ্চিত হতে হবে না?—স্টফেল ভাবছে এসব।

আর এই কণ্ঠস্বরের মধ্যেই সে কাজ করে চলেছে—প্রাণান্তিক পরিশ্রমে আত্মরক্ষার জন্যে খাড়া করে রাখছে একটা ছকগড়া মনোভাব—এমন এক শ্রেণীগত মনোভাব যা প্রত্যেক্যের মধ্যেই কায়েম করে রাখে নানারকমের লোকদের: তার মা, বাবা, ভাই, বন্ধু, স্কুল-শিক্ষক, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, আর আরো যারা যারা তাকে আপন মনে করে থাকে···

তারপর তার অজান্তেই সমস্ত কণ্ঠস্বর মিলে হয়ে উঠল শতাব্দীর পর শতাব্দী থেকে সমবেত এক প্রতিধ্বনি: প্রতিধ্বনি কামানের বন্দুকের, পাথর ও বালুর উপরে ধাবন্ত মালগাড়ীর চাকার, ঘৃণার ও হিংসার। সব মিলে তার মনে হল তার রক্তের মধ্যেই সে খুঁজে ফিরছে ইতিহাসের এমনি এক ছিন্নসূত্র—যেখানে ভয়ঙ্কর এক অজ্ঞাতের সঙ্গেই বাঁধা আছে তার জীবন। নিজেকে সে সমর্পণ করে দিল সম্পূর্ণতই,—ঐ পাশবিক অতীত ইতিহাসেরই এক অংশ হয়ে থাকবার জন্যে। কারণ তা না হলে বর্তমানের পাশবিক প্রয়োজনে সে তো ভেঙেচুরে গুঁড়িয়ে যাবে—হারিয়ে ফেলবে তার আত্ম-পরিচয়। না, না, হে ভগবান! তা যেন না হয়। নিজের অগোচরেই যেন সে নিজের দেহটা ঘিরে ঘিরে পরতে পরতে

একটার পর একটা কুমীরের চামড়া—ভবিষ্যতে কোনোদিনই যেন আঘাতটা লাগতে না পারে।

—ভাবাচ্ছন্ন অবস্থাটা থেকে জেগে উঠতেই স্টফেন্স ভিসেরের মনে পড়ল জ্যাকসনের স্ত্রী থাকে গ্রিণসাইডের দিকে। তার কাছে তো জানতে চাওয়া হয়নি জ্যাকসন কোথায় আছে। একলাফে উঠেই ফোনের ডায়াল ঘোরাল। ভার্জিনিয়ার মনিবকে ডাকল—জানতে চাইল। না, ভার্জিনিয়া জানে না তার স্বামী কোথায় আছে। যতদূর জানে—তার স্বামী বলেছিল গত রবিবার সে বাচ্চাদের নিয়ে যাচ্ছে চিড়িয়াখানায়। তার স্বামীর তাহলে কী হয়েছে—জানতে চায়। স্টফেন্স নিজেই থানায় টেলিফোন করেননি কেন? এই সকালেই ভার্জিনিয়াকে ফোন করেননি কেন?—ভার্জিনিয়ার মনিব তাকেই জিজ্ঞেস করল এসব এবং আরো কিছু প্রশ্ন। তার বিরক্ত লাগছিল, কারণ ওর কোনোই উত্তর দিতে পারছিল না।

না, শহরতলীর কোনো থানায় বা মার্শাল স্কোয়ার স্টেশনে অভিযোগ-বহিতে জ্যাকসনের নাম নাই। তারা ঠিকই জানিয়ে দেবে—"যদি কিছু ঘটে থাকে।" এক থানা থেকে এক তরুণ কণ্ঠ বলল—'মনে হচ্ছে স্টফেন্সের "কাফিরটা" নিশ্চয়ই কোথাও ঘুমিয়ে আছে "কোনো মেয়েকে" নিয়ে, তাই কাজের কথা ভুলেই গেছে। কিংবা—মনে হয়—এখানেই কোথাও পড়ে আছে মদে চুর। "জানেনই তো কাফিররা কীরকম চীজ!" এবং সে হাসল এক রোগাটে ক্ষীণকণ্ঠের হাসি। স্টফেন্স সশব্দে রেখে দিল ফোনটা।

ফ্ল্যাটের দরজায় আস্তে আস্তে কে টোকা মারছে। একটা প্রত্যাশা নিয়ে দরজাটা খুলতেই দেখে এক আফ্রিকান দাঁড়িয়ে—হাতে টুপি।

'হ্যাঁ?'

'হ্যাঁ, বাবু।'

'কি চাও?'

'এটা এনেছি, বাবু।'—সাহেবের হাতে তুলে দেয় একখানা চিঠি। দিতে দিতে ভাবে: রেলওয়েতে যে সব সাহেব কাজ করে ঠিক তাদের একজনের মতোই···ভালোই হয়েছে আটকে এনেছি চিঠিটা···

'এটা কার? এই যে ঠিকানায় লেখা—জ্যাকসন সমীপে! কোথায় পেলে এটা?'

'সাফসাফাই করছিলাম রেললাইন, বাবু। কাগজপত্তর আর নোংরা সব তুলছিলাম রেললাইন থেকে, পার্ক স্টেশন-এ। কাজ করছি আর কী যেন ভাবছি। তখন তুললাম এটা। আমাকেই জিজ্ঞেস করছি—এটা ফেলে গেছে কে? কিন্তু···'

'ঠিক আছে, তোমার বাবুর কাছে নিয়ে যাওনি কেন ?'

'তারা চিঠিপত্র ফেলেই রাখে, বাবু। মাসের পর মাস, কেউই নিতে আসে না।'— গলার স্বরই বলে দেয় যে স্টফেল নিশ্চয়ই জানেন এসব।

কী সাহস, সাহেবদের কাজ করার পদ্ধতি নিয়ে কটু সমালোচনা করে।

'মিথ্যে কথা বলছ! ভিতরে কী আছে দেখবার জন্যেই প্রথমে তুমি খুলেছ। যখন দেখলে ভিতরে টাকা নেই, আবার বন্ধ করে রেখেছ,— ভয় পেয়েছ তোমার বাবু যদি জানতে পারে তুমি খুলেছিলে চিঠিটা। কি, সত্যি নয় ?'

'না, সত্যি নয়, বাবু। যাই ঘটুক না, আমি এখানেই আনব ভেবেছিলাম।

স্টফেলের হাতের চিঠিটার উপরে স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে রইল লোকটি— 'সত্যিই, ঈশ্বর জানেন, বাবু।'— ঐ লেবোনাটি বলল এবং এই ভেবে খুশি হল সত্যিটা জানবার যার পথ নেই, তার কাছে মিথ্যেটা বলতে পারছে ; আর এইসঙ্গে সে এটাও ভাবছিল ঃ কেউ যে সত্যটাই বলতে পারে—এরা এমনটা ভাবার মতোও ভদ্রলোক হয় না।

স্টফেলও ভাবছে—সাহেব দেখলে মিথ্যে কথা বলবেই। ওদেরও যে সাহস আছে দেখাবার জন্যেই।

লেবোনা যতই ভাবছে সে ঠিকঠিক কর্তব্য করে যাচ্ছে, সাহেব ততই বিরত।

'কোথায় থাকো ?'

'কেনসিংটনে, বাবু। সেখানেই যাব এখন। আমার স্ত্রী সেখানেই কাজ করে।'

এ্যাঁ, আবার ঐ ওদেরই আর একজন ? বাড়ী যাচ্ছে কিনা সাহেবদের অঞ্চলে ? এবারে এটা ঠিক বন্ধ করতে হবে—দেখো না লোকটার মুখের আত্মতৃপ্ত ভাবখানা।

'ঠিক আছে, চলে যাও।'

সব সময়টাই ওই দুজনে দাঁড়িয়ে ছিল দোরগোড়ায়। স্টফেল কালা আদমীটার গা থেকে গন্ধ পাচ্ছিল ঘামের কী বিশ্রী গন্ধ—যদিও লোকটা দাঁড়িয়ে ছিল দরজার বাইরেই।

লেবোনা যাবার উপক্রম করল, আর তখনি যেন কী একটা মনে করল। সাহেবটি আর কোনো কথা বলবার আগেই সে বর্ণনা শুরু করল—আসলে সময় নিচ্ছে, আর বলার আবেগে একেবারে টগবগ করছে।

'বাবু, আমার বুকে খুবি বেজেছে ব্যাপারটা। গরীব বেচারা, ট্রেন থেকে নেমে আসছিল। প্লাটফর্ম থেকে তো একটা মাত্র সিঁড়ির ব্যবস্থা। আর আমি নিজের মনেই ভাবছি—তা, একজনে উঠবে কী করে, আর একজন যখন

নামছে? জানেন তো বাবু, এখন হয়েছে লোহার গেট, একজন মাত্রই যেতে কি আসতে পারে একই সময়ে। তা, তখনি ওপারে অরল্যাণ্ডো যাবার ট্রেনটা ছাড়ছে।'

এসব শুনে আমার হবেটা কী? লোকটা ভেবেছে কি? এটা কি অভিযোগ শোনার দপ্তর নাকি?

'তা শুনুন এবার, ব্যাপারটা ঠিক এই রকম: বড় একটা ভিড় উঠছে উপরের দিকে, আরো একটা বড় ভিড় ছুটে যাচ্ছে ট্রেন ধরতে। আমি তো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছি আর শিস পাড়ছি, আর নিজেকেই বলছি—দুটো উল্টোদিবেই কী করে যাবে লোকজন? ঠিক একটা স্রোত যাচ্ছে কিনা দুই-দিকেই—এ ওর বিরুদ্ধে!'

যেসব কাফির নিজেদের ভাবে খুবি চালাক—এ হ'ল হ্যাঁ, তাদেরই একজন।

'লোকটা—আমি দেখছি উপরে উঠছে। তারপরেই দেখছি উঁচু দিকের সিঁড়ির লোকগুলো তাকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিচ্ছে নিচে। তারা জোরসে নামতে নামতে পা দিয়ে দলে যাচ্ছে, লাথি মেরে হটিয়ে দিচ্ছে। লোকটা গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ে গেল প্ল্যাটফর্মের উপর। নাক মুখ দিয়ে রক্ত পড়ছে বৃষ্টির মতো, আর আমি নিজেকেই বলছি তখন—ও হো, লোকটা মরে গেল, আহা বেচারা।'

লোকটা চাইছে কি, আমি এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এমন একটা লোকের গপ্প শুনে যাব যার কথা শোনা-কি-না-শোনা আমার পক্ষে একই কথা।···

'গরীব বেচারা মারা গেল। এই মারা গেল আর কি—ঠিক এই আমিই এখনি যেন সিঁড়ি দিয়ে নেমে যাচ্ছি, আর আপনি শুনছেন কি আমি মরে গেছি।'

বড় তো আসে যায় আমার······'

'এখানে ট্রামে আসতে আসতে ভাবছি এটা তারি চিঠি।'

'হ্যাঁ, ঠিক আছে—আমি দেখছি সব।'

লেবোনা ফিরে চলল স্থির সতর্ক পায়ে, কিন্তু দৃঢ় পদক্ষেপে। খুবি স্বস্তি পেল স্টফেল।

সঙ্গেসঙ্গেই সে ফোন করল হাসপাতালে ও শবাধার-ভবনে, কিন্তু কোথাও কোনো হদিশ নেই জ্যাকসনের। চিঠিটা পড়বে, কি পড়বে না? ওতে একটা সূত্র খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। না, সে কাফির নয়।

দরজায় আবার শব্দ।

জ্যাকসনের স্ত্রী, ভার্জিনিয়া। দাঁড়িয়ে আছে—কয়েক মিনিট আগেই সেখানে দাঁড়িয়ে ছিল লেবোনা।

'ও এখানো আসেনি এখানে, বাবু?'

'না।'—স্টফেল স্বতই বসবার জন্যে দেখিয়ে দেয় রান্নাঘরের চেয়ারটা—'কোথায় গেল?'

'জানি না, বাবু।'—এবার সে কাঁদতে লাগল আস্তে আস্তে আর বলতে লাগল—'রববারে আমরা একসঙ্গেই ছিলাম, বাবু। আমার বাবুর ওখানেই। আমাদের বাচ্চাকাচ্চাদের কথাই বলছিলাম, জানলেন বাবু, একটার সাত, আর একটার চার বছর কয়েক মাস। আর, প্রথম সন্তানটি ঠিক ওর বাবার মতো, একইরকম নাক-চোখ, আর তাদের খেলার সাথীরা সবসময়েই বলে ওদের চিড়িয়াখানার কথা, ওরাও যেতে চায়, তাই জ্যাকসন কথা দিয়েছে ওদের নিয়ে জন্তুজানোয়ারগুলো দেখাবে।' ভার্জিনিয়া এবার থামল, কাঁদতে লাগল ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে,—যেন একটানা কথার মাঝখানে কিছুটা ছেদ টানার জন্যই।

'আর, ছোট ছেলেটা তার বাবাকে কী যে ভালোবাসে, সেটাই তো জ্যাকসনের নেওটা। জানলেন বাবু, ওই নকাটি—বড়টা সেদিন তার বাবা-কেই বলছিল—সেদিনই তো ওদের ঠাকুমা ওদের নিয়ে এসেছিল আমাদের সঙ্গে দেখা করাতে—বলছিল—তুমি মরো না কেন? কারণ বাবা তাকে আরো লজেন্সস দেয়নি কেন? হা ভগবান, ও যে আমাদের পরিবারে মাথাভাঙা ছেলে হবে, দরকার এখন শক্তহাতে ওকে সোজা রাখা। আর জ্যাকসন এখন ··এখন···এখন হায় ভগবান, হা প্রভু!'

এখন সে কাঁদছে অবাধ কান্না।

'ঠিক আছে। আমি জোর চেষ্টা চালিয়ে যাব ওকে খুঁজে বার করব—যেখানেই থাকুক না। এখন তুমি চলে যাও, এখনি তালাবন্ধ করতে হবে।'

'নমস্কার, বাবু!'—চলে গেল ভার্জিনিয়া।

স্টফেল নেমে এল রাস্তায়, তার গাড়ীতে উঠে এগিয়ে চলল কাছাকাছি থানায়—পাঁচ মাইল দূরে। তার জীবনে এই প্রথম সে একজন কালা আদমীর জন্যেই নিজের ফ্ল্যাট ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল, যেহেতু লোকটা তার কাছে অনেকিছু—অন্তত ভৃত্য হিসাবে।

ভার্জিনিয়ার সকরুণ দৃষ্টি; তার জড়ানো প্যাঁচানো একটানা কথা বলা; কৃত্রিমতা-বর্জিত স্বামী-অনুরক্ত ভার্জিনিয়া; রেলওয়ের মজুরটি এবং তার তুমি-শোনো-কি-না-শোনো কিছুই আসে যায় না—এমন বেপরোয়া ধরণের কথা; যে দুটো ছেলে পিতৃহীন হল তাদের ছবি; স্টেশনের সিঁড়ি দিয়ে গড়িয়ে-পড়া মৃত লোকটির দৃশ্য, আর যাকে চেনে-না জানে-না এমন এক লোক সম্পর্কে তার প্রাণ ঢেলে দেওয়া···

এই সবকিছুই ঘুরতে ঘুরতে ঘুরতে ঘুরতে পরিণত হল এক জটিল

প্রশ্নচিত্তে। যে ধারার চিন্তায় সে অভ্যস্ত তা হ'ল বিসদৃশ, বিপরীত, বিরুদ্ধ, এবং স্থির সিদ্ধান্ত-সম্মত। কালা কালাই, শাদা শাদাই—এবং এটাই একমাত্র কথা। কাজেই তার অন্তরের কোনো স্থান থেকে যেসব প্রশ্ন উঠে আসছে তার সদুত্তর সে এই মুহূর্তে দিতে পারছে না। ছোট ছোট প্রশ্ন দাঁড়াচ্ছে এসে সরাসরি। তীক্ষ্ম কিছু প্রশ্ন ছুটে আসছে তীরের মতো—উল্কার মতো, কখনো কখনো বা আস্তে আস্তে উদিত হচ্ছে শীতের সূর্যের মতো। এসব ঠেকিয়ে রাখতে হবেই। এবং গৃহীত সিদ্ধান্তের মতোই এদের তুলে ধ'রে—সেখানেই স্থাপন করে যেতে হবে লোকজনকে।

থানার তার বন্ধুটি তাকে সাহায্য করবে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।

চিঠিটা! জ্যাকসনের স্ত্রীকেই কেন দিয়ে দিল না? যেদিক থেকেই হক, তার স্বামীর যা অধিকার সেই অধিকার তো তারো।

তারপর খামটা খুলে দেখবার লোভটা সামলাতে পারল না; যেদিক থেকেই হক, ও থেকে একটা সূত্র পাওয়া যেতে পারে। সাবধানে ঢাকনাটা ছিঁড়ল। সুন্দর সুন্দর ফোটো: একটাতে একজন পুরুষ ও একটি মেয়েছেলে, আর একটাতে দুটি ছেলে—স্পষ্টতই ওদের। সবটাই জ্যাকসনের ঠিকই।

ভিতরের চিঠিটা জ্যাকসনকেই লেখা। স্টফেল পড়তে লাগল। এসেছে ভেন্ডাল্যান্ডের কোনো জায়গা থেকে, জ্যাকসনের বাবার কাছ থেকে। খুবি পীড়িত সে, আর বেশীদিন বাঁচবে মনে হয় না। জ্যাকসন কি একবার তাড়াতাড়ি করেই আসতে পারছে না, কারণ সরকারী লোকেরা বলছে তার গোধনের কিছুটা সরিয়ে না ফেললে জমিজমা নষ্ট হচ্ছে। জ্যাকসন তাড়াতাড়ি এসে ব্যাপারটার একটা ফয়সালা করুক—সে এখন বৃদ্ধ এবং শক্তিহীন! সরকারকে এটুকুমাত্রই সে বলতে পারে যে লোকজন যা চাইছে তা হল আরো জমি—আরো কম গরু-বাছুর নয়। সে শুনেছে শ্বেতাঙ্গেরা মানুষের জন্ম নিরোধ করতে কিছু-কিছু জিনিষ ব্যবহার করে থাকে, তা শ্বেতাঙ্গেরা যদি অমনটাই ভেবে থাকে, তবে তারা তাদের গরু ছাগল, গাধাদের বেলায়ও তা করুক না,—একদিন গাধার পেটেই গরু জন্মাক না। কিন্তু হা ভগবান, সে তো কেবল ভগবানের কাছেই প্রার্থনা জানাতে পারে—তার পোষা প্রাণীর পাল যেন দিনে দিনে ছোট না হয়ে যায়। জ্যাকসনকে অবিলম্বে আসতেই হবে। তার প্রাণের প্রিয় ফোটোগুলি পাঠিয়ে দেওয়া হল—ওসব যেন সযত্নে থাকে, কারণ যে কোনো সময়েই সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে পারে। স্বর্ণ-শহরে যাচ্ছে এমন কারো হাত দিয়েই চিঠিটা পাঠানো হল। শেষাংশে লেখা আছে:

... প্রার্থনা করি, ঈশ্বর সবাইকে সুখে রাখুন—আমার ছেলেকে, আমার

বৌমাকে, আমার নাতিদের। আমি শান্তিতেই মরতে পারব, কারণ আমার নাতিদের আমি হাঁটুর উপরে বসিয়ে আদর করার মতো স্বর্গীয় সুখ পেয়েছি।

—সবটাই বিশ্রী হাতের লেখা, কোনো দাড়িকমাও নাই। কেমন বিচলিত হাতেই খামের মধ্যে চিঠিটা রাখল স্টফেল।

সোমবার দুপুরের খাবার সময় স্টফেল মোটরে ফিরে এসেছে তার ফ্ল্যাটে —সব ঠিকঠাক আছে কিনা তাই দেখতে। জ্যাকসনকে দেখতে পেল শুয়ে আছে বিছানায় তার ঘরে। মুখখানা ফুলে উঠেছে—সারাটা মাথা এবং দুইগাল পরিষ্কার কাপড়ে ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা। চারপাশের ফুলে-ওঠা মাংসের মধ্য থেকে দেখা যাচ্ছে দুটি উজ্জ্বল চোখ।

'জ্যাকসন।'

স্টফেলের ভৃত্যটি তাকাল।

'কি হয়েছিল ?'

'পুলিশ।'

'কোথায় ?'

'ভেক্টোরিয়া পুলিশ স্টেশনে।'

'কেন ?'

'ওরা আমাকে বলেছিল— হনুমান।'

'কে ?'

'ট্রেণে এক সাহেব।'

'আমাকে সবটাই বলো, জ্যাকসন।'—স্টফেলের মনে হ'ল জ্যাকসন তার বিরুদ্ধে দাঁড়াচ্ছে। জ্যাকসন উঠে বসতে তার কাঁধের ঝুঁকে-পড়া ভাবটিতে তার সমস্ত দেহের ভঙ্গীতে সে স্পষ্টই দেখতে পেল তিক্ততার পরিচয়।

'আপনি ভাবছেন আমি মিথ্যে কথা বলছি, বাবু ? কালা আদমীরা সব সময়েই মিথ্যা কথা বলে, না ?'

'না, জ্যাকসন। তুমি সব কথা বললে তবেই তো আমি সাহায্য করতে পারি।'—যেভাবেই হ'ক সাহেবটি ধৈর্য রক্ষা করতে পারছে।

'বাচ্চাদের চিড়িয়াখানায় নিয়ে যাচ্ছি। ফিরতি পথে আমি আমার রাতের পড়ার বই পড়ছি। এক সাহেব ট্রেণে উঠল, প্রত্যেকের জিনিষপত্র খুঁজে খুঁজে দেখতে লাগল। আমাকে বই পড়তে দেখেই বলে উঠল—এই হনুমানটা বই নিয়ে কী করছে। আমাকে উঠে দাঁড়াতে বলল। এমনভাবে চেঁচিয়ে বলল যেন কোনো মানুষের সঙ্গে কথা বলল এই প্রথম। বাবুনেরা মানুষ দেখলে ঐরকমই করে থাকে। আমি গরম হয়ে উঠলাম—রক্ত টগবগ করছে—তার

আমার কলার ও টাই ধরে বেশ করে ঝাঁকুনি মারলাম। ফলের ভারে নুয়ে পড়া 'মারুলা' গাছ দেখেছেন তো? ঝাঁকুনিটা মারলাম ঠিক ওইরকমই। অন্যসব সাহেবরা আমাকে দাঁড় করিয়ে দিল—ছোট্ট একটা ঘরে। প্রত্যেকেই জোর মেরে চলল ঘায়ের উপর ঘা—একের পর এক। স্টেশনে এসে আমাকে ঠেলে ফেলে দিল প্ল্যাটফর্মে। হাঁটুতে ঠোক্কা দিয়ে পড়ে গেলাম। আমাকে তুলে নিয়ে এল পুলিশ স্টেশনে। না, শহরে নয়, অনেক অনেক দূরে—ঠিক জানি না কোথায়। কিন্তু বুঝলাম সেটা ভিক্টোরিয়া স্টেশন। আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ: আমি মাতাল হয়ে সোরগোল করছিলাম। দশ টাকা দিতে পারবে? আমি বললাম—না। আমি বললাম—আপনাকে বাবু ফোন করে জানাতে। তারা বলল—বেশী সাহস দেখাতে চাস তো মেরে ভাগাড়েই ফেলে দেব। আর সঙ্গে সঙ্গেই আবার শুরু করল বেদম মার ও লাথি। আমাকে ছেড়ে দিতে—মাইলের পর মাইল হেঁটে উঠলাম এসে হাসপাতালে। খুবি যন্ত্রণা হচ্ছে।'—মাথাটা নিচু করে জ্যাকসন থামল।

কিছুক্ষণ পরে মাথা তুলে বলল—'আমার বাবার পাঠানো চিঠিটা হারিয়ে গেছে। ওর সঙ্গেই ছিল আমার সুন্দর সুন্দর ছবি।'

প্রত্যেকটি শব্দেই স্টফেলের কাছে ধরা দিচ্ছিল ওর যন্ত্রণা—ওর হাতের প্রতিটি ভঙ্গীতেও। ওই জাতের গল্প তো সে কতবার পত্রিকায় পড়েছে, ওসব ভাববার মতোই মনে হয়নি আর কখনো।

জ্যাকসনকে সে বিছানায়ই শুয়ে থাকতে বলল, এবং চার বছরের মধ্যে এই প্রথমবারই ডাক্তার ডাকল ওকে পরীক্ষা করে চিকিৎসার জন্যে। আগে পাঠিয়ে দিয়েছে কিংবা নিজেই নিয়ে গেছে—হাসপাতালে।

চার চারটি বছর তার সঙ্গেই রয়েছে একটি চাকর, কিন্তু তার প্রসঙ্গে এটুকু মাত্রই জানে—ওর শাশুড়ীর সঙ্গেই থাকে ওর ছেলে দুটো এবং স্ত্রী। এবং সেটাও একান্ত দূরবর্তী এক আবছা ছবি—কেবলমাত্র কয়েকটা নামেরই কয়েকজন মানুষ, রক্তমাংসের কিছু নয়, হৃদয় ও মনের নয়।

আর, তার ভিতর থেকে উদ্গীত এক লজ্জার আর্তনাদকে রুদ্ধ করার জন্য—চতুর্দিকে গড়ে তোলা আত্মরক্ষামূলক লৌহ-প্রাচীরের উপরেই ঝাঁপিয়ে-পড়া সাম্প্রতিক সব ঘটনার স্মৃতিকে রুদ্ধ করবার জন্য—প্রবল ক্রোধ ফুঁসে উঠতে লাগল তার বুকের মধ্যে। কতকগুলি ব্যাপার আছে যা সে মনে করতেই চায় না। কিন্তু এবার তার ক্রোধের আগুন জ্বালিয়ে তুলল ওসব। তাহ'লে? না, না, জানে না সে···

আর তারপর স্টফেলের মনে হয়, সে চিন্তা করতে চায় না, অনুভব

করতেও চায় না। করতে চায় কিছু একটা···জ্যাকসনকে ছাড়িয়ে দেব? না। তাকে বরং দেখা যাক একটা নাম হিসাবেই—মানুষ হিসাবে নয়। একটা যন্ত্রের মতোই তার জন্যে কাজ করে যাক জ্যাকসন। আর, সে নিজে করে যাক তার নিজের যা কর্তব্য—এবং প্রথম জরুরী কর্তব্য হল কমিশনের রিপোর্টটা এখনি পাঠিয়ে দেওয়া। ওটা করতেই হবে—অন্যটা না হলেও। শ্বেতাঙ্গ সে—সাহেব। দায়িত্বশীল তাকে হতেই হবে। শ্বেতাঙ্গ হওয়াটা তার দায়িত্বশীল হওয়াটা একেবারেই এক এবং অভিন্ন···

লেখক : আবুল ঈদ দৌ দৌ

একাধারে এই লেখক হলেন উপন্যাসিক ছোটগল্পকার এবং নাট্যকার, অর্থাৎ এটা হল তাঁর সাহিত্য-কৃতির পরিচয়, আর পেশাগত দিক থেকে ইনি আলজেরিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে তুলনামূলক সাহিত্যের অধ্যাপক, এবং ডক্টরেট উপাধিতে সম্মানিত। বিদেশে অষ্ট্রিয়ার ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতাদানের জন্য আমন্ত্রিতও হয়েছেন। সাহিত্য-প্রীতির পরিচয়ে আরো উল্লেখ্য ইনি জার্মান ও আরবী ভাষায় অভিজ্ঞ এবং জার্মান থেকে আরবী ভাষায় বেশ কয়েকটি গ্রন্থ অনুবাদও করেছেন।

সংশ্লিষ্ট গল্পটি আলজেরিয়ার ছোটগল্প সাহিত্যের একটি নমুনা, 'লোটাস' পত্রিকায় অনুবাদিত এই গল্পটির নাম 'দি সিলভার রোড'।

পথের আলো

রাত্রি

রাত্রে বিছানায় শুয়ে আছে—ঘুম আসছে না। চার দিকটা দেখছে তাকিয়ে। ঘরটাতে বাসা বেঁধেছে নিস্তব্ধ রাত। হাতখানা বাড়িয়ে দেখছে—যে জায়গায় তার স্বামী শোয়। না, এখনো সে হোটেল থেকে ফেরেনি। প্রতিদিনের মতোই আজো যে দরজাটা খুলে দেয়নি—সেটাও মনে নেই; তাই তো হাত বাড়িয়ে ওকে খুঁজছিল! একবার হাই তুলল। দীর্ঘশ্বাস ফেলল। হ্যাঁ, কেবল কাজ আর কাজ, সব কাজ তাকেই করতে হয়—সব কাজই। জ্বালানী কাঠ জোগাড় করা, ঠিক জায়গাটিতে গিয়ে জল আনা, মাঝে মাঝেই দূরে কাজ করতে যাওয়া—এবং এই কাজের মজুরী হিসাবেই জোগাড় করতে পারে কিছুটা গম কি আটা, এবং খাওয়াতে পারে তার পাঁচ-পাঁচটা ছেলেমেয়েকে, এবং তার উপরে তার স্বামীকেও।

বিছানায় উঠে বসল, গালে হাত···কি ধরণের স্বামী আমার, কি ধরণেরই বা লোক? হোটেলই বরং তার ঘরবাড়ী—সেখানেই তো কাটায় সারাটা দিন এবং প্রায় রাতও। মাঝখানেই কেবল বাড়ী আসে খাবার খেতে, ওখানেই যদি ঘুম পড়ে না থাকে তো এখানেই আসে ঘুমোতে! ওখানেই বসে থাকে তো বসেই থাকে, কেবল ক্ষিদের জ্বালায়ই বাড়ীমুখো হয়। যে খাবার কখনোই জোগাড়-

করে না সেই খাবারই কেমন করে খেতে পারে লোকটা, খেতে বসে নিজেকে অপরাধী মনে হয় না? কখনোই ওকে দিনের বেলায় বাড়ীতে দেখেছে মনে পড়ছে না। ওকে ভুলেই থাকতে চায়, কিন্তু রাতের বেলা সে সারাটা জীবন জুড়ে থাকে। স্বপ্নে দেখে—সে ফিরে এসেছে।

তীব্র একটা যন্ত্রণায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল…এমনটাই তার স্বামী… যে করেই হক না তার পাঁচটি সন্তানের বাবা! ওর উপরে সে যে খুব খারাপ হয়ে উঠেছে সেটা তো সত্যিই—নিষ্ঠুর কথায় ভর্ৎসনা করেছে। এবারে এতটা করার মতো সাহসটা তার কি করে হ'ল, ভেবেই পাচ্ছে না। ক্রোধে সে ফেটে পড়েছিল—এটুকুমাত্রই মনে করতে পারছে। ও ঘরে ফিরে এসেছিল, খেতে বসার আগেই তাকে বলেছিল—

'আমার খাবারটা কোথায়?'

দরজার দিকে হঠাৎই যেন তাকিয়ে বলে ফেলেছিলাম—

'তোমার খাবার তো হোটেলে।'

দাঁড়িয়ে গেল পাথরের মতো, ক্রুদ্ধ দৃষ্টি হেনে বলে উঠেছিল—

'জানতে চাইছি…আমার খাবারটা কোথায়?'

তেলেবেগুনে জ্বলে উঠে জানিয়ে দিয়েছিলাম—'বলেই তো দিয়েছি… তোমার খাবারটা হোটেলে।'

কথার বেপরোয়া ধরণটা সহ্য করতে পারল না। হাতটা টেনে ধরেই এমন এক দারুন চড় মারল যে পাক খেতে খেতে মেঝেতেই পড়ে যাচ্ছিলাম। চোখের জল ফেলতে ফেলতেই চেঁচাতে চেঁচাতে বলছিলাম—

'মারো না, মারো আমাকে, মেরে ফেলো। তোমার সঙ্গে থাকা না বিষ খাওয়া। আমি আর পারছি না। তুমি আমার উপরে ভার চাপিয়েছে—পাঁচ-পাঁচটা সন্তানের, সমস্ত দুর্ভাবনাই আমার। আর তার উপরেও কিনা বইতে হবে তোমার বোঝা!'

মেঝেতে বসে পড়ে বলেই চলেছিল—'সব পুরুষেরাই মাঠে গিয়ে কাজ করে! তোমার ক্লান্তি ধরে না হোটেলে ব'সে ব'সে…ওখানেই পড়ে থাকো না কেন, কেন আমাকে মুখ দেখাও, কেন? যে বাবা খাবার জোটাতে পারে না তেমন বাবার মুখও দেখতে চায় না সন্তানেরা।'

কাপড়ের খুঁট দিয়ে চোখের জল নাকের জল মুছল, বলতেই থাকল—

'মাথার ঘাম পায়ে ফেলে যা ঘরে আনি বাচ্চারা খেয়ে ফেলে। তবু ক্ষিদে মেটে না, খালি পেটে ঘুমোয়। এই কুঁড়েতে সকলেই ক্ষিদের জ্বালায় জ্বলে।'

মাথাটা তুলে এবার তাকায় মুখোমুখী—'এই তো দশা আমার…কেন? পুরুষ মানুষের সঙ্গে তো বিয়ে হয়নি আমার।'

তখন সে আবার তাকে তার এক দফা মার দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল তাড়াতাড়ি—যেন মুক্তি পেল···তার কবল থেকে।

সে যেমন রেগে গিয়েছিল তেমনি অবাক হয়ে গিয়েছিল,—কী করে তার স্ত্রীর এমন সাহস হল···তারি মেয়েছেলেটার। সে চলে গেলে কিছুটা হাল্‌কা লাগল। তার মনের দুঃখটা প্রকাশ করতে পেরেছে—বুকের তলায় যে কথা-গুলো তার ধৈর্যের বাঁধে বন্দী ছিল তাদের মুক্তি দিতে পেরেছে। হয়ত সে একটু বেশী কড়াই হয়ে উঠেছিল —বিশেষ করে তাকে পুরুষ বলেই স্বীকার না করার জন্যে। কিন্তু এরকটা করা ছাড়া আর কী করার ছিল তার? না, এই নিষ্ঠুর-কঠিন ভূমিকাটা গ্রহণ করার জন্য কোনোই আপশোস হচ্ছে না। তার উপরে পাঁচ-পাঁচটা শিশুকে খাওয়ানোর ভার দেওয়াটা কি আরো নিষ্ঠুরতা নয়?

অস্ফুট স্বরেই সে বলছিল—'হায় ভগবান···'

বাবা মার কাছে অভিযোগ করতে ইচ্ছে হয় তার—তারাই তো জোরাজুরি করে বিয়ে দিয়েছে তাকে, শক্ত সমর্থ জীবনটা তুলে দিয়েছে কিনা একটা আলসে লোকের হাতে, —তার জীবনটা বলি দিয়েছে কিনা মরণের কাছে।

রাত্রি শেষ হচ্ছে

আবার ঘুমানোর চেষ্টা করা বৃথা। উঠে মুখ ধুয়ে নিল। তার পিছন দিকে মনে হয়—দীর্ঘ এক চলার পথ। এখন যে রাত কতটা জানে না। অনেকটা পথই চলতে হবে। যদিও খুব বেশী দূরে নয়, তবে খুবি কষ্টকর পথ।···কথা দিয়েছে এক মেয়েছেলেকে, রাতে তার কাছে গিয়ে জলপাই তেল পিষে দলা পাকাবে। এই কাজের জন্য কিছু জলপাই তেল পাবে, সঙ্গে এমনকি এতটা ফিরতি পথের জন্যে একটা রুটিও। এসব সে এনে দিতে পারবে তার শিশুদের।

আবারো বিছানায় ফিরে এল, বড় ছেলেটার কাঁধ ধরে নাড়া দিতে দিতে আলগোছে বলল—'রাবে, ওঠ্‌ রাবে, ওঠ্‌।'

ছেলেটা উঠে বসল, চোখ রগড়াতে লাগল। সে তো জানে কেন তাকে জাগিয়ে তোলা হল, এবং কী করতে হবে। এ ব্যাপারে তার আগের অভিজ্ঞতা আছে। আর, মা ভাবছে এখনো তো তার স্বামীটি ফেরেনি। কেমন করে তবে তার অন্য চারটি শিশুকে সে একা ফেলে রেখে যাবে? কুঁড়ে ঘরটার দরজাটা খুলে দেখল ভোরের আলোর ইশারাটা চোখে পড়ে কিনা। তার বদলে দেখল একজন লোকের চেহারা—চারদিকের শূন্যতার

মাঝখানে। জানতেও চায় না কে সে। দেখামাত্রই চিনেছে। ওর স্বামী দাঁড়িয়েই আছে, নড়ছে না। ও ছেলেটার হাত ধরে এগোতে লাগল। সামনের আঙিনাটা পার হতেই একটা সরু পথ। দুপাশে ফণীমনসার ঝাড়। ছেলেটাকে হাত দিয়ে গায়ের কাছে টেনে নিল। ছেলেটি ঘাড় ফিরিয়ে দেখছিল আর বাবাকে। এববার দাঁড়িয়ে পড়ল—ওর বাবাও এগিয়ে আসছে বিনা দেখবার জন্যে। মা ওকে এক জোরটান মেরে ঘনিয়ে আনল—'আয়, আমার সঙ্গে সঙ্গে চল্।'

পাশে এসে গেলে মা জানতে চায়—'তোর ভয় করছে?'

'না। ভয় করছে না।'

'তাহলে কি হয়েছে?'

'বাবা তোমার সঙ্গে আসছে না কেন?'

'ঘরটা দেখবে কে?'

'চুরি যাবে এমন তো কিছুই নাই আমাদের।'

'তোর ভাইবোনদের দেখবার জন্যে।'

'ওদের কিছুই হবে না।'

'কে বলতে পারে।'

'আমি তো ওদের সঙ্গে থাকতে পারতাম।'

ওর জবাব শুনে মা কেমন বিরক্ত বোধ করে, বলে—'ওর যা খুশি তাই করে।'

চলতে থাকে নিঃশব্দে, ছেলেটি জড়িয়ে ধরে মায়ের হাত। মা নিজের হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে রাখে তার ছেলের কাঁধের উপর। এতে বোধ হয় কিছুটা বলভরসা পায়। একটা গিরিখাদ পার হয়ে আর একটা গিরিখাদের দিকে। বিচ ও এল্‌ম গাছের ছায়ারা যেই ওর মাকে ঘিরে ধরল, ছেলেটা জিজ্ঞেস করে আবার—'বাবা কাজ করে না কেন?'

'কাজ পায় না।'—মায়ের মনে হয় ছেলেটার সামনে তার বাবার পক্ষেই একটা অজুহাত খাড়া করা দরকার। তাই কথাটার উপর জোর দিতে চাইছিল আবারো, কিন্তু ছেলেটি বলে উঠল—'পড়শী আর সবাই তো মাঠে কাজ করতে পায়?'

এর জবাব দিতে পারছে না—মনে মনে দেখতে থাকে তার স্বামীর হাত দুখানা। কাজ করতে ইচ্ছে থাকলে নিশ্চয়ই পেয়ে যেত কাজ। ছেলেটি মায়ের গা ঘেষে বলে—'মা, আমি বড় হলে কাজ করব, তোমাকে সাহায্য করব।'

ছেলেকে কোলের কাছে টেনে আনে মা, কাঁদতে থাকে। সব ভাবভাবনা

ফিরে গেছে স্বামীর কাছে। হোটেলে গিয়ে না ঘুমোলে এখন বোধ হয় শুয়ে আছে। না, ঘুমোতে পারবে না, তার কথাগুলো তোলপাড় করতে থাকবে। শিগগিরি ভুলতে পারবে না। স্ত্রী হয়ে তার মনপ্রাণকে ও বিবেককে যেভাবে বিঁধতে পেরেছে তাতে মনে হয় এত তিক্ততা ও বিক্ষোভের পরে তার বিবেক জেগে উঠবে। নিশ্চয়ই সে এখন তার কথাগুলোই ভাবছে—প্রত্যেকটি কথা ভাবছে। তাদের বিবাহিত জীবনে এই প্রথমবারেই সে অমন কথা শুনল। বাড়ী ফিরে গেলে আবারো সে মারতে পারে, কিন্তু আর কখনো তাকে সে ভয় করবে না। পারে তো যুক্তিমতো কথা নিয়েই তার সামনে দাঁড়াবে। তার পর সে যা খুশি করুক না। হয়ত সেই শুরু করবে নতুন জীবন—দৃষ্টি দেবে বাচ্চাদের দিকে, স্ত্রীর প্রয়োজনের দিকে। তার পর আবার হয়ত অলস হয়ে পড়বে, ব্যর্থ করে দেবে তার ভালো কথাগুলো, সমস্ত আশাভরসা।

চাঁদ

যেখানে কবর সেদিকেই ওরা এগোতে লাগল। জলপাই বনের মধ্য দিয়ে ঘুরে গেছে পথ, হঠাৎ নেমে গিয়েই উঠে গেছে আবার। নিস্তব্ধতা এত গভীর যে ভয় ভয় করছিল। পাহাড়টা পার হতে চারদিক থেকে জড়িয়ে ধরল জ্যোৎস্না। যেখানটায় জলপাই গাছগুলি থেমে গিয়ে স্পষ্ট তাকিয়ে আছে স্বর্গের দিকে, সেখানে এসে পড়তেই উপর দিকে তাকাল ছেলেটি। বলে উঠল—'মা, মা! চাঁদটা জ্বলছে, যেন আলোর একটা বল।'

ছেলের কাঁধ চাপড়ে দিয়ে মা বলল—'হ্যাঁ, খোকা, ঠিক তাই।' এবং ছেলের কণ্ঠস্বরে কেমন এক শিহরণ অনুভব করে মা, জিজ্ঞেস করে—'তুই চাঁদের দিকে তাকিয়ে কী দেখছিস? সামনের দিকটা দেখবি তো।'

ছেলেটি মায়ের হাত টেনে ধরে বলে—'এখন ওটাই তো আলো দিচ্ছে আমাদের সামনের পথে।'

'কিন্তু এরপরে কবরখানার দিকে গিয়ে ভয় পাবি না তো?'

চুপ করে রইল ছেলেটি, তাই মা বলল—'পুরুষ মানুষ কখনো ভয় পায় না রে!'

ছেলেটি চুপ করে রইল, কিন্তু গাছগুলির নিচ দিয়ে যেতে যেতে ভয়ে ভয়ে আঙুল দিয়ে দেখাল সামনের দিকটা। মা থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল—সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ল। সামনেই পথটা জলপাই গাছগুলির শিকড়ের কাছ দিয়ে

বে'কে গেছে উপরের দিকে। ছেলেটা ভয়ে জড়োসড়ো মাকে জড়িয়ে ধরতেই মা কে'পে উঠল ভয়ে, দেহের রক্ত জমাট বে'ধে গেল— এ কী ভয়াবহ স্তব্ধতা। তবু শেষপর্যন্ত চলতে শুরু করল ছেলেকে নিয়ে, আর সরু পথটাও চলতে লাগল সঙ্গে সঙ্গে। আবারো ওরা থমকে দাঁড়াল—ছেলেটা মায়ের গা ঘিষে থেকে বলল—'ফিরে চলো, মা।'

মা নিজেকে সামলে রেখে বলে উঠল—'না, আমাদের যেতেই হবে।'

'ভূতে আমাদের খেয়ে ফেলবে।'

'ভূত তো আমাদের দারিদ্র্যই, খোকা।'

'আমার পা যে আর সামনে এগোচ্ছে না, মা।'

'ফিরে যাই তো কাল আমাদের তেল থাকবে না।'

'আমরা তো মরেই যাব, মা। তেলের দরকার হবে না।'

'আমার সঙ্গে সঙ্গে আয়।'

'ভয়ে আমার গায়ে কাঁটা দিচ্ছে।'

'আমার গায়ে গা ঠেকিয়ে চল্, থামবি না।'

'আমার কানে কেমন কান্নার শব্দ শুনছি।'

'মানুষের মতো দাঁড়া। আমাদের সঙ্গে ঈশ্বর আছেন।'

'ভূতটা এগিয়ে আসছে।'

'না, আমরাই তার দিকে এগিয়ে যাচ্ছি।'

'আমাদের মেরে ফেলবে।'

'কক্ষনো না।'

'মারবে ঠিকই।'

'না, খোকা, এখানে দাঁড়িয়ে আমিই তোকে বাঁচাব।' তবু মনে হয়, ভয়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার শক্তিটা দুর্বল হয়ে পড়ছে,— শরীরের ডান দিকটা অসাড় হয়ে গেছে। জ্যোৎস্না-উজ্জ্বল পথটা তার পিছনে সরে গেল। এখনি ঘটবে একটা বিছু। ছেলেকে হঠাৎ জড়িয়ে ধরল তার বাঁ পাশে— চোখ বুজে ভূতটাকে এড়িয়ে যাবার জন্যে এগিয়ে গেল সবেগে। মা চোখ খুলবার আগেই ছেলেটা বারবার পিছু ফিরে দেখে, শেষবারে বলে ওঠে— 'ঐ দেখো না, চলে গেছে।'

মা ঘুরে ফিরে দেখল, ভয় পাবার মতো কিছুই নাই। তবে কাছের গাছটার গোড়ায় শাদামতো কী যেন একটা। উৎসুক হয়ে দেখতে গেল। লম্বা জলপাইগাছটার গোড়ায় ঝুঁকে পড়ে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল—হ্যাঁ ভগবানকে ধন্যবাদ, তিনি তার বুকে শক্তি ফিরিয়ে দিয়েছেন। যে ভূতটাকে দেখেছিল সেটা আসলে ফনীমনসারই প্রকাণ্ড একটা ডাল। জ্যোৎস্নায়

সেটা এমন দেখাচ্ছিল যে ভয়ে আঁৎকে উঠেছিল দুজনেই, কিন্তু ছেলেটা তখনো বলছিল—'ঐ চাঁদটার জন্যেই ভয় পাচ্ছিলাম আমরা।'

'না খোকা, ভয়ের কিছুই ছিল না, ওসব আমাদের কল্পনা।'

'তুমি কি দেখোনি মা, ও আমাদের কী করছিল ?'

'ও তো আলোই দিচ্ছিল আমাদের পথে।'

'তা সত্যি।'

'তাহলে এবার আলোয় আলোয় চল্ এগোই।'

ভোর

এগিয়ে চলেছে সামনের দিকে—স্থির পদক্ষেপে। পাশে পাশেই হাঁটছে ছেলে—তবে বেশ স্বচ্ছন্দে স্বাধীনভাবে। স্বস্তি পাচ্ছে। কিন্তু নিশ্চিন্ত অবস্থাটা সাময়িক। দুজনেই ভাবছে সামনের কবরস্থানের কথা। সেখানটায় কী হবে জানে না···কবরের সমাধি-ফলকগুলির মাঝখানটা দিয়েই ঘোরালো প্যাঁচালো রাস্তা। যে পথ পেরিয়ে এসেছে তার চেয়ে এখানটা আরো খারাপ। কবরখানায় এসে পড়তেই মা ও ছেলে আবার এ-ওর গা ঘিষে চলতে লাগল। নিথর জ্যোৎস্নায় কেমন উজ্জ্বল দেখাচ্ছে সমাধি-ফলকগুলি। কিন্তু যে কোনো মুহূর্তেই শুরু হতে পারে ভূতপ্রেতের ভয়াবহ নাচ। এমন অনেক গল্প শুনেছে মা নিজেই, কিন্তু নিজচোখে দেখেনি কখনো। কিন্তু---বিশেষ করে এখানকার এই কবরখানার প্রেতাত্মারা প্রায়ই ভয় দেখায়---সবাই এখানটা এড়িয়ে চলে। গাঁয়ের লোকজনে বলে তো সবাই। সেও এখানটা দিয়ে যেতে হলেই ভয় পায়।

কবরগুলোর দিকে তাকাচ্ছে না কোনোরকমেই, হেঁটে চলেছে ক্লান্ত অবসন্ন। এটা কি কবরগুলোর কাছে ঘনিয়ে আসার জন্যে ? সমাধি-স্তম্ভগুলো বুকের উপর চেপে বসেছে। তার স্বামীর সঙ্গে সহবাসের জীবনটা ভাবতে গেলেই তার মনে পড়ত এই কবরখানার কথাই···তার ইচ্ছে হত সে যেন ঠাঁই পায় এই কবরখানায়ই। কিন্তু শিশুসন্তানদের কথা ভেবে সরিয়ে রাখত এহেন ভাবনা। ওদের ফেলে রেখে তো যেতে পারে না। তাহলে তো নিদারুণ দুঃখদুর্গতি হবে ওদের। যে বাপ পিতার কর্তব্যকে কর্তব্য জ্ঞান করে না তার হাতেই কী করে ছেড়ে দেবে ওদের ?

কিছুক্ষণ আগেও একটা ভয় তাকে চেপে ধরেছিল এবং শেষটায় ধরা পড়ল যে তা একেবারেই মিথ্যা ও মনগড়া। মনে পড়ল সে কথা। এবং তখনি

বুঝল তার পথে সে ঠিকই এগিয়ে যাবে,—প্রেতাত্মারা তো কখনোই ক্ষতি করে না জীবিতদের। কয়েক পা এগোতেই অনুভব করল পিছনেই আসছে কেউ। নিজের অজ্ঞাতসারেই আচমকা কেঁপে উঠল বুক। ছেলেটার হাতখানা শক্ত করে ধরল। এবার পিছন থেকেই তার ঘাড় ভাঙবে কেউ। কিন্তু কে সে—দেখবেই। মোড় ঘুরে দাঁড়াতেই দেখে—এগিয়ে আসছে তার স্বামী। রাগে চেঁচিয়ে উঠল—'আমাদের কবর দেবার জন্যেই কি এগিয়ে আসছ?'

ছেলেটাকে আলগোছে সামনে ঠেলে দিয়ে চলতে লাগল—স্বামীর জবাবটা শুনবার জন্যে দাঁড়াল না। স্বামীটি আরো লম্বা লম্বা পা ফেলে ধরে ফেলল ওকে, বলল—'বেশী দেরী করো না, শিশুরা একলা থাকবে।' এবং স্ত্রী ওকে ছাড়িয়ে চলে যাবার মুখে স্ত্রীকে ও বলল—'আমি কাজ করতেই মাঠের দিকে যাচ্ছিলাম।'

—ওই কথা কয়টি শোনামাত্র কোথায় চলে গেল স্ত্রীর যত রাগ, সন্ধ্যে-রাতেই যেসব কটু কথা বলেছিল মনে পড়তে লাগল। সারাটা মন যেন গলে গেল। কবরখানার মধ্য দিয়ে দ্রুত পায়ে চলতে চলতে ওষ্ঠে ফুটে উঠল মৃদু হাসি।

লেখক : চিনুয়া আচেবে

আফ্রিকার বহুমুখী সাহিত্যের একজন বিশিষ্ট শিল্পী। ছোটগল্পকার, ঔপন্যাসিক, কবি ও প্রবন্ধকার। প্রকাশিত গ্রন্থ : থিংস ফল এপার্ট থেকে শুরু করে এরো অব গড, এ ম্যান অব দ্য পিপল (উপন্যাস); গার্লস এট ওয়ার (গল্প), বি ওয়েরার সোল ব্রাদার (কবিতা-সংগ্রহ), মর্নিং ইয়েট অন ক্রিয়েশন ডে (প্রবন্ধমালা)। ছোটগল্প লেখা শুরু করেন—ইবাদানে যখন কলেজ-ছাত্র।

আফ্রিকান সাহিত্যমালার সম্পাদকরূপে আচেবে আফ্রিকার সত্যকার জীবন ও বহুমুখী সাহিত্য-সংস্কৃতিকে তুলে ধরেছেন বিশ্বের সামনে। ইনি নিজেও সাহিত্যগ্রন্থমালার একজন লেখক—বহু পত্রপত্রিকারও লেখক। উমাহিয়ার সরকারী কলেজে এবং ইবাদানে বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজে শিক্ষালাভ করেছেন। নাইজেরীয় বেতারসংস্থার অধিকর্তা, কানেক্টিকাট বিশ্ববিদ্যালয় সংস্থার এখন লেখক ইনি। বহু সম্মান লাভ করেছেন দেশবিদেশ থেকে : সাম্প্রতিক সম্মানজনক উপাধিরূপে লাভ করেন আমেরিকার আধুনিক ভাষা-পরিষদের সভ্যপদ, এবং স্টার্লিং ও স্যাদাম্পটন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট ডিগ্রি, এবং দ্বিতীয় ব্যক্তিরূপে লাভ করেন স্কটিশ আর্টস কাউন্সিলের 'নেইল গান' সভ্যপদ।

॥ বিয়েটা ব্যক্তিগত এবং পারস্পরিক ॥

'তোমার বাবাকে এখনো কি লেখনি?'—নেনে ১৬নং কাসাঙ্গা স্ট্রীটে লাগোস শহরে তার ঘরে বসে বলছিল নুনেমেকা-কে।

'না, সেকথাই ভাবছি কদিন ধ'রে। মনে হচ্ছে ছুটিতে বাড়ী গিয়ে বলাটাই ভালো।'

'তা কেন? তোমার ছুটি তো এখনো অনেক দূরে—গোটা ছ' সপ্তাহ। ওঁকে আমাদের সুখের অংশীদার করাটা কর্তব্য।'

নুনেমেকা চুপ করে রইল কিছুক্ষণ, তারপর বলতে লাগল খুব ধীরে ধীরে, যেন কথাগুলি হাতড়ে বেড়াচ্ছে অন্ধকারে—'বাবার কাছে এটা সুখের খবর হবে, তাই চাইছি আমি।'

'হবেই তো।'—খানিকটা বিস্মিত হয় নেনে—'হবেই না বা কেন?'

'তুমি তো আজীবন এই লাগোস শহরেই থেকেছ, দুনিয়ার দূর দূরান্তের লোকদের কথা কিছুই জানো না বলতে।'

'তুমি তো সবসময়েই ঐ এক কথাই বলো আমাকে। কিন্তু আমি তো বিশ্বাস করি না—কেউ এমন এক অন্য ধরণের হবে যে ছেলেরা তাদের পছন্দমতো বিয়ে করছে শুনে অখুশিই হবে।'

'হ্যাঁ, খুবি অখুশি হবে—যদি বিয়েটা তাঁরাই ঠিক না করে থাকেন। আর, আমাদের ক্ষেত্রে সেটা সবচেয়ে বিরুদ্ধ ধরণের, কিন্তু—তুমি তো এমন কি আমাদের 'ইবো' উপজাতিরই নও।'

—কথাটা বলা হল এত গুরুত্ব দিয়ে আর এত ভূমিকা ছাড়াই যে নেনে কিছুক্ষণ কথাই খুঁজে পেল না। কে কাকে বিয়ে করবে তা ঠিক করবে তার উপজাতির লোকেরা? শহরের সর্বজাতিক আবহাওয়ায় সব সময়েই তার বরং মনে হয়েছে ওসব ঠাট্টামস্করারই বিষয়।

শেষ পর্যন্ত বলল নেনে—'শুধু সেজন্যেই তোমার বাবা আমার সঙ্গে বিয়েতে আপত্তি করবেন—নিশ্চয়ই তা বলতে চাইছ না। আমার তো মনে হয় তোমাদের ইবো উপজাতির লোকেরা অন্যদের প্রসঙ্গে খুবি বিবেচক।'

'হ্যাঁ তা ঠিকই। কিন্তু বিয়ের কথায় এসেছ কি, ব্যাপারটা এত সহজ নয়। আর এটা—' সে বলে চলে—'তোমার বাবাও যদি বেঁচে থাকতেন এবং ইবিবিও ভূমিতেই বাস করতেন তো তিনিও যা করতেন তা আমার বাবার মতোই।'

'তা জানি না। কিন্তু যেদিক থেকেই হক না, আমার বিশ্বাস তোমার বাবা যখন তোমাকে এত ভালোবাসেন, নিশ্চয়ই ক্ষমা করতে দেরী হবে না। এবার তাহলে সুবোধ বালকের মতোই লিখে পাঠাও একখানা সুন্দর চিঠি…'

'না, চিঠি মারফৎ খবরটা হঠাৎ জানানোটা ঠিক হবে না। চিঠিটা হবে একটা আঘাত। আমি ঠিক জানি।'

'ঠিক আছে, লক্ষ্মীসোনা—তুমি যেমনটা বোঝো করবে। তুমিই তোমার বাবাকে চেনো।'

নুনেমেকা সেদিন সন্ধ্যায় বাসায় ফিরতে ফিরতে মনে মনে নানারকম ভেবে দেখতে লাগল কী করে বাবার বিরোধিতাটা জয় করা যায়—বিশেষ করে বহুদূর এগিয়ে সে যখন একটি মেয়েকে পেয়ে গেছে। প্রথমটায় সে বাবার চিঠিটা নেনেকে দেখাবার কথা ভেবেছে, কিন্তু পরেই ভাবনাটা তুলে রেখেছে। বাসায় ফিরে একটা চিঠি আবার পড়তে লাগল—আর আপন মনে হাসতে লাগল।

উগোয়ে মেয়েটাকে বেশ মনে আছে তার, একটা মরদা-মার্কা দজ্জাল

মেয়ে—ইস্কুলের ছেলেদের পিটি লাগাত। তাকেও—ন্‌নেমেকাকেও, কখনো নদীটার পথে যেতে যেতে, ইস্কুলের মাঠেও…

'আমি একটি মেয়ের সন্ধান পেয়েছি। তোমার সঙ্গে চমৎকার মানাবে উগোয়ে নোয়েকে, আমাদেরি প্রতিবেশী জেকব নোয়েকের বড় মেয়ে। যথার্থ খ্রীষ্টীয় নিয়মেই মানুষ করা হয়েছে। কয়েক বছর আগে স্কুল ছেড়ে দিলে তার বাবা (খুবি বিচারবুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তি) পাঠান তাকে বাড়ীতে এবং সেখানে সে পেয়েছে গৃহিনী হবার সব রকমের শিক্ষাদীক্ষা। তার রবিবারের বিদ্যালয়ের শিক্ষক আমাকে বলেছেন—মেয়েটি অবাধে পড়ে যেতে পারে বাইবেল। আশা করছি তুমি এই বড়দিনের ছুটিতে বাড়ী এলেই সম্বন্ধের কথাটা পাড়ব।'

লাগোস থেকে বাড়ী ফেরার পরের দিন সন্ধ্যাবেলা ন্‌নেমেকা বাবার সঙ্গে বসে আছে একটা ক্যাশিয়া গাছের তলায়। বৃদ্ধ এখানটায়ই খুঁজে পান বাইবেল পড়ার মতো এক নিরালা আশ্রয়—তখন অস্ত যেতে থাকে শীতের সূর্য, আর গাছের পাতায় পাতায় বইতে থাকে তাজা সঞ্জীবনী হাওয়া।

'বাবা।'—হঠাৎই শুরু করে ন্‌নেমেকা—'আপনার কাছে ক্ষমা চাইতে এসেছি।'

'ক্ষমা! কিসের জন্যে ক্ষমা, খোকা?'—বিস্মিত হন বৃদ্ধ পিতা।

'এই বিয়ের ব্যাপারে।'

'কোন্ বিয়ের ব্যাপারে?'

'আমি পারছি না—আমরা না এগিয়ে পারছি না—আমার পক্ষে বিয়ে করা অসম্ভব—ঐ নোয়েকের মেয়েকে।'

'অসম্ভব! কেন?'—জানতে চান বাবা!

'ওকে আমি ভালোবাসি না।'

'কেউই তো বলেনি ওকে তুমি ভালোবেসেছ। কেনই বা ভালোবাসবে?' —বললেন বাবা।

'আজকাল বিয়েটা স্বতন্ত্র কিছু…'

'শোনো খোকা'—বাধা দেন বাবা—'কিছুই স্বতন্ত্র নয়, স্ত্রীর মধ্যে কী চায় লোকে? সৎ চরিত্র এবং খ্রীষ্টধর্মীয় একটা পশ্চাৎপট।'

ন্‌নেমেকা দেখল এই ভাবের যুক্তিতর্কে লাভ নেই কিছু, তাই সে বলল—'তাছাড়া, আমি একটি মেয়েকে বিয়ে করব ঠিক করেছি—উগোয়ের সব গুণই আছে তার, সে…'

বাবা তার কথাই বিশ্বাস করতে পারছেন না—'কি বললে?' আস্তে আস্তেই জিজ্ঞেস করেন।

'সেই মেয়েটিও সচ্চরিত্র ধার্মিক খ্রীষ্টান।'—বলে যায় নুনেমেকা—'আর কাজ করে সে লাগোসের একটা বালিকাবিদ্যালয়ে।'

'কি বললে? শিক্ষয়িত্রী? যদি মনে করে থাকো সাধবী স্ত্রী হবার জন্যে ওটা একটা যোগ্যতা, তবে আমি তোমাকে জানিয়ে দিচ্ছি যে কোরিন্থীয়দের কাছে সেণ্ট পল স্পষ্টই বলেছেন: খ্রীষ্টধর্মীয় কোনো নারীই শিক্ষকতা করবে না, নারীদের নীরবতা পালন করতে হবে।'

বাবা তাঁর আসন থেকে উঠে হাঁটতে লাগলেন সামনে আর পিছনে। বিষয়টা তাঁর বিশেষ প্রিয়, এবং গির্জার যে সব নেতারা মেয়েদের বিদ্যালয়ে শিক্ষাদান করাটাকে উৎসাহ দেন তাদেরকে তিনি ভয়ানক অপরাধে দণ্ডিত হবার যোগ্য মনে করেন। বহুক্ষণ ধরে এসব কথা বলার আবেগটা থেমে এলে বাবা তাঁর ছেলের সম্বন্ধের কথায় ফিরে এলেন—খানিকটা নরম সুরেই—

'তা, কাদের মেয়ে সে?'

'সে হল নেনে আটাং।'

'কী বললে?'—নরম সুর কেটে গেল ফের—'নেনে আটাং বললে না? তার অর্থ?'

'নেনে আটাং—কালাবার উপজাতির, তবে একমাত্র ওকেই আমি বিয়ে করতে পারি।'—জবাবটা নিশ্চয়ই একটু রুক্ষ হয়ে পড়েছে, এবং নুনেমেকাও ভাবছে এই এক্ষুণি ঝড় ঝাঁপিয়ে পড়বে। কিন্তু তা হল না। এটা একেবারেই অপ্রত্যাশিত, এবং এতে ঘাবড়েই গেল সে। ভয়ানক সব সাবধান-বাণী শুনতে থাকার চেয়েও এটা যে আরো বিপজ্জনক। সেদিন রাতে বুড়ো খেলেন না কিছুই।

একদিন পর নুনেমেকাকে ডেকে এনে বৃদ্ধ সবরকমেই চেষ্টা করলেন ওকে ফেরাতে। কিন্তু এই তরুণের মন তখন কঠিন হয়ে উঠেছে, এবং তার বাবাও বুঝলেন ছেলেকে হারাতেই হবে।

'খোকা! কোন্‌টা তোমার ঠিক, কোন্‌টা নয়—তা ধরিয়ে দেওয়াটা আমার কর্তব্য। যে তোমার মাথায় ওসব বুদ্ধি ঢুকিয়েছে সে তোমার গলাটাও কাটতে পারে। ওটা হল শয়তানেরই কেরামতি।'—ছেলেকে সরিয়ে দেন।

'আপনার মতের নিশ্চয়ই পরিবর্তন হবে—নেনেকে যখন জানতে পাবেন।'

'কখনোই ওর মুখ দেখব না।'—বাবার সাফ জবাব। এবং সেদিন রাত থেকে ছেলের সঙ্গে কথা প্রায় বন্ধই করে দিলেন। তবে এ প্রত্যাশাটুকু ত্যাগ করলেন না—ছেলে যে কী বিপদের মুখে এগিয়ে যাচ্ছে নিশ্চয়ই তা বুঝে দেখবে। দিনরাত তিনি এ নিয়ে প্রার্থনা করতে লাগলেন।

বাবার শোকদুঃখে নুনেমেকা ব্যক্তিগতভাবে খুবি আহত হল, কিন্তু তারো আশা এসব মিটে যাবে। সে যদি বুঝত যে মানবজাতির কোনো লোকে কখনোই অন্যভাষী কোনো মেয়েকে বিয়ে করেনি, হ্যাঁ তাহলে সে এতটা আশা রাখতে পারত না। কয়েক সপ্তাহ পরে এক বৃদ্ধের মুখে শোনা গেল এক ফরমান : 'এমনটা কেউ কখনোই শোনেনি।' এই একটি কথাতেই তিনি প্রকাশ করেছেন তাঁর সমস্ত জাতটার বক্তব্য। চারদিকে যেই ছড়িয়ে পড়ল তাঁর ছেলের আচার-আচরণের কথা, বৃদ্ধ পিতা অন্য লোকদের নিয়ে উপস্থিত হলেন ওকেকে-র কথা শুনাবার জন্যে। তাঁর ছেলে তখন চলে গেছে লাগোসে।

'এমনটা কেউ কখনোই শোনেনি!'—ঐ বৃদ্ধ মাথা নাড়তে নাড়তে আবারো বলছিলেন।

'আমাদের প্রভু কী বলেছেন এ সম্পর্কে? বলেছেন : পুত্রেরা দাঁড়াবে পিতাদের বিরুদ্ধে। হ্যাঁ, এমনটাই আছে পবিত্র ধর্মগ্রন্থে।'— বললেন আর একজন।

'এই তো সর্বনাশের শুরু!'—আর একজনের বক্তব্য। আলোচনাটা কেবলমাত্র শাস্ত্র-ভিত্তিক হয়ে উঠতে মাদুবো গুয়ু নামে একজন বাস্তবধর্মী লোক বিষয়টাকে নামিয়ে আনলেন সাধারণ স্তরে। সে নুনেমেকার বাবাকে বলল—'আপনার ছেলেকে কোনো দিশী হেকিম দেখিয়েছেন?'

এর জবাবটা শোনা গেল—'ওর তো রোগ হয়নি।'

'তবে কি হয়েছে? ওর মনেই রোগ ধরেছে, আর কেবলমাত্র ভালো কোনো ভেষজ-বিশেষজ্ঞ কবিরাজই ওর বুদ্ধিশুদ্ধি স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে পারে। ওর যে ওষুধটা দরকার, তার নাম হল 'আমালিলে'—ঐ ওষুধটা দিয়েই মেয়েরা তাদের স্বামীদের উড়ু-উড়ু মনকে বেঁধে রাখে।'

'ঠিকই বলেছে মাদুবো গুয়ু।'—বলে আর একজন—'এরকম ক্ষেত্রে ওষুধ দরকার।'

'আমি কোনো দিশী হেকিম ডাকব না।'—নুনেমেকার বাবা যে এসব ব্যাপারে প্রতিবেশীদের মতো অত সংস্কারাচ্ছন্ন নয়, বরং বেপরোয়াভাবেই অনেকটা এগিয়ে থাকেন সেটা সকলেই জানে। উনি বলে চলেন—'না, আমি ওই ওচুবা মেয়েছেলেটার মতো হতে চাই না। আমার ছেলে যদি মরতে চায় তো নিজহাতেই নিজের মরণ ঘটাক। আমাকে সাহায্য করতে হবে না।'

মাদুবো গুয়ু বলে—'কিন্তু সেটা তো হয়েছে ওই মেয়েছেলেটারি দোষে। ওর ধরা উচিত ছিল কোনো সৎ হেকিমকে। আসলে ওই মেয়েছেলেটি ছিল একটু বেশী চালাক।'

জোনাথন তার পাড়াপড়শীদের সঙ্গে কথাবার্তায় কখনোই যুক্তিতর্ক খাটাত

না। কারণ সে তো বলতই—ওরা যুক্তি বোঝে না। সে কিন্তু এবার বলল—'অষুধটা সে তৈরী করেছিল তার স্বামীর জন্যে, এবং অষুধটা তৈরী হয়েছিল তার স্বামীর নামেই—ওটা তার স্বামীর পক্ষে হিতকরই হত। শয়তানীর ব্যাপারটা হল সেটা কিনা মিশিয়ে দেওয়া হয়েছিল হেকিমের দেওয়া খাবারের সঙ্গে…'

মাস ছয়েক পরে নুনেমেকা তার তরুণী স্ত্রীকে দেখাল বাবার পাঠানো এক ছোট্ট চিঠি :

'আমি বিস্মিত হচ্ছি—তুমি কী করে এত নিষ্ঠুর হতে পারলে যে আমাকেই পাঠিয়েছ তোমাদের বিয়ের ছবি। আমি ওটা ফেরৎই পাঠাতাম। কিন্তু তারপর আরো ভেবেচিন্তে স্থির করলাম : তোমার স্ত্রীকে কেটে ফেলে তোমার কাছেই ফেরৎ পাঠাব। কারণ তোমার স্ত্রীতে আমার কোনোই প্রয়োজন দেখি না। তোমাদের কারো সঙ্গে কোনো সম্পর্ক না থাকলেই আরো ভালো হত।'

নেনে চিঠিটা পড়া শেষ করে ছলছল চোখে তাকিয়ে দেখল বিকৃত ছবিটাকে এবং ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

'কাঁদে না, লক্ষ্মীমেয়ে।'—স্বামী বলতে থাকে 'বাবা আসলে খুবি সরল ও সৎ প্রকৃতির—একদিন নিশ্চয়ই সহৃদয় দৃষ্টিতে দেখবেন সব—গ্রহণ করবেন আমাদের বিবাহিত জীবনকে।' কিন্তু বছরের পর বছর চলে যাচ্ছে, সেদিন আর আসছে না।

দীর্ঘ আট বছর ওকেকে তাঁর ছেলের সঙ্গে কোনোই সম্পর্ক রাখলেন না। কেবলমাত্র তিনবার (নেনেমেকা যখন বাড়ী আসার কথা লিখেছে) বাবাও চিঠি লিখেছেন।

একবার তো তিনি লিখলেন—'তোমকে এ বাড়ীতে থাকতে দিতে পারি না—তুমি তোমার ছুটির সময়টা কিংবা জীবনটা কোথায় কিভাবে কাটাবে তা নিয়ে আমার মাথাব্যথা নেই।'

নুনেমেকার বিয়ের বিরুদ্ধে নানাধরণের সংস্কারমূলক নানা কথা কেবলমাত্র তাদের গাঁয়েই সীমাবদ্ধ রইল না। লাগোস শহরেও—বিশেষ করে তাদের উপজাতির যেসব লোকেরা সেখানে কাজ করত সেখানেও প্রতিক্রিয়াটা হল, তবে কিছুটা অন্য ধরণের। . আর সেই সব লোকদের স্ত্রীরা গাঁয়ে তাদের আস্তানায় বরং নেনেকে সন্দেহই করত—মেয়েটি তো তাদের থেকে স্বতন্ত্র ধরণেরই। কিন্তু দিনের পর দিন যেতে নেনে ক্রমে ক্রমে ভেঙ্গে ফেলতে পারল ওদের সংস্কারের বেড়া, এবং এমনকি অনেককেই বান্ধবী করে ফেলল নেনে। ধীরে ধীরে এবং খানিকটা ঈর্ষার ভাবেই ওরা স্বীকার করতে লাগল যে মেয়েটি অনেকের চেয়েই ঘরকন্নায়ও পাকা।

ন্নেমেকা ও তার তরুণী বধূ যে এক সুখী দম্পতি—এই কাহিনীটা ঘটনাক্রমে গিয়ে পৌঁছল ইবো-ভূমির দূরদেশেও। কিন্তু এসব কথা একেবারেই জানত না যারা—তেমন কিছু লোকের মধ্যে একজন ছিলেন ন্নেমেকার বাবাও। ছেলের নাম উচ্চারণ করতেই তিনি তেলেবেগুনে এমন জ্বলে উঠতেন যে সকলেই কথাটা এড়িয়ে চলত। প্রচণ্ড এক ইচ্ছাশক্তির দ্বারাই তিনি তাঁর ছেলেকে হটিয়ে দিয়েছেন মনের পিছনে। এই সুকঠিন দ্বন্দ্বে তাঁর জীবনটা প্রায় শেষ হতেই যাচ্ছিল, কিন্তু তিনি নিজেকে বাঁচিয়ে রেখেছেন—তিনি বিজয়ী হয়েছেন।

তারপর একদিন তিনি একটি চিঠি পেলেন নেনের কাছ থেকে। অনিচ্ছা সত্ত্বেও তিনি যেন নিয়মরক্ষার মতোই পড়তে লাগলেন—পড়তে পড়তে হঠাৎ তাঁর মুখের ভাব পালটে গেল, এবং তিনি এবার পড়তে লাগলেন বেশ যত্নের সঙ্গেই।

'আমাদের ছেলেদুটি যেদিন জানতে পেল তাদের এক দাদু আছে, সেদিন থেকেই তাদেরকে দাদুর কাছে নিয়ে যাবার জন্যে বারবার বলছে। আমি কী করে ওদের বলব যে আপনি ওদের দেখতে চান না। আপনার পায়ে পড়ে বলছিঃ ন্নেমেকা ওদের নিয়ে এই সামনের মাসের ছুটিতেই আপনার কাছে যাবে—আপনার সেই অনুমতি প্রার্থনা করছি। আমি যাচ্ছি না—লাগোসেই থাকছি…'

সঙ্গেসঙ্গেই বৃদ্ধের মনে হল এতদিন ধরে যে সংকল্পের বাঁধ গড়ে উঠছিল তা যেন ভেঙ্গে যাচ্ছে। আপনমনেই বলছিলেন যদিও—না, তিনি হার মানবেন না। সমস্ত রকম আবেগের আবেদনের বিরুদ্ধেই পাথরের মতোই কঠিন হবেন। এটা হল আবেগেরই উল্টোদিক। জানালায় ভর দিয়ে তাকিয়ে রইলেন বাইরের দিকে। ঘন কালো মেঘে মেঘে ঢেকে গেছে সারাটা আকাশ, প্রবল হাওয়ায় উড়ে আসছে ধুলো আর শুকনো পাতারা। মানুষের অন্তর্দ্বন্দ্বের মাঝখানেই যেন হাত বাড়ালেন প্রকৃতি দেবী স্বয়ং, এখন ঠিক সেইরকমেরই অবস্থাটা। শিগগিরি শুরু হল বৃষ্টি—এবছরের প্রথম বৃষ্টি। বড় বড় জোরালো ফোঁটায় শুরু হল বর্ষণ, আর সঙ্গেসঙ্গেই সে কী বিদ্যুৎ-চমক ও বজ্রপাত। স্পষ্টতই ঋতু পরিবর্তনের লক্ষণ। ওকেকে খুব চেষ্টা করছিলেন তাঁর দুই নাতির কথা না ভাবতে। কিন্তু তিনি যে লিপ্ত আছেন হারবার যুদ্ধেই—তা বুঝছেন। পছন্দমতো একটা ধর্মসঙ্গীতের সুর ভাঁজতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু ছাতের উপর বৃষ্টির জোর শব্দে কেটে গেল সুর। আর সঙ্গেসঙ্গেই তাঁর মনপ্রাণ চলে গেল দুই নাতির কাছে। কী করে তাদের সামনেই বন্ধ করে রাখবেন বাড়ীর দরজা? অদ্ভুত এক মানসিক প্রক্রিয়ায় তাঁর মনে হ'ল রুদ্ধ এই ভয়ানক প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যেই যেন দাঁড়িয়ে আছে দুটি পরিত্যক্ত ছেলে!

সেদিন রাতে নিদারুণ অনুশোচনায় দুচোখের পাতা বড় একটা এক করতে পারলেন না। আর কেমন একটা ভয় ওদের কাছে পাবার আগেই—সব বলবার আগেই যদি মরে যান।

লেখক ঃ ন্‌গুগি ওয়া থিয়ঙ্গ'ও

সমগ্র আফ্রিকা মহাদেশের এক বিখ্যাত লেখক—লিখেছেন বহুগ্রন্থ ঃ ছোট-গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, নাটক। তাঁর প্রথম সুখ্যাত উপন্যাস হল 'উইপ নট, চাইল্‌ড (কেঁদো না খোকা) ?' এবং 'রিভার বিটুইন' (মাঝখানে নদী)। এতে প্রকাশ পায় তাঁর রচনাশক্তির ও রচনাশৈলীর বৈশিষ্ট্য। শেষ প্রকাশিত উপন্যাস 'শয়তান'। মাঝখানের বহুরচনার পরিচয় ঃ গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, নাটক, কারাবাসের ডায়েরী।

ওয়া থিয়ঙ্গ-র সুবিখ্যাত গল্পগ্রন্থ হল 'সিক্রেট লাইভ্‌স', এখান থেকেই গৃহীত হয়েছে 'শহীদ' গল্পটি।

লেখক কেনিয়ার অধিবাসী। জন্মেছেন ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে, বিদ্যাশিক্ষা বিকুয়ুর এলায়েন্স হাইস্কুলে, এবং মাকারেরে ইউনিভার্সিটি কলেজে, এবং লীডস বিশ্ববিদ্যালয়ে। লেখক মাকারেরে এবং নাইরোবি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করছেন বর্তমানে।

লেখক বিনাবিচারে বন্দী থাকেন ১৯৭৮ ও ১৯৮১-র প্রায় পুরোটা, এবং এই বন্দীজীবনের অভিজ্ঞতা থেকেই লেখেন 'অন্তরীণ ঃ এক লেখকের কারা-জীবনের দিনপঞ্জী।'

লেখকের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য ও স্বকীয়তা হ'ল স্বদেশের কঠিন বাস্তবকে গ্রহণ করে তার মধ্যের অগ্রণী অংশকে তুলে ধরা ঃ সংস্কারকেও সহানুভূতির সঙ্গে দেখা, তার স্বদেশে স্বকীয় ঐতিহ্যকে আশ্রয় করেও প্রগতিশীল জীবনাদর্শকে তুলে ধরা, এবং এইসব ক্ষেত্রে ঔপনিবেশিক শাসক শক্তি কর্তৃক দমন ও শোষণের নানা কলাকৌশলকে খুলে ধরা। আফ্রিকার জনজীবন—অর্থাৎ লেখকের চারিদিকের চলমান জগৎ এবং সেসব সম্পর্কে লেখকের রাজনৈতিক-সামাজিক সত্তায় যে প্রভাব ও প্রেরণা—তাই লেখকের রচনার মূলশক্তির পরিপোষক। লেখক বলেছেন—'লেখাটা আমার কাছে আমার সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে এবং ইতিহাসের ধারাক্রমে আমাকেই বুঝবার এক প্রয়াস। লিখবার সময়ে আমি তো ভুলতে পারি না আমার বাবার ঘরে রাত্রিকালীন সেই গৃহযুদ্ধ ; ভুলতে পারি না আমাদের মুখে খাবার তুলে দেবার জন্যে—আমাদের একটু ভালো বেশবাসের ও পড়াবার খরচ জোগাড় করবার উদ্দেশ্যে ও জমিচাষের ব্যাপারে আমার মায়ের সে কী হাড়ভাঙ্গা খাটুনি। ভুলতে

পারি না ঝাঁকে ঝাঁক ঊপনিবেশী পুলিশের গুলির মধ্য দিয়েই আমার দাদা ওয়ালেস মোয়াঙ্গির সেই বনে ছুটে পালানোর দৃশ্য, এবং সেই গুপ্ত বনবাস থেকেই যেরকম করেই হক আমার লেখাপড়া অব্যাহত রাখার জন্যে বার্তা পাঠানো। ভুলতে পারি না আমার ভাইপো গিচিনি এবং নুগুগিকে—তাজা বুলেটসহ ধরা পড়েও কোনোরকমে যারা পালিয়ে বেঁচেছে ফাঁসির দড়ি থেকে, ভুলতে পারি না আমার গ্রাম্য সঙ্গীদেরকে খুন করা—যেহেতু তারা শপথ নিয়েছিল দেশের স্বাধীনতার। সাধারণ নারী পুরুষের কী আশ্চর্য মনোবল—তারা মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ও বেপরোয়া হিংসা-তান্ডবের বিরুদ্ধে। এবং এইসঙ্গেই মনে পড়ছে আমারি কিছু কিছু আত্মীয় ও গ্রামবাসীই কিনা বয়ে ফিরেছে শ্বেতাঙ্গদের তুলে দেওয়া বন্দুক—বইয়ে দিয়েছে রক্তস্রোত! মনে পড়ছে ভয় ও বিশ্বাসঘাতকতা, অশ্রু ও হতাশা, ভালোবাসা ও সংগ্রামী একতা। এবং এসবের অর্থই আমি সন্ধান করছি আমার কলমের সাহায্যে।'

লেখক নবজাগ্রত আফ্রিকার সাহিত্য-সংস্কৃতির একজন একনিষ্ঠ সংগ্রামী—কেবল বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মিক অধ্যাপকই নন। চিনুয়া আচেবে প্রমুখ দেশের সমসাময়িক লেখকদের কাছে এই লেখক যে ঋণী সে কথাও তিনি সানন্দে স্বীকার করেছেন—এমনকি অজানা অচেনা দূর দূরান্তের ছেলেমেয়েদের কাছ থেকে যে সব চিঠি পান তাও যে তাঁকে প্রেরণা দেয় সাহিত্যসৃষ্টিতে, সে কথাও। কাইবেরা-প্রমুখ উঠ্‌তি লেখকদের সঙ্গেও লেখকের ঘনিষ্ঠতা উল্লেখের দাবী রাখে।

শহীদ

মিষ্টার ও মিসেস গার্স্টোন নিজেদের বাড়ীতেই অজ্ঞাত ডাকাতদের হাতে খুন হলে শহর জুড়ে শুরু হল নানারকম কথা। সংবাদ প্রকাশিত হ'ল দৈনিক পত্রিকাগুলির প্রথম পাতায় এবং বেতারের সংবাদ-বিচিত্রায়। এতটা যে প্রাধান্য দেওয়া হল তারো কারণ বোধ হয় সারাটা দেশ জুড়ে চলছে যখন হিংসার তাণ্ডব, তখন ইউরোপীয় উপনিবেশিক হিসাবে এরাই খুন হল সর্বপ্রথম। এই হিংস্র আক্রমণের পিছনে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য আছে বলেই ধরা হল! যেখানেই কেউ যাচ্ছে না কেন—বাজারে কি ভারতীয় হাটে কি দূরান্তের আফ্রিকান ডুকাতে, ঐ খুন সম্পর্কে কোনো না কোনো কথা শুনতে পাবেই। চলতেই থাকল নানা ধরণের বিবরণ এবং ব্যাখ্যান।

তবে পাহাড়ের উপরে মিসেস হিল-এর একান্ত স্বকীয় নিঃসঙ্গ ভবনটিই এই ব্যাপারটায় যতটা বিশদভাবে আলোচনার ক্ষেত্র হয়ে উঠল অন্য কোথাও ততটা নয়। মিসেস হিলের স্বামী ছিলেন প্রথম উপনিবেশিকদের বসতি-স্থাপনার পর্বে বিশেষ উৎসাহী একজন প্রধান ব্যক্তি। উগাণ্ডার যাত্রাপথে মারা গেলেন তিনি ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হ'য়ে। তাঁর একমাত্র ছেলে ও মেয়ে এখন শিক্ষালাভ করছে দেশের বাড়ীতে অর্থাৎ কিনা ইংলণ্ডে। প্রথম উপনিবেশিকদেরই একজন হওয়ার জন্য এবং এদেশের ডানদিক জুড়ে বিস্তৃত এক বিরাট ভূখণ্ডের অধিকারিনী হওয়ার কারণে—মিসেস হিলকে সবাই সম্মানের চোখে দেখত, যদিও সকলেই যে তাঁকে পছন্দ করত তা নয়। কারণ, কারো কারো মতে 'দেশী' লোকদের সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী ছিল একটু বেশী 'উদার'।

খুন প্রসঙ্গে আলোচনা করবার উদ্দেশ্যে দু'দিন বাদে যখন মিসেস স্মাইল্‌স ও মিসেস হার্ডি এসে উপস্থিত হলেন, তাঁদের চোখেমুখে দেখা দিল কেমন এক বিষণ্ণ অথচ বিজয়ী ভাব। বিষণ্ণ যেহেতু ইউরোপীয় কোনো ব্যক্তিই (তাঁরা মিস্টার ও মিসেস গার্সটোন বলেই নয়) খুন হয়েছে, এবং বিজয়ী যেহেতু এই ঘটনায় সন্দেহাতীত রূপেই স্পষ্ট প্রমাণিত হল এ দেশী লোকদের চরিত্রহীনতা ও অকৃতজ্ঞতা। ওদের সঙ্গে সৎ ব্যবহার করেই যে ওদের সভ্য করে তোলা যাবে—এই বিশ্বাস মিসেস স্মাইলস আর রক্ষা করতে পারলেন না। মিসেস স্মাইলস হলেন রোগামতো এক মাঝবয়সী স্ত্রীলোক—কঠিন সংকল্পের মতোই তাঁর উঁচু নাক এবং তালাবন্ধ ওষ্ঠাধর মনে করিয়ে দেয় স্পষ্টতই খৃষ্টান ধর্মযাজকদের। এবং এক অর্থে তিনি তাই। তিনি এবং তার জাতের সবাই মিলে এই দেশী হিংস্র লোকদের বুনোজগৎকেই রূপান্তরিত করেছেন এক মরূদ্যানে—এই নিশ্চিত বিশ্বাসেই তিনি তাঁর পেশাগত কর্তব্য মনে করতেন তাঁর চালচলন কথাবার্তা এবং হাবভাব দিয়ে এখানকার দেশীলোকদের এবং অন্য যে কোনো লোকদেরকেই সর্বদা সচেতন রাখা।

মিসেস হার্ডি ছিলেন বুয়োর বংশের—অনেক দিন হল এখানে এসে পড়েছেন দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে। যে কোনো বিষয়েই স্বকীয় কোনো মতামত না থাকার জন্য প্রায় সব সময়েই তিনি একমত হন তাঁর স্বামীর সঙ্গে, নয়তো তাঁর জাতের লোকের মতামতের সঙ্গে। যেমন, এই দিনটাতেও মিসেস স্মাইলস যা যা বলছিলেন তার সঙ্গে তিনি একমত। মিসেস হিল কিন্তু স্বমতেই স্থির আছেন, এবং এই ধারণা পোষণ করছেন (বরাবরই যেমনটা করেছেন) দেশী লোকেরা আসলে খুবি বাধ্য ধরণের, এবং সবার যেটা করা দরকার সেটা হল ওদের একটু দয়ার চোখে দেখো।

'শুধু এইটুকুই তো চায় তারা। একটু দরদ দিয়ে দেখো। তাহলে তারাও তোমাকে দেখবে দরদ দিয়েই। দেখো না আমার "ছেলেদের"। ওরা সবাই ভালোবাসে আমাকে। ওরা করে যাবে—ঠিক যা-ই চাই আমি।' এটাই তাঁর—যাকে বলে দর্শন এবং এটাই হল অনেক অনেক উদারনৈতিক ও প্রগতিশীল লোকের মতামতের প্রতীক। মিসেস হিল অনেক কিছুই করেছেন তাঁর "ছেলেদের" জন্যে। কেবল ইঁটের পাকা ঘরই (মনে রাখবেন ইঁটের।) তৈরী করে দিয়েছেন নয়, শিশুদের জন্য প্রতিষ্ঠা করেছেন ইস্কুলও। ইস্কুলে পর্যাপ্ত সংখ্যক শিক্ষক নাই বা থাক, শিশুদের আধা আধি সময়টা শিক্ষাদান করেই শিক্ষকরা আর অর্ধেকটা সময় তার খামারে কাজ করতেই যাক না, তাতে কী আসে যায়। ক'জন উপনিবেশী বাসিন্দা করতে সাহস পায় এতটা।

'এ যে ভয়ংকর কাজ।'—মিসেস স্মাইল্স বলে উঠলেন বেশ উত্তেজিত হয়েই। একমত হন মিসেস হার্ডি। নীরব রইলেন মিসেস হিল।

'কী করে করল এমনটা? আমরা দিয়েছি এদের সভ্যতা। আমরা বন্ধ করেছি দাসব্যবস্থা, বন্ধ করেছি উপজাতিতে উপজাতিতে যুদ্ধবিগ্রহ। আগে ওরা কি জংলীর মতোই জীবনযাপন করত না?'—মিসেস স্মাইলস বলে চললেন তাঁর বক্তৃতা-শক্তি জাহির ক'রে। মাথায় একটা করুণ ধরণের নাড়া দিয়ে শেষ করলেন—'তা, আমি তো বরাবরই বলে আসছি—ওগুলো কখনই সভ্য হল না। সোজা কথায়—গ্রহণ করবার ক্ষমতাই নেই।'

মিসেস হিল এগিয়ে দিলেন—'আমাদেরই উচিত ধৈর্য ধরা!'—চাউনির চেয়ে মিসেস হিলের কণ্ঠস্বরেই ধরা পড়ছিল ধর্মযাজকের ভাব।

'ধৈর্য। ধৈর্য! আরো কতদিন আমরা ধৈর্য ধরে থাকব? গার্স্টোনদের চেয়ে কারা বেশী ধৈর্যগুণ দেখিয়েছে? কারা বেশী দয়া দেখিয়েছে? আর ভাবুন তো, যারা জমি-দখলকারী তাদেরকেও কিনা রেখে দিয়েছে!'

'তা, ঐ ব্যাপারটা তো বেদখলকারীদের ব্যাপার নয়...'

'কারা করেছে, কারা?'

'ওদের সকলকেই ঝোলানো উচিত—সোজা ফাঁসিকাঠে!'—প্রস্তাব আনলেন মিসেস হার্ডি। তাঁর কণ্ঠস্বরে দৃঢ় বিশ্বাস।

'ভাবতে পারেন, তাঁদের কিনা বিছানা থেকে ডেকে তুলেছিল তাঁদের বাড়ীর চাকরটা?'

'সত্যি?'

'হ্যাঁ। তাঁদের বাড়ীর চাকরটাই তো দরজায় ধাক্কা মারতে মারতে বলছিল—জলদি-জলদি দরজাটা খুলে দিতে। বলছিল—কয়েকটা লোক তার পিছু নিয়েছে—'

'হয়ত, ওখানে—'

'না। সবটাই পূর্ব-পরিকল্পিত। ওটা একটা ফাঁদ। যেই দরজাটা খোলা, ডাকাতের দল ঢুকে পড়ল ভিতরে। সবি তো পত্রিকায় বেরিয়েছে।'

মিসেস হিল তাকিয়ে রইলেন বাইরের দিকে—অপরাধীর মতো। উনি পত্রিকা পড়েননি।

চায়ের সময় হল। 'মাফ করবেন, একটু উঠছি!'—মিসেস হিল দরজার কাছে এসে নরম কিন্তু তীক্ষ্ম কণ্ঠে ডাক দিলেন—'নজোরুগে। নজোরুগে।'

নজোরুগে হল তাঁর গৃহভৃত্য। লোকটা দীর্ঘকায়, চওড়া-কাঁধ—বয়স মাঝামাঝি হবে। মিষ্টার হিলের কাজে নিযুক্ত ছিল দশ বছরের উপর। পরণে সবুজ প্যাণ্ট, কোমরে জড়ানো লাল একটা কাপড়, মাথায় লালরঙের ফেজ। দরজায় দেখা দিয়েই ভুরু দুটো উঁচিয়ে তুলল অনুসন্ধানী ভঙ্গীতে. অর্থাৎ কিনা সঙ্গেই অনুচ্চারিত কথা—'হ্যাঁ, মেমসাহেব?' কিংবা 'নদিও বাওয়া না? (কি দেব?)'

'চা নিয়ে এস। (লতা চায়।)'

'নদিও, মেমসাহেব! (দিচ্ছি মেমসাহেব।)'—এবং সঙ্গে সঙ্গেই অন্তর্ধান, অবশ্য সমবেত মেমসাহেবদের দিকে একবার চোখ ঘুরিয়ে নিয়ে। নজোরোগের হাজিরাতে কথাবার্তা যা বন্ধ হয়ে ছিল শুরু হল আবার।

মিসেস হার্ডি বললেন—'ওদের দেখতে কিন্তু নিরীহই লাগে।'

'হ্যাঁ, ঠিক নিরীহ ফুলটিই, কিন্তু তলায় সাপ!'—মিসেস স্মাইলস শেক্সপীয়র পড়েছেন।

'আমার সঙ্গে আছে এই বছর দশেক! খুবি বিশ্বস্ত। আমাকে খুবি পছন্দ করে।'—মিসেস হিল কথা বলছিলেন তার গৃহভৃত্যেরই স্বপক্ষে।

'যাই হোক না, আমি ওর মুখের ভাবখানা পছন্দ করি না।'

'আমিও না।'

চা এল। চা খেতে খেতে তখনো সবাই আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছে নানা বিষয়েঃ ঐ খুন, সরকারী নীতি, অবাঞ্ছিত যত রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ—যারা না থাকলে এই দেশটাই হ'ত কী সুন্দর এক দেশ! মিসেস হিলের কিন্তু ধারণা এই অশিক্ষিত রাজনৈতিক নেতারা—যারা দুদিন বিলেতে গিয়েই ভাবে খুব শিক্ষা পেয়ে এসেছে তারা জানেই না এদেশের সত্যিকার আশা-আকাঙ্ক্ষাটা কী রকম। তবু তুমি তোমার গৃহভৃত্যদের মন কিন্তু জয় করতে পারো—একটু দরদের দৃষ্টিতে দেখলেই হ'ল।

খাওয়া দাওয়া শেষ হয়ে গেল। নজোরোগের দিনের কাজ শেষ। আলো থেকে সে এগিয়ে গেল ছায়ার পর ছায়ার মধ্যে—অদৃশ্য হয়ে

গেল অন্ধকারে। মিসেস হিলের বাড়ী থেকে এগিয়ে চলল সে পায়ে চলা পথ ধ'রে—শ্রমিকদের বস্তির দিকে। পাহাড়ের নিচে চারদিকের নিস্তব্ধতা ও নিঃসঙ্গতার ঘের কাটাবার জন্যে সে শিস দিতে চেষ্টা করল। পারল না। উল্টো বরং শুনতে পেল একটা পাখীর তীক্ষ্ণ-কর্কশ চিৎকার। রাত্রে পাখীর ডাক, একটু আশ্চর্য বৈকি।

থেমে পড়ল—দাঁড়িয়ে রইল পাথরের মূর্তির মতো। কিছুই দেখা যাচ্ছে না, নিচের দিকে। কিন্তু পিছনেই মেমসাহেবের বাড়ীর প্রকাণ্ড কালো ছায়া-মূর্তিটা দৃষ্টি আটকে রাখবার মতো। ইচ্ছে করেই সে পিছনে তাকিয়ে রইল ক্রোধে! ক্রোধের বশে তার মনে হল সে বুড়ো হয়ে গেছে।

'তুমি! তুমি! এতদিন আছি তোমাকে নিয়ে। আর তুমি কিনা এখানে এনে দাঁড় করিয়েছে আমাকে!'—এই কথা এবং বুকের ভিতরে জমে-থাকা আরো অনেক অনেক কথাই সে চিৎকার করে বলতে চাইছিল ঐ বাড়ীটার উদ্দেশে।

আবার ডেকে উঠল পাখীটা। দ্বিতীয়বার।

নুজেরোগে ভাবল—'ওটা ঐ মিসেস হিলের উদ্দেশেই সাবধান-বাণী।' আবারো তার সমস্ত সত্তা ফুঁসে উঠল ক্রোধে—ক্রোধে শাদা-চামড়া ঐ যত সব বিদেশী—যারা কিনা ভগবানের দেওয়া জমি থেকে উৎখাত করেছে জমির সন্তানদেরকেই। ভগবান কি তাদের গেকুয়ু-কে দান করেননি এই সমস্ত জমি, দান করেননি তাঁকে তাঁর বংশধরেরকে চিরদিনের জন্য চিরকালের জন্যে? আর, এখন কেড়ে নেওয়া হয়েছে সেই জমিই!'

মনে পড়ছে তার বাবাকে,—এইরকম ক্রোধ ও বিদ্বেষের সময় মনে পড়ে প্রতিবারেই। সংগ্রামের সময় মারা গেছেন বাবা—ধ্বংস-হওয়া মন্দিরগুলো পুনর্নির্মাণের জন্যে সংগ্রামের সময়। সেটা ১৯২৩ খৃষ্টাব্দের বিখ্যাত নাইরোবি হত্যাকাণ্ড: পুলিশ গুলি বর্ষণ করল এক জনতার উপর। তারা দাবী জানাচ্ছিল শান্তভাবেই। যারা মারা গেল তাদের মধ্যে তার বাবাও একজন। তারপরেই তো নুজোরোগে-কে নামতে হ'ল বেঁচে থাকার লড়াইয়ে—এখান থেকে ওখানে কাজ খুঁজতে লাগল ইউরোপীয় খামারে। বহু লোককেই সে দেখেছে—কেউ কর্কশ, কেউ দয়ালু, কিন্তু সকলেই মাতব্বর ধরণের—যেটুকু মজুরী দেওয়া তারা নিজেরাই ঠিক মনে করে ঠিক সেটুকুই দেবে, তারপরে তো এই হিলদের কাজে। এখানেই যে এসে পড়ল, সে একটা অদ্ভুত যোগাযোগ। মিসেস হিলের জমিদারির বড় একটা অংশই ছিল তাদের পরিবারের,—তার বাবা নিজেই তা দেখিয়ে গেছেন। দুর্ভিক্ষের সময় তার বাবা আরো অনেকের সঙ্গে সাময়িকভাবেই সেই যে মুরাঙ্গাতে গিয়ে আশ্রয়

নিলেন তখনি বেদখল হয়ে গেল সমস্ত জমিজমা। বাবা ফিরে এসে দেখেন— নাই! (ন্‌গো'ও!) সব জমিই হাতছাড়া। বেদখল।

'ওই যে ডুমুর গাছটা দেখছিস না, মনে রাখবি ওই গণ্ডিই তোদের জমি। একটু বুঝেসুঝে সবুর করবি। এই শাদাচামড়াগুলোকে নজরে রাখবি। ওরা চলে যাবেই, তখন দখল নিতে পারবি।'

তখন তো ছিল সে বাচ্চা ছেলে। বাবার মৃত্যুর পর ন্‌জোরোগে ভুলেই গিয়েছিল সেই দাবীর কথাটা। কিন্তু ঘটনাক্রমে এখানেই এসে উঠতে মনে পড়ল সব। সব তার জানা— সব তার বুকের মধ্যে গাঁথা। সব জমির চারদিকের সীমানাটাও চেনা।

মিসেস হিলকে কখনোই পছন্দ করেনি ন্‌জোরোগে। উনি যে তাঁর শ্রমিকদের জন্যে কর্তব্য কিছুই করছেন—এই ধরণের আত্মপ্রসাদের ভাবটা অসহ্য—ন্‌জোরোগের কাছে অসহ্য। মিসেস স্মাইলস বা মিসেস হার্ডির মতো নিষ্ঠুর ধরণের লোকদের কাছেও সে কাজ করেছে। কিন্তু সে তো জানত তাদের কাছে ঠিক কোথায় আছে সে। আর মিসেস হিল! তাঁর উদারতাই যে ঠাণ্ডা করে ফেলেছে সব। ন্‌জোরোগে উপনিবেশী আগন্তুকদের ঘৃণাই করে। সবচেয়ে ঘৃণা করে—ওদের যেটাকে মনে করে সে ভণ্ডামিও আত্মপ্রসাদ। সে জানে মিসেস হিলও কোনো ব্যতিক্রম নয়। উনিও আর সবাইর মতোই। তবে কিনা জননী সাজাটা পছন্দ তাঁর। এবং এতে তাঁর এই ধারণাই গড়ে উঠল যে আর সবাইর চেয়ে তিনি সৎ।

হঠাৎ চিৎকার ছাড়ল ন্‌জোরোগে—'ঘৃণা করি, আমি ঘৃণা করি ওদের।' এতে একটা কঠিন রকমের তৃপ্তি হল। আজ রাতেই—যেভাবেই হক, মৃত্যু হবে মিসেস হিলের—হ্যাঁ, ঠিক মতো মূল্যটিই পাবেন তাঁর নকল উদারতার, তাঁর জননী-সাজার। ঠিক মূল্যটিই পাবেন তাঁর স্বজাতির বাসিন্দারা যত পাপ করেছে তারও। হ্যাঁ, উপনিবেশিক বাসিন্দাদের মোট সংখ্যায় কমতি পড়ে যাবে একটি।

ন্‌জোরোগে ফিরে এল নিজের ঘরে। কোনো শ্রমিকদের ঘর থেকেই ধুঁয়ো বেরুচ্ছে না। নিভে গেছে অনেক ঘরেরই আলো। মনে হয় ঘুমিয়ে পড়েছে কেউ কেউ, নয় তো দেশীদের জন্যে সংরক্ষিত দোকানে গেছে মদ খেতে। লণ্ঠনটা জ্বালিয়ে বসে রইল বিছানায়। ঘরটা ছোটই। বিছানায় বসে হাত বাড়ালে ধরা যায় চারদিকের দেয়াল। তবু এখানেই—এই এখানেই থাকতে হচ্ছে তার স্ত্রী ও অনেকগুলি বাচ্চাকাচ্চা নিয়ে। দুই এক বছর নয়, আছে সে পাঁচ-পাঁচটা বছর। সে কি গাদাগাদি! অথচ মিসেস হিল ভাবেন তিনি কিনা যথেষ্ট করেছেন—ঘরগুলি করে দিয়েছেন ইঁট দিয়ে।

'খুব ভালো, তাই না?' (মুজুরি, সানা, এঃ)—কথাটা জিজ্ঞেস করতে খুবই ভালোবাসেন উনি। যখনি কোনো আগন্তুক আসত তাদের তিনি ডেকে নিয়ে আসতেন পাহাড়ের কিনারায়, আঙুল দিয়ে দেখাতেন ঐ ঘরগুলো।

আত্ম-বিনোদনমূলক ঐ ধর্মভাবের জন্যেই ঠিক ঠিক মূল্য দিতে হবে মিসেস হিলকে। নুজোরোগে আবারো হাসল কঠিন হাসি। তাকে কঠিন কাজ গ্রহণ করতে হবে— জানে সে। তাকে প্রতিহিংসা গ্রহণ করতে হবে তার পিতার মৃত্যুর এবং তাদের পরিবারের জমিই বেদখল করার। তার স্ত্রীকে ও বাচ্চাদেরকে আগেই যে 'সংরক্ষিত' এলাকায় পাঠিয়ে দিয়েছে তাতে দূরদৃষ্টিরই পরিচয় দিয়েছে। নইলে তারাই হয়ে উঠত পথের বাধা. যেদিক থেকেই হক তাদেরকে তো আর বিপদের মধ্যে ঠেলে পাঠানো যায় না— যদি তাকে ঐ কাজের পরেই পালিয়ে যেতে হয়।

অন্যসব ইহাই-রা (মুক্তিযোদ্ধারা) এখনি এসে পড়তে পারে যে কোনো সময়। ওদের নিয়ে এগিয়ে যাবার কথা ওই বাড়ীটার দিকেই। বিশ্বাসঘাতকতা? হাঁ। কিন্তু তাই প্রয়োজন।

রাতের পাখীটার চিৎকার এবারে হয়ে উঠল আরো তীব্র— কানে লাগছে। ওটা একটা অশুভ সংকেত। সবসময়েই তা মৃত্যুর সূচনা করে— এখন সেটা মিসেস হিলের মৃত্যু। নুজোরোগে মিসেস হিলের কথা ভাবল। তাঁর বিষয় মনে করে দেখল। মেমসাহেবের কাছে এবং বাওয়ানার (কর্তার) কাছে থেকেছে সে দশ বৎসরের চেয়েও বেশীকাল। সে জানে মেমসাহেব ভালোই বাসতেন তাঁর স্বামীকে। এ বিষয়ে সুনিশ্চিত সে। স্বামীর মৃত্যুর কথা শুনে তাঁর স্ত্রী তো মৃত্যুই বরণ করছিলেন। সেই সময়টিতে তাঁর উপনিবেশিক সত্তাটি তো মুছেই গিয়েছিল। ঐ নিরাবরণ লগ্নটিতে মিসেস হিলের ছবিটা মনে প'ড়ে নুজোরোগের কেমন করুণাই হয়। আর তাঁর বাচ্চারা। তাদেরকে চিনত নুজোরোগে। আর সব বাচ্চাদের মতোই বড় হচ্ছিল ওরাও। তাঁর নিজের বাচ্চাদের মতোই অনেকটা। ওরা ওদের বাবামাকে ভালোবাসত, আর বাবা-মা মিসেস ও মিস্টার হিলও বড়ই ভালোবাসতেন ওদের, বড়ই দরদের চোখে দেখতেন। নুজোরোগে মনে করতে লাগল ওদের। যদিও ইংলণ্ডেই— পিতৃহীন মাতৃহীন দুটি শিশু!

আর, সহসা— সহসা—বড় তাড়াতাড়িই সে বুঝতে পারল ঐ কাজ তার পক্ষে করা সম্ভব নয়। মিসেস হিল—কেমন করে সে জানে না, হঠাৎ তার কাছে কেন্দ্রীভূত হয়ে উঠল জননীরূপে—জায়ারূপে। তার দেশের নুজোরি বা ওয়াম্বুইর মতোই—এবং সবচেয়ে বড় কথা জননীরূপে। এক মাকে তো সে খুন করতে পারে না। তার মধ্যে এই যে পরিবর্তন সেজন্যে নিজের

উপরেই কিন্তু ঘৃণা হচ্ছিল। বিচলিত সে। প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগল তার আগেকার সত্তায় গিয়ে আশ্রয় নিতে —মিসেস হিলকে একজন উপনিবেশিক রূপেই দেখতে। উপনিবেশিক—হ্যাঁ, এদেশে উড়ে এসে জুড়ে বসা? এ ভাবলে সবি সোজা হয়ে যায়। কারণ নুজোরোগে ঘৃণা করে সব উপনিবেশিকদেরকেই সমস্ত ইয়োরোপীয়দেরকেই। এবং এই দৃষ্টিতেই যদি সে দেখতে' পারত মিসেস হিলকে (অনেক অনেক শ্বেতাঙ্গ বা উপনিবেশিকদের মধ্যে একজন রূপে), তখন সে কাজটা করতে পারত ঠিকই। এবং বিবেকের দংশন ছাড়াই। কিন্তু সে তো কিছুতেই ফিরিয়ে আনতে পারছে না সত্তার সেই অংশকে। অন্তত এখন তো নয়। এইভাবে তো কখনোই সে ভেবে দেখেনি মিসেস হিলকে। এই এখনকার আগে পর্যন্ত নয়। অথচ সে জানে ঐ মিসেস হিল তো সেই একই লোক—কালও থাকবেন ঠিক তেমনি সেই উৎসাহদাত্রী এক আত্মতৃপ্তা মহিলা। আর এবার সে বুঝল সে দুভাগ হয়ে আছে—সম্ভবত তেমনটাই থাকবেও চিরকাল। কারণ, এখন এমনকি এটাও তার মনে হল এই দশবৎসর-ব্যাপী সম্পর্কের বন্ধনটাকে হঠাৎ ছিঁড়ে ফেলাটা তার পক্ষে অসম্ভব —হক না এতগুলো বছর তার জীবনে যন্ত্রণার ও লজ্জার। সে প্রার্থনা করতে লাগল, কামনার মতোই বলতে লাগল—না, কখনোই কোনো অন্যায় অবিচার হয়নি। তাই এখানকার এই বিরোধও দেখা দেয়নি—শাদা ও কালোর মধ্যে এই বিরোধ।···

এখন সে কী করবে? সে কি ছেলেদের—মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতারণা করবে। বসে রইল সে—অস্থির মন, স্থির করতে পারছে না কর্তব্য। মানবিক দৃষ্টিতে সে যদি মিসেস হিলকে না দেখত! সে যে উপনিবেশবাসীদেরকে ঘৃণা করে সেটা তো মনের মধ্যের স্পষ্ট ব্যাপার। কিন্তু তাই বলে দু'দুটি সন্তানের মাকে খুন করাটা তো এক যন্ত্রণাদায়ক দায়িত্ব—সুস্থ ও মুক্ত মনে কি তা করা যায়? বাইরে বেরিয়ে পড়ল।

এখনো তার চারদিকে অন্ধকার। কিছুই দেখা যাচ্ছে না স্পষ্ট। মাথার উপরে তারাদল উদ্বিগ্ন, তাকিয়ে আছে ঃ নুজোরোগের দিকে তাদের স্থির দৃষ্টিই যেন তাকে ঠেলে পাঠাল, এবং সেও চলতে লাগল—চলতে লাগল মিসেস হিলের বাড়ীর দিকে। এখন তার স্থির সিদ্ধান্ত ঃ প্রথমে মিসেস হিলকে বাঁচাতেই হবে। তারপরেই সে ঢুকে পড়বে বনের মধ্যে। সেখানে থেকেই সে লড়াই চালিয়ে যেতে পারবে মুক্ত বিবেক নিয়ে। হ্যাঁ, সেটাই হবে চমৎকার। ছেলেদের—ঐ মুক্তিযোদ্ধাদেরকে প্রতারণা করার ব্যাপারে এটাই হবে ক্ষমা পাওয়ার মতো কাজ।

এখন তার সময় নষ্ট করার সময় নয়। এর মধ্যেই দেরী হয়ে গেছে খুব, ছেলেরা এসে পড়তে পারে যে কোনো মুহূর্তে। এখন একটিমাত্রই উদ্দেশ্য

—ঐ স্ত্রীলোকটির প্রাণ বাঁচানো। পথে কানে এল পায়ের শব্দ। পাশেই ঢুকে পড়ল ঝোপের মধ্যে নিশ্চল নিঃশব্দ। ওরা যে সেই ছেলেরা সেটা নিশ্চিত। পায়ের শব্দ মিলিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে লাগল, যেন দমবন্ধ ক'রে। প্রতারণাটার জন্যে আবারো ঘৃণা হল তার নিজের উপরেই। কিন্তু তার বিবেক যে অন্যরকম নির্দেশ দিচ্ছে কী করে তা সে না শুনে পারে? পায়ের শব্দগুলি মিলিয়ে যেতেই দৌড়োতে লাগল। দৌড়োনোটাই দরকার, কারণ 'ছেলেরা' যদি তার বিশ্বাসঘাতকতার কথা জানতে পারে তো তাকে খুন করবেই। কিন্তু এরপরে যদি সেটাই হয় তো কিছুই ভাববার নেই তার। এখন সে তো প্রথম কর্তব্যটাই সমাধা করতে চায়।

ঘামতে ঘামতে আর হাঁপাতে হাঁপাতে শেষপর্যন্ত এসে পড়ল মিসেস হিলের বাড়ীতে—দরজায় ধাক্কা মারতে মারতে চেঁচিয়ে উঠল—'মেমসাহিব, মেমসাহিব!'

মিসেস হিল তখনো শুতে যাননি। বসে আছেন, হাজারো রকম ভাবনা ঘুরছে তাঁর মনের ভিতর। ঐ মহিলাদের সঙ্গে বিকেলবেলার সেই কথাবার্তার পরে ক্রমেই তাঁর অস্বস্তি বোধ হচ্ছিল। নজোরোগে চলে যাবার পর তিনি তাঁর সংরক্ষিত বাক্সটা থেকে বার করে এনেছিলেন রিভলভারটা—হাতে নিয়ে এখন খেলা করছেন। প্রস্তুত থাকাটা নিশ্চয়ই ভালো। দুর্ভাগ্য, স্বামী বেঁচে নেই। এখন কাছে থাকতে পারত।

বার বার দীর্ঘশ্বাস পড়ে—সেই প্রথম যুগের সুন্দর দিনগুলির কথা ভেবে ভেবে। তিনি আর তাঁর স্বামী মিলে পোষ মানিয়েছেন এই বুনো দেশকে, তৈরী করে তুলেছেন বিরাটাকার এই পতিত জমি। উপজাতীয় যুদ্ধের ভাবনা-চিন্তা নেই,—নজোরোগের মতো লোকেরা কেমন সুখে আছে এখন। ইউরোপীয়দের ধন্যবাদ জানাবার মতো এমন অনেক কিছুই তো আছে। তা, এই কঠোর শ্রমী এবং বাধ্য লোকদেরকেই যেসব রাজনৈতিক নেতারা বিকৃত করে তুলছে—না, তাদের তিনি পছন্দ করেন না। একটু দয়ায় চোখে দেখলেই তো ওরা কেমন শান্ত থাকে। এই যে গার্সটনেরা খুন হল—না, না, এটা তাঁর ভালো লাগেনি। এবার ভেবে দেখলেন—কার্যত তিনিও তো এখন একা, এখনি তো নাইরোবি বা কিনাঙ্গপ গিয়ে কিছুদিন থাকাটা উচিত ছিল বন্ধুদের সঙ্গে। কিন্তু শ্রমিকদের তখন কী হ'ত? তাদের এখানেই ফেলে রেখে যেতেন? তাই তো, কী করা যেত আর। এবার ভাবতে লাগলেন নজোরোগের কথা। লোকটা অদ্ভুত। ওর কি অনেকগুলি বৌ আছে? পরিবারটা খুবি বড়ো? এটা ভেবে খুবি অবাক হলেন—এতদিন ধরে লোকটাকে নিয়ে আছেন, অথচ এসব কথা আগে ভাবেনই নি কখনো। এই নতুন আবিষ্কারে আহতই হলেন কিছুটা। ও তো একটা পরিববারেরই একজন

—কথাটা এই প্রথমই তাঁর মনে স্থান পেল। সবসময়েই ওকে দেখছেন কেবল গৃহভৃত্যরূপে। এখনো তো তাঁর নিজের কাছেই হাস্যকর মনে হচ্ছে—ঐ চাকরটিই কিনা একজন পিতা এবং স্বামী! দীর্ঘশ্বাস পড়ে। এটা একটা ব্যতিক্রমের মুহূর্ত। ভবিষ্যতে এটা তাঁর সংশোধন করা দরকার।

এই সময়েই তিনি সামনের দরজায় শুনতে পেলেন জোর ঠকঠক শব্দ এবং 'মেমসাহিব, মেমসাহিব' ডাক।

হ্যাঁ, ওটা তো নজোরোগের গলা। তাঁরই গৃহভৃত্যের! ঘেমে উঠল সারা মুখ। গার্সটোনদের মৃত্যু যে ভাবে হয়েছিল সেই ঘটনাটা তাঁকে এমনভাবে আচ্ছন্ন করে ফেলল যে তিনি শুনতেই পেলেন না কী বলছে ও। এবারে তাঁর শেষ সময় উপস্থিত। তাহলে নজোরোগেই তাঁকে নিয়ে এল—এই পর্যন্ত! কাঁপতে লাগলেন মিসেস হিল—কেমন দুর্বল হয়ে পড়ছেন।

কিন্তু হঠাৎই শক্তি ফিরে পেলেন। জানেন, তিনি একা। জানেন, এখনি ওরা দরজা ভেঙ্গে ঢুকে পড়বে। না। বীরনারীর মতোই মরবেন। হাতের পিস্তলটা আরো শক্ত করে ধ'রে—দরজাটা খুলেই গুলি করলেন। তারপরে কেমন একটা অস্থির আতঙ্ক। একটা মানুষকে খুন করলেন—এবং এই প্রথম। সমস্ত শরীর কাঁপছে, পড়ে যেতে যেতে চিৎকার করে উঠলেন—'আমাকে খুন করো।' তবু তিনি তো জানেন না খুন করেছেন তাঁর রক্ষককেই।

পরের দিনই সমস্ত পত্র-পত্রিকায় বেরিয়ে গেল খবরটা : একটি মহিলা একাই পঞ্চাশটা ডাকাতের একটা বাহিনীর বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া সংগ্রাম করিয়াছেন—এহেন সৎসাহসের কাহিনী কেহ কখনো শোনে নাই, এবং ভাবুন ঐ বীরনারী এমন কি একজনকে স্বহস্তেই হত্যা করিয়াছেন!

বিশেষ করে মিসেস স্মাইলস এবং মিসেস হার্ডিই অভিনন্দনে হয়ে উঠলেন পঞ্চমুখ।

'আমরা আগেই বলিনি—ওদের প্রত্যেটাই বদ।'

'ওদের প্রত্যেকটাই বদ।'—সায় দেন মিসেস হার্ডি। চুপ করে আছেন মিসেস হিল। যে পরিস্থিতিতে মৃত্যু হয়েছে তা তাকে বিব্রতই করে তুলেছে। ঘটনাটা নিয়ে যতই ভাবছেন ততই মনে হচ্ছে এটা একটা দুর্বোধ কিছু। তখনো তিনি চেয়ে আছেন বাইরের দিকে। তার পরে ধীরে ধীরে ফেললেন এক হেঁয়ালি ধরণের দীর্ঘশ্বাস! বললেন—'আমি জানি না।'

'জানি না?'—মিসেস হার্ডির জিজ্ঞাসা।

'হ্যাঁ ঠিকই।'—মিসেস স্মাইলসের এবার বিজয়িনী মূর্তি—'ওদের প্রত্যেকেই চাবকানো উচিত।'

'ওদের প্রত্যেককেই চাবকানো উচিত।'—সায় দেন মিসেস হার্ডি।

লেখক : লিওনার্ড কাইবেরা ও স্যামুয়েল কাহিগা

কাইবেরা ও কাহিগা—তরুণ এই দুই ভাই পূর্ব-আফ্রিকার প্রিয় গল্পকার। দুজনেই বাল্যকাল থেকে বড়ো হয়ে উঠেছেন একসঙ্গে—কেনিয়ার রাজনৈতিক ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ আবহাওয়ায়। তাই তখনকার বাস্তব চিত্র ও চরিত্র জ্যান্ত হয়ে দেখা দিতে পেরেছে এঁদের প্রাণবন্ত রচনায়।

মুক্তিযোদ্ধা কি হোমগার্ড—যারাই চিত্রিত হয়েছে জ্যান্ত হয়ে উঠেছে গোটা মানুষরূপেই—পুতুল হয়ে নয়। তাই জীবনের আবেগ ও অনুভব, আশা ও আশংকা দেখা দিয়েছে অতিরঞ্জিত না হয়ে। দেশের মানুষের দুর্দিনে লেখকেরা প্রতিষ্ঠিত করেছেন তাদের নৈতিক চরিত্রের গুরুত্বই, তুলে ধরেছেন জাতীয় ঐতিহ্য।

দুই ভাইর যুক্ত নামে লিখিত গ্রন্থ 'Potent ash' (নির্বীজ ভস্ম) কেবল পূর্ব-আফ্রিকার তথা কেনিয়ারই নয়—সমগ্র আফ্রিকার গল্পসাহিত্যেই একটি উজ্জ্বল সংযোজন। আফ্রিকার এই শ্রেষ্ঠগল্পগ্রন্থে সানন্দেই গ্রহণ করেছি ঐ গ্রন্থেরই একটি গল্প। বিচ্যুতি সত্ত্বেও নামকরণের নতুন প্রয়োজন-বোধে এই গ্রন্থে গল্পটির নাম হয়েছে 'বিশ্বাসঘাতক'। এই শব্দটিই গল্পটিতে বারম্বার জনতার মুখে উচ্চারিত হয়েছে, এবং তার প্রতিধ্বনি জেগে উঠেছে বিশেষার্থেই কিংবা ব্যঙ্গার্থেও।

॥ বিশ্বাসঘাতক ॥

সেই শনিবার সকাল থেকে সব সময়েই ভাবছি—তা, আমি তো পরপীড়ণ দেখে সুখ উপভোগ করার মতো লোক নই। রক্তপাত স্বচক্ষে দেখার চেয়ে আমি যে বিছানায় থেকেই এককাপ কফি পানই বেশী পছন্দ করি, তাও স্বীকার করছি। কিন্তু সেদিন ভোরে উঠে পড়েছি অন্যদিনের চেয়ে আগে। সকলেই উঠে পড়েছে আগে আগে। গোটা শহরটাই উঠেছে অন্যদিনের চেয়ে আগে।

সেদিনকার আবহাওয়াই ছিল একটা নতুন-কিছু—যা সকলকেই ঠেলে দিচ্ছিল একটা সর্বসাধারণের আগ্রহ-উদ্দীপক ঘটনার দিকে। সকলেই তার অংশ নেবার জন্যে উঠে পড়েছে সকাল সাড়ে ছটার মতো অসময়ে। ভোরের

সূর্য আমার শোবার ঘরের জানালার পর্দাটার মধ্য দিয়ে ঢুকিয়ে দিয়েছে আলোর ঝকমকে নখগুলো, একটা অশুভ উষ্ণতা আমাকে যেন বার বার ডাক দিচ্ছে বাইরে আসতে···

কিন্তু ব্যাপারটা কি, ঐ যে ওরা দল বেঁধে চলেছে—কেন? শাসকবৃন্দের মর্জি মতোই মন মিলিয়ে থাকলে এমন কি দোষ হয়? ঐ অভিযুক্ত লোকটার কি মৃত্যু হওয়াটাই উচিত নয়?

সাজ-পোশাক করে বাইরে ছুটে এলাম তাড়াতাড়ি। মাইলখানেক দূরে হত্যা-স্থানটার দিকে এগোতে এগোতে আমি কেবলি লক্ষ্য করছিলাম আকাশে বাতাসে কেমন একট ভারী ভারী ভাব। দুএকবার তো ঘাড় উঁচিয়ে ঝাঁকুনিই মারছিলাম দেহটাকে—ঠিক সার্কাসের হাতীর মতোই একটু হালকা হবার জন্যে। 'বিশ্বাসঘাতক, বিশ্বাসঘাতকা!'—জনতার চিৎকার। পরিষ্কার সকালবেলা, বিষয়টাও পরিষ্কার। সবকিছুই মনে হল—হ্যাঁ ঠিকই মনে হচ্ছিল ছিমছাম যথাযথ নিয়ম-শৃঙ্খলার মর্যাদাপূর্ণ। হালকা মন আকাশে এক টুকরো মেঘের দাগও নাই। চতুর্দিক যেন সমবেত হয়ে সমস্বরেই বলে উঠছে—'বিশ্বাসঘাতক, ঐ যে বিশ্বাসঘাতক।'

কেবলমাত্র হাওয়াই যা ভারী ঠেকছিল।

এখানে ওখানে নানা ধরণের মুখ! কালো, সাদা, বাদামী—গোটা মানবজাতিই যেন একত্র হয়ে জলযোগ করতে এসেছে এই সকালে। সকলেই তাই এগিয়ে চলেছে ঠেলাঠেলি করতে করতে, ঘাড় উঁচু করে করে দেখছে কী এক অদ্ভুত আবেগে। ঢুলুঢুলু-চোখ সৈনিকেরা আমাদের ঠেকিয়ে রাখছে দূরে অর্ধবৃত্তাকারে একটা দড়ির ঘেরের মধ্যে—অর্থাৎ আমাদের গতিবিধির ওই শেষ-সীমার মধ্যে জড়ো হয়ে আছি। উপর থেকে আকাশটা আমাদের দেখছে নিশ্চয়ই—দেখছে পাগলা উল্লাসে বন্দী একটা অর্ধবৃত্তাকার ঘেরকে।

'দারুণ দৃশ্যটা! হ্যাঁ হ্যাঁ, ফাঁসিতে লটকাও সমস্ত বিশ্বাসঘাতকদের!'—আমার পাশেই একটা লোক উল্লাসে বলে উঠল, হলুদে রঙ্ দাঁতগুলি বার করে যেন খেঁকিয়ে উঠল। মুখখানা কুঁচকে তুলে সে মুখের অল্প-অল্প দাড়ি চুলকোতে লাগল। 'দেখেছেন কখনো এমন এক তাজ্জব লাগানো জনতা? মজার ব্যাপার হল···ওকি, আপনার আবার কি হল? আপনারই বন্ধু নাকি?'

আমি বললাম—'না, আমার বন্ধু নয়। সকাল বেলায় কেবল কথা বলে চলাটা আমার পছন্দ নয়।' তাই মাফ চাইলাম। কিন্তু আমার এই নতুন সঙ্গীটি আমার ব্যাপারে হতাশ হয়ে 'নেড়ীর নাকী কান্না' জাতীয় কিছু-একটা বিড়বিড় করে বলতে বলতে সরে গেল অন্যদিকে···শুনলাম ওর খেঁকানি আর গজগজানি পিছনেই আর একটি লোকের কাছে—অর্থাৎ কিনা ঐ সাগ্রহ

সংবাদ পরিবেশন। লোকটিও এক গাল হেসে ময়লা কতকগুলো দাগধরা মাড়ির দাঁত বার করে তার এই নতুন বন্ধুটির কাঁধটায় ঝাঁকুনি মেরে গলা চড়িয়ে বলে উঠল—'সত্যিই চমৎকার দৃশ্য বটে।'

'বিশ্বাসঘাতক, বিশ্বাসঘাতক!'—গর্জে উঠছে জনতা। যেন ওই কথারই প্রতিধ্বনি। আশ্চর্য ঐক্য।

উঁচুমতো জায়গায় তখন দেখতে পেলাম খুঁটির সঙ্গে বাঁধা রয়েছে একজন লোক—মৃত্যুর জন্যে অপেক্ষা করছে এক আসামী। আমাদের অর্ধবৃত্তাকার স্থানটা থেকে একটুখানি উঁচুতে থাকবার জন্যেই আমরা দেখতে পাচ্ছি: ঐ লোকটি দাঁড়িয়ে আছে—বীরের মতোই বুক উঁচু ক'রে—সূর্যোদয়ের মুখোমুখী। মুখে তার ঘৃণা-জড়ানো মৃদু হাসি। ঐ হাসি আমাকে কেমন দুর্বল করে ফেলল—কেমন যেন বিব্রতও। যেন, যে কোনো মুহূর্তেই সে শৃঙ্খল ছিঁড়ে ফেলেই ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে আমাদেরি উপর··মনেপ্রাণে চাইছিলাম—বিছানায় থাকলেই ভালো হত। কিন্তু আমার সেই সঙ্গীটির দাড়ি গজানো মুখখানা হঠাৎ চোখ পড়তেই—সত্যিই বলছি, আমি দেখছি: সে দাঁত বার করে হাসছে, হাসতে-হাসতেই দেখছে ওই বন্দীকে। আর আমার তখন এটাও মনে হল ঐ আসামী লোকটা যদি আমাদের উপর এসে পড়ে তো আমি রক্ষা পেয়ে যাব ঠিকই। তবে, আমি বন্দীর ওই মৃদুহাসির খেলাটা সহ্যই করতে পারছিলাম না—কারণ ওটা আমাকে বড়ই ছোট করে ফেলছিল। আমরা কি শিকারী কুকুর যে ঐরকম ঘৃণাভরে তাকাবে আমাদের দিকে?

তখন আটটা বেজে গেছে। আমরাও অবাক হয়ে যাচ্ছি। এখনো তো এসে পৌঁছল না গুলী-করার নির্দিষ্ট সেনাদল—ফায়ারিং স্কোয়াড? কেবল পুলিশেরা ও সৈনিকেরা এখন দাঁড়িয়ে গেছে একত্র—একাকার, যেমনটা বড় একটা দেখাই যায় না। একসঙ্গেই দেখাশোনা করছে—আমরা যেন ঐ উত্তেজনা বেঁধে-রাখা দড়িটা ছাড়িয়ে ডানদিকে না যাই। সূর্য আরো উপরে উঠছে ক্রমেই, আর আমরাও ঘেমে উঠছি খুব। মেজাজও গরম হয়ে উঠছে সবার—তাই আরো জোর গর্জন উঠছে—'বিশ্বাসঘাতক, বিশ্বাসঘাতক!' আরো জোর জ্বলছে পেটের খিদেও। আর, অভিযুক্ত বন্দীটি আরো যেন তৃপ্তিকর ভঙ্গীতেই হাসছে এখন। গুলি-করার দলটা সম্ভবত ইচ্ছে করেই দেরীতে আসছে—যখন এসে হাজির হবে তখন গরমে আমাদের সবকিছুই যেন পৌঁছে যায় চরম অবস্থায়, এবং ঘটনাটা নিয়ে গালগল্প চলতে থাকে সারাটা শহরে—গালগল্প চলতে থাকে সপ্তাহের পর সপ্তাহ। আফ্রিকায় সুস্পষ্ট সূর্যোদয়ই কিন্তু মেঘহীন দিনের আগাম পরিচয় বহন করে না। ঐ শনিবারের সন্ধ্যায়ও হল তাই। এখানে ওখানে দেখা দিল টুকরো মেঘ···

···লোকটা কেন যে মরে যাচ্ছে সে বিষয়ে সব ভাবভাবনাই তাড়িয়ে দিয়েছে আমাদের দৃশ্য দেখার সাধ—রক্তের স্বাদ। এবং আমরা অন্যকিছু ভাববার মতো সন্দেহ থেকেও মুক্ত।

'বিশ্বাসঘাতক, বিশ্বাসঘাতক!'—জনতার সেই তরঙ্গিত ধ্বনি—ছন্দিত আওয়াজ।

'আইসক্রিম!'—ফেরিওয়ালার চিৎকার।

'কোকা কোলা!'—ডাকছে আর একজন। একদিকে ব্যবসা, আর তার মধ্যেই ওদিকে পকেটমারের কেরামতি।

আমার দাড়ি-গজানো সঙ্গীটি—আমার প্রসঙ্গে তার বিরূপ ধারণাটা ইতিমধ্যেই খানিকটা সংশোধন করে নিয়েছে—সে হাত দিয়ে মুখের ঘাম মুছে হো হো হেসে উঠল···সেও আমি একটা আইসক্রিম ভাগাভাগি করে খেলাম।

দুপুর নাগাদ পুলিশ ও সেনাবাহিনী একযোগে শারীরিক বলের সাহায্যে আমাদের ঠেলে দিতে দিতেই অনুরোধ করছিল সরে যেতে।

আমি এবার গুণে গুণে দেখলাম গুলি-করার দল এসে উপস্থিত—সংখ্যায় বারো, উল্লাসে উন্মাদ জনতার অর্ধবৃত্ত ভেদ করে গেল।

'এ্যাটেনশন্!'—ভারপ্রাপ্ত অফিসারের জ্যান্ত চিৎকার। বুকে বুকে উথলে উঠছে রক্তের জোয়ার।

মিনিট দশেক আমরা যেন স্বেচ্ছায়ই সম্মোহিত। আমরা উদগ্রীব দর্শকেরা—গায়ে গা দাঁড়িয়ে আছি চরমটারই প্রতীক্ষায়, কিংবা স্বস্তিলাভের জন্যেই?

আর তখন আমাদের মধ্যেরই কোথাও থেকে কেঁদে উঠল ছোট্ট একটি মেয়ে। দড়িটার তলা দিয়ে নিচু হয়েই সে ছুটে গেল ভারপ্রাপ্ত অফিসারের দিকে—দুহাতে ধরে আছে একটি পুষ্পস্তবক। আটকে দিচ্ছিল এক সৈনিক। অফিসারটি তলোয়ার উঁচিয়ে কঠিনভাবে দাঁড়িয়েছিল,—মেয়েটিকে আসতে দিতে কিংবা ঐরকমের কিছু একটা বলল। দূরে ছিলাম বলে ঠিক ঠিক শুনতে পাইনি কথাটা। ছোট্ট মেয়েটি ঐ বন্দীর দিকে যেতে দ্বিধা করছিল। ধীর স্থির মুহূর্ত খানেক, তারপর ওই বীরমূর্তির দিকে মুখ তুলে চেয়ে রইল।

বন্দীটি ঠিক নিচের দিকে তাকাচ্ছিল না। মনে হল সে যেন রূপান্তরিত হচ্ছিল এক যাদুশক্তির দ্বারা। শেষ পর্যন্ত মেয়েটিকে কাছে দেখতে পেল—দুই হাতে ফুল। মিলিয়ে গেল তার মুখের ঘৃণার হাসি। স্পষ্টতই দেখতে পাচ্ছি সে অভিভূত হয়ে পড়ছে। আমাদের মনে হল সে যেন মেয়েটিকে বলল—ফুলগুলি তার পায়ের কাছে রাখতে। এবং একমাত্র এবারেই সে মাথাটা নোয়াল। আমি অনেকটা দূরে থাকলেও স্পষ্টই দেখলাম এবং

নিঃসন্দেহেই বুঝলাম—ঐ হাসি হল আমাদের কঠিন হৃদয়ের উপরেই একটা পর্দা—একটা আবরণ। বন্দীটি কাঁদতে লাগল। কৃতজ্ঞতায়? না, দুঃখে? আমি জানি না। তবে এটুকু আমি বলতে পারি ওই ছোট্ট মেয়েটি চোখ মুছতে মুছতে যখন ফিরে আসছিল, তখন আমাদের সকলের মধ্যেই সঞ্চারিত হল—পবিত্র কোনো একটা ভাব। আমাদের হৃদয় তা স্পর্শ করল এবং ভারী হয়ে উঠল আমাদের বুকের মধ্যটা। ঠিক শেষবিচারের সময় হয় যেমনটা।

মেয়েরা রুমাল বার করতে লাগল কান্না চাপা দেবার জন্যে। আমরা যারা পুরুষ—বুকে যারা সাহস রাখি আমাদেরও মাথা নত হয়ে গেল একই সঙ্গে। আমরা দাঁড়ালাম আরো ঘন হয়ে। লজ্জায়? তা আমি বলতে পারব না, তবে আমি চলে যেতে লাগলাম—পিছিয়ে চললাম—বাড়ীর দিকে। ল্যাজ গুটিয়েই চলেছি দুই পায়ের মধ্যে।

আমার পিছনেই সেই দাড়ি-গজানো লোকটাও ভেগে পড়ছে। আমার উদ্দেশে কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু সন্দেহ হ'ল (সন্দেহটা ঠিকই) আমি জবাব দেব না, তাই দাড়ি চুলকোতে লাগল—কী যেন ভাবতে লাগল। হ্যাঁ সমস্তটাই কেমন যেন শিরশির করার মতো। সম্ভবত সেও চরম মুহূর্তটি পর্যন্ত অপেক্ষা করতে চাইছিল না। হতে পারে তারও বুকের মধ্যের সবচেয়ে নরম জায়গায়ই বেজেছে। কিন্তু বেশীদূরে আমি তখনো পালিয়ে যেতে পারিনি। গুলির শব্দ শুনলাম পর-পর কয়েকবার,—ঠিক সময়মতো মোড় ফিরেই অংশ গ্রহণ করলাম সেই ভয়ঙ্কর ঘটনার চরম নাটকীয় মুহূর্তটিতে। তারপরেই বুঝতে পারছি আমরা—পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে আছি।

হ্যাঁ, এটা দেখতেই তো আমরা এসেছিলাম : একদিকে ধুঁয়ো, অন্যদিকে রক্ত ও ধুলো।

আমরা আলিঙ্গন থেকে ছাড়াছাড়ি হলাম—বলা যায় খানিকটা হাস্যকর ভাবেই। এবং সে চলে গেল অন্য আর এক দিকে—নিশ্চয়ই বেশ একটা জোরালো রকম ভুরিভোজের উদ্দেশ্যে।

লেখিকা ঃ বেসি হেড

লেখিকা দক্ষিণ আফ্রিকায় জন্মেছিলেন ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে, কিন্তু সেখান থেকে নির্বাসিত হবার পরে তাঁর নবজন্মস্থান হ'ল বৎসোয়ানা।

উপন্যাস ও গল্প রচনার জন্যে ইনি আফ্রিকার লেখক গ্রন্থমালার একজন প্রিয় লেখিকা। এ'র তিনখানি উপন্যাসের আশ্রয় হল বৎসোয়ানা। উপন্যাসগুলি হল 'বর্ষার মেঘ যখন ঘনিয়ে আসে,' 'প্রতাপের প্রশ্ন,' এবং 'মারু'। এ'র উপন্যাসের সমালোচনায় বিখ্যাত পত্রিকা সানডে টাইমস লিখেছে—'এই মহিলার উপন্যাসে জীবনটা পাথুরে ভিত্তি থেকে উঠে যায় আকাশের নক্ষত্রলোকে, এমনি এক রীতিতেই তা লেখা। এবং পাঠককে তা বিচলিত করে।'

বামঙ্গোয়াটো রাজ্যের অর্থাৎ লেখিকার স্বভূমির জীবনে প্রাচীন ও নবীনের মূল্যবোধের—তার দ্বন্দ্বের ও ভাঙ্গনের অনেক কথাই লেখিকা তুলে ধরেছেন তাঁর গল্পে। এই কিশোর শ্রেষ্ঠগল্প সংগ্রহে তেমন একটি বিষয়েই আলোকপাত করা হয়েছে। গল্পটি নির্বাচন করা হয়েছে লেখিকার গল্পগ্রন্থ A collection of treasures থেকে।

॥ একটি বিয়ে প্রসঙ্গে কিছু আলোকপাত ॥

বিয়ের দিনটা সব সময়েই শুরু হয় ঠিক ঊষাকালের লোকাতীত এক মায়ালগ্নে—দিগন্তে সবে তখন উঁকিঝুঁকি মারে অস্ফুট আলো। যারা ইতিমধ্যেই জেগে উঠেছে একটু সময় নিচ্ছে দিনের আলোতে পার্থিব জীবনের সঙ্গে মিল মেলাতে। জলের ঢেউয়ের মতোই কাঁপতে কাঁপতে মিলিয়ে যাচ্ছে রাতের হিম-শীতল আঁধার। এই লোকাতীত সময়টিতেই শয্যাত্যাগ ক'রে যারা বেরিয়ে পড়েছে তাদেরও অস্পষ্ট দেখাচ্ছে ছায়ার মতোই—যেন জলছবিতে ধীরে ধীরে দুলে দুলে চলেছে কতকগুলি দেহ। ঐ অস্ফুট আলোকেই বরপক্ষের চারজন—সবাই বর কেগোলো'টাইলেরই ঘনিষ্ঠ আত্মীয়—সামনে একটা ষাঁড়কে আস্তে আস্তে চালিয়ে নিয়ে এগিয়ে চলেছে ম্মাখুভুর বাড়ীর দিকে—সেখানেই থাকে কনে নিয়ো। ষাঁড়টা ঘটনাক্রমে হঠাৎ ডেকে উঠল তার

প্রভাতী হাইতোলার ডাক। আসলে ঐ মুখটা তো জানে না যে এবার ঘনিয়ে আসছে তার সবাইর কাল, এবং তারি মাংস কাজে লাগছে বিয়ের ভোজে। ঐ ডাক শোনামাত্রই মেয়েদের মুখে মুখে বেজে উঠল কী সুন্দর উলু লুলু ধ্বনি হাওয়ায় হাওয়ায় দুলে দুলে অবিরাম ছড়িয়ে পড়তে লাগল—শিলার উপরে স্বচ্ছ কলস্রোতের ফেনোচ্ছল সঙ্গীতের মতো। উলু লুলু আওয়াজ করতে করতেই মেয়েরা আঙ্গিনায় সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে পড়ল—শুরু করল বিয়ের নাচ। মাঝে মাঝে তারা নুয়ে পড়ে পড়ে পাছা দোলাচ্ছিল উঁচুর দিকে। বরের ঐ চার আত্মীয় এসে ষাঁড়টা বিয়ের ভেট হিসাবে দিয়ে দিতে গিয়ে ওদেরি একজন একটু ঠাট্টা করে বলল—'এই বিয়েটা হতে যাচ্ছে—যাকে বলে কিনা আধুনিক!' অর্থাৎ কিনা সে বলতে চাইছে এই বিবাহোৎসবের ব্যাপারে বাদ পড়ছে প্রথামতো অনেক কিছুই। সারাটা রাতভোর জেগে থেকে প্রথামতোই তৈরী করেনি ভিফিরি—মাংসের কিমার সঙ্গে মিশিয়ে একরকমের বিয়ের পিঠে। বর বলেছে সে গির্জায় বিশ্বাস রাখে না—এসব ব্যাপারে তার কোনো উৎসাহও নাই; কনে যে মা হতে যাচ্ছে সেটাও সে কিনা জাহির করে বেড়াচ্ছে—আর সেজন্যেই আইনানুগ বিয়েটাও হতে যাচ্ছে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এবং সেটা পুলিশের তাবুতেই।

'আহা, আমরা সবি করছি—আমাদেরি মতো!'—কনেপক্ষের একজন মেয়েছেলেও ঠাট্টা কাটে পাল্টারকম—'সময় যখন বদলেই যাচ্ছে আমরাও আর পিছিয়ে থাকব কেন?'—এই বলেই সে ঘুরতে লাগল উলুধ্বনি দিতে-দিতে খোশমেজাজে।

যখনি কোথাও বিয়ের অনুষ্ঠান হয় সরগরম বিয়ে বাড়িতে হৈ চৈ গালগপ্পো চলে সে কী দারুণ! কিন্তু এবার এই নিয়োর আত্মীয়স্বজনেরা নিজেদের ব্যাপারে মুখে কুলুপ এঁটে রাখল—গোপন প্রসঙ্গে টুঁ শব্দটিও নয়। সবাই তো মেয়েটাকে পার করতে পারলেই বাঁচে—এ একটা অসম্ভব মেয়ে: যেমন দেমাকী তেমনি বেয়াড়া। তার পরিবারের এবং আত্মীয়স্বজনের মধ্যে একমাত্র এই মেয়েটিই বিয়ের আগেই পুরুষের সঙ্গে থেকেছে, এবং সেটা কিনা গোপন রাখাও প্রয়োজন মনে করে না। নাক উঁচিয়ে ঘুরে বেড়ায়, যেন অশিক্ষিত আত্মীয়েরা সমীহ করে কথা বলার যোগ্যই নয়। কথা বলে তো বেশ কায়দা ক'রে—ঘাড়টা একটুখানি কাৎ করেই মুচকি হাসে মনে মনে। আবার কথা বলে তো মনে হয় হয় ঠিক যেন অপমান করছে! হাত দুখনা বাড়িয়ে দেয়, হাতের পাতা মেলে ধরে, এবং সঙ্গে সঙ্গেই হাত নামিয়ে ফেলে হাসতে হাসতে। এবং এমন একখানা ভাব করে, স্পষ্টই যেন বলে—'ও তুমি?' একমাত্র তার মা-ই শিক্ষিতা এই মেয়ের ব্যাপারে একেবারেই মুগ্ধ। নিজেদের

বাড়ীতে নিয়ো তো সবারি সেবা পায়। তবে, তাদের বাড়ির বাইরে চলে নানা ধরণের কুৎসিত টিকাটিপ্পনী। লোকজন হাড়ে হাড়ে চটা ওর চালাবাজি আর দেমাকের ব্যাপারে।

'মেয়েটার কোনো ভব্যতা সভ্যতা নেই।'—আত্মীয়স্বজন টিপ্পনী কাটে—'কারো জন্যেই কোনো সমীহ বোধ থাকবে না এমন দুর্বুদ্ধিই যদি মাথায় ঢুকে থাকে তো লেখাপড়া করে লাভটা কী? না, না, ও আবার একটা মানুষ নাকি?'

আর তারপর তারা এক ভয়ানক ভবিষ্যদ্বাণীর মতোই মাথা নাড়তে নাড়তে বলতে থাকে—একদিন ওর সর্বনাশ হবেই। ও হাতে-নাতে শিক্ষা পাবে। কার্যত কিন্তু নিয়োর বেশ ভালোই কেটেছে এতদিন। ইস্কুলের সাধারণ শিক্ষাটুকু শেষ করার দুমাস যেতে না যেতেই কেগোলেটাইলের প্রথম সন্তান এসেছে ওর পেটে। আর কিছুদিন যেতে না যেতেই এটাও জানা গেল যে মাথাটা নামের আর একটি মেয়েও সন্তান-সম্ভাবা, সেও ওই কেগোলেটাইল। দুটি মেয়ের মধ্যে পার্থক্যটা হল: মাথাটা একেবারেই অশিক্ষিতা মেয়ে, একমাত্র যে কাজ সে করতে পারে তা হল বাড়ীর ঝিয়ের কাজ, আর নিয়োর সামনে খোলা আছে বহুরকমের কাজের সুযোগ—টাইপিস্ট, হিসাবরক্ষক, কি সেক্রেটারী। কাজেই নিয়ো শুধু হাসল: মাথাটা মোটেই তার প্রতিদ্বন্দ্বী নয়।··· কেগোলেটাইল তো গো-ধনে বেশ ধনীই, সরাসরিই সে নিয়োকে বিয়ে করার প্রস্তাব দিল। আর মাথাটাকে আদালতের নির্দেশ-মতোই মাসিক দশটাকা দিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থাটাও মেনে নিল—এবং এই ব্যবস্থা চলবে মাথাটার বাচ্চাটার বিশবছর বয়স না হওয়া পর্যন্তই। মাথাটাও শুধু হাসল। ওর মতো মেয়ে আর একটা মেয়ের সঙ্গেই তার স্বামীর সান্নিধ্যের ব্যাপারে কী বাধাই বা দিতে পারত? তা, পেয়েও যখন হারাল ভবিতব্যকেই মেনে নিল।

নিয়োর নিজের আত্মীয়স্বজনদেরই মন্তব্য—'মেয়েটা ক্ষেপে উঠেছে শিক্ষার জন্য, তা ভদ্র আচার-আচরণের জন্য মাথাব্যথা নাই।'—তারা বলতে চাইছে ওইসব ধরণধারণ দেখেই তারা ভুলে যাচ্ছে না—'বরটা তো ভেবেছে নিয়ো যখন তারি মতো লেখাপড়া জানা, দুজনেই জুটিয়ে নেবে ভালো চাকুরী এবং দেখতে দেখতে হয়ে উঠবে বড়লোক···'

শিক্ষিত বলেই কেগোলেটাইলের ভিতরে ভিতরে একটা দ্বন্দ্বই চলছিল——তার ভাবী পত্নী নিয়োর জন্যে যখন সে একটা বাড়ী তৈরী করে রাখছিল তখনো। অবশ্য খুশির সময়টা সে মাথাটার ঘরেই কাটাত। ওখানে তার আচার আচরণ হতে কিছুটা আড়ষ্ট ধরণেরই। মাথাটার জন্যে সে ঢেলে দিত কত রকমের জিনিস—খাবার, সখের পোষাক, জুতো, অন্তর্বাস। যখনি

আসত, কিছু উপহার নিয়ে আসতই। আর প্রত্যেকবারেই খিলখিল করে হাসতে থাকত মাথাটা, বলত—'ও হো, কেগোলেৎটাইল! এসব পোষাক আমি কী করে পরি? এ শুধু টাকা ওড়ানো। তাছাড়া, তুমি যে বাচ্চাটার বাবদ আমাকে মাসে মাসে দশ টাকা দাও তাতেই বেশ চলে যায় আমার…'

মেয়েটি ভারী সুন্দর—কালো চোখ দুটি যেন একজোড়া তারা; সব সময়েই হাসে, সব সময়েই হাসিখুশি। সব সময়েই বিনা আয়োজনেই বেশ থাকে—ঠিক সে যেমনটি। কেগোলেটাইল জানে বিয়ে করছে সে কাকে—ঠিক বিপরীত ধরনেরই কাউকে। নতুন জাতের একটা মেয়েকে, লোক-দেখানো ধরণের ঢং-ঢাং—আর চালচলনেও যেন সে সবারি অভিভাবিকা এক দিদিমা! কিন্তু তবুও তো আজকাল কেউ নিজের বুকের মধ্যটা দেখে তবেই মজে। সবাই চায় এমন স্ত্রী—যে মোটা টাকা কামাবে, আর এ ব্যাপারে হয় তারা একেবারেই বেপরোয়া! কিন্তু তবুও সমাজ তার স্বকীয়তার বৈশিষ্ট্যের স্পষ্ট ছাপটুকু রেখে দেয় প্রতিটি ব্যক্তির মধ্যেই, আর কেগোলেটাইলেও সেখান থেকে বাদ পড়ে না। তার মধ্যে দেখবার মতো এমন বিনয় এবং দয়া এবং খুশি রাখার ব্যাপারে এমন এক আগ্রহ ছিল যে সবাই তাকে ভালোবাসত ও সম্মান করত। মাথাটার আঙিনায় সে যখন উঠত তার মধ্যের দ্বন্দ্বের কথা কিছুই তাকে বুঝতে দিত না, পিঠের দিকে হাত দুটো ভাঁজ করে বসে থাকত চেয়ারে, একপাশে মাথাটা হেলিয়ে রেখে একদৃষ্টে চেয়েই থাকত বাইরের দিকে শূন্যে। তারপর হাসত, উঠে পড়ে চলে যেত। নাটকীয় কিন্তু নয়। নিয়োর জন্যে নতুন ঘরবাড়ী তৈরী করার সময় প্রায়ই ঘুমোত নিয়োদের বাড়ীতেই।

দুই বাড়ীর মধ্যে আকর্ষণের এই পার্থক্যটা লক্ষ্য করছিল দুই দিকেরই আত্মীয়স্বজনেরা। তারপর নিয়ো একদিন তার এক পিসির বাড়ীতে ঢুকলে তিনি ঠিক করলেন ওকে একটু ভয় খাইয়ে দেবেন।

নিয়ো তার তথাকথিত পদচেতনার অভ্যাস-দুরন্ত ভঙ্গীতেই পিসিকে বলে উঠল—'আমাকে একটু চা খাওয়াবেন? তারপর, কিরকম যাচ্ছে আপনাদের?'

পিসি জবাবটা দিলেন আস্তে আস্তেই—'বুঝলে মেয়ে, তুমি না জানতে পারো, তবে এখানকার চারদিকের সকলেই তোমাকে ঘৃণা করে। আমাদের মধ্যে এই তর্কই হচ্ছে—কেমন করে কেগোলেটাইলের মতো এক চমৎকার ছেলে—সে কিনা বিয়ে করতে পারে নিয়োর মতো অসভ্য একটা অপদার্থকে। মাথাটা অশিক্ষিত হতে পারে, কিন্তু তার মতো মেয়েকেই বিয়ে করলে কত ভালো হ'ত—মেয়েটি সবাইকেই সমীহ করে।'

মূর্খ ওই মেয়েটা যা ঘা খেল, তাতে এক মুহূর্ত সভয়ে তাকিয়েই রইল পিসির দিকে। তারপর দাঁড়িয়ে পড়েই দুমদুম শব্দে দৌড়ে বেরিয়ে গেল

বাড়ী থেকে। তার সেই দেমাকী হাসিটি মুছে গেল মুখ থেকে, এবং সে একটু যেন নেমেই গেল। লোকজনের দিকে এগিয়ে যেতে একটু বিব্রত ভাব দেখা দিল— কেগোলেটাইলকে স্বামীরূপে পাওয়া প্রসঙ্গেও। আর সেজন্যেই তো বিয়ে হবার ছ'মাস আগেই পেটে বাচ্চা করে নিয়েছে। তা যাই হ'ক না, তার নিজের আত্মীয়েরাও পছন্দ করে না তাকে, আর এই বিয়ের দিন পর্যন্তও তো তারা আলোচনা করছিল নিয়োকে নিয়ে—কোনো পুরুষের পক্ষেই সে স্ত্রী হবার যোগ্য কিনা। তবে এসব কথা বিয়ে-বাড়ীতে কেউ ঠিক ধরতে পারছিল না, কারণ বিয়ের ওখানে সমানেই চলছিল নাচের পর নাচ, উলুউলু। সারা বাড়ীতে আনন্দ আহলাদের পরিবেশ। অতিথি অভ্যাগতেরা স্রোতের মতো দলে দলে আসছে পথে পথে উলুউলু আওয়াজ করতে করতে, আর কী বিপজ্জনক ভাবেই তাল সামলে চলেছে—বিয়ের উপহার মাথায় মাথায়।

নিয়োর মামীরা সেজেগুজে রঙচঙ শাল গায়ে আলাদাভাবে একদলে বসে আছে আঙ্গিনার এককোণে। খালি জমির উপরেই পা ছড়িয়ে বসে থাকলে কি হবে, তাদেরকেও সারাটা দিন খাবার পরিবেশন করা হচ্ছে এমনভাবে— তারা যেন রাণী সবাই। চায়ের ট্রের পর ট্রে, শাদা দামী রুটি, মাংসের প্লেট, ভাত, স্যালাড—তাদের সামনে এনে রাখা হচ্ছে অবিরাম। তাদের গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল কনেকে কেগোলেটাইলের মামীদের হাতে নিয়মমতো সম্প্রদান করাটা —ঠিক সূর্যাস্তের সময় কেগোলেটাইলের সেই মামীরা এখানে আসার সঙ্গে সঙ্গেই। তাই সারাটা দিন তারা একঠাঁয়ে বসেই থাকছে। শান্তমুখে এক অবিচল ভাব— প্রাচীন প্রথামতোই কাজটুকু সঠিক সম্পাদন করবার জন্যে।

কেগোলেটাইলের মামীরা দীর্ঘ এক সারি বেঁধে সূর্য যখন ঠিক অস্ত যায়-যায় এ বাড়ীর আঙিনায় এসে উপস্থিত হল। তখন তাদেরো মুখের ভাব ঠিক ওইরকম: ধীরস্থির গম্ভীর। ধীরে ধীরে তারা সবাই এগিয়ে এল আঙ্গিনার মধ্যে—তাদের অভ্যর্থনায়ই যে উলুধ্বনি দেওয়া হচ্ছে তা যেন শুনেও শুনছে না। তারা একদলে বসল এসে নিয়োর মামীদের মুখোমুখী। এবারে সমস্ত আঙ্গিনাটাই একেবারে নিঃশব্দ— দুই দলের মধ্যে এবার পারস্পরিক প্রতিবেদন-পর্ব। কেগোলেটাইল এ বাড়ীর বিবাহ-ভোজের জন্য যোগাড় করে রেখেছে সব রকমের খাদ্যসম্ভার। তার এক মামী এবার বরের পক্ষ থেকে প্রথমে জানতে চায়—'কোনো অভিযোগ নাই তো? সব ঠিক আছে তো?'

'আমাদের কোনো অভিযোগ নাই।'—বলে কনে-পক্ষ।

'আমরা এসেছি জল চাইতে।'—বরপক্ষ থেকে জিজ্ঞাসা: বোঝাতে চাইছে শ্বশুরবাড়ীতে গিয়ে বৌকে জল বয়ে আনতে হবে এটাই প্রাচীন প্রথা।

'রাজি আছি।'—অন্যপক্ষের জবাব।

এবারে নিয়োর মামীরা কনের দিকে ফিরে তাকে পরামর্শ দেয়—'শোনো মেয়ে, তোমার স্বামীর জন্যে তুমি জল বয়ে আনবে। সাবধান, মনে রাখবে সবসময়েই, সেই হল বাড়ীর মালিক, কখনোই তার অবাধ্য হবে না। সে যদি এখানে সেখানে অন্য মেয়েদের সঙ্গে মাঝে মাঝে জমেই বসে তো কিছু মনে করবে না। তার ইচ্ছেখুশি স্বাধীনভাবেই সে যেন আসা যাওয়া করতে পারে······'

নিয়মনিষ্ঠা-মতো ব্যাপারটা শেষ হলে এবার কেগোলেটাইলের মামীদের কাজঃ দাঁড়িয়ে পড়ে উলুউলু দেওয়া এবং আঙ্গিনার মধ্যে নাচ দেখানো। তারপর ঐরকম নাচতে নাচতে আর উলুউলু দিতে দিতেই কনে ও বরকে সঙ্গে নিয়ে ধীরে ধীরে তারা এগোতে লাগল কেগোলেটাইলের বাড়ীর দিকে—সেখানে অপেক্ষা করে আছে আর এক ভোজোৎসব। সবাই এবার বরের বাড়ীর দিকে এগিয়ে আসতেই একজন বৃদ্ধা হঠাৎ ছুটে এসে একটা কোদাল দিয়ে মাটিতে কোপ মারলেন। এটাও অনুষ্ঠানেরই একটা নিয়ম। তবে, যে স্ত্রী মাঠে চাষ করতে যায়, নিয়ো সে ধরণেরই নয়। আগেই সে এক অফিসে ভালো মাইনেতে কাজ পেয়েছে—সেক্রেটারীর কাজ। এবারে অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় অংশে আর এক বৃদ্ধা এগিয়ে এসে কনের হাত ধরে এগিয়ে নিলেন আঙ্গিনার মধ্যেই রঙে-লেপা সাজানো-গোছানো একটি জায়গায়। সেখানে পাতা রয়েছে পশুচর্মে তৈরী ঐতিহ্য-সমৃদ্ধ একটি 'স্বোয়ানা' মাদুর। নিয়োকে বসানো হল মাদুরের উপর, সামনে রাখা হল একখানা শাল ও একখানা মাদুর। শালখানা অনুষ্ঠানের অংশবিশেষ-রূপেই জড়িয়ে দেওয়া হল কনের গলায়, রুমালখানা বেঁধে দেওয়া হল মাথায়। তার অর্থ সে এখন বিবাহিতা—স্ত্রীলোক।

অতিথি-অভ্যাগতেরা একে একে দ্রুত এগিয়ে গেল কনেকে সম্ভাষণ করতে। এবার দুটি মেয়ে নাচতে নাচতে উলুউলু দিতে লাগল কনের সামনে। দুজনে তারপর ঘুরিয়ে দাঁড়িয়েই নুয়ে প'ড়ে—উঁচুর দিকে পাছা দোলাতে থাকে। আর, এটা করতেই অন্য দুজনে একে একে টপকে যায় গায়ের উপর দিয়ে। আর, বিয়ে বাড়ীর অতিথিরা সেই দৃশ্য দেখে হেসে ওঠে হো-হো ক'রে। নিয়ো এতক্ষণ বসেই ছিল খাড়াভাবে—অনড় অনুভূতিহীন একটা কিছুর মতোই, এবারে কিন্তু নুয়ে পড়ে হাসতে হাসতে দুলতে থাকে।

কোদাল, মাদুর, শাল, রুমাল, আর বাঁশীর সুরের মতো মেয়েদের উলুলুলু

ধ্বনি—সবকিছুই মনে হল বিয়েরই সব শুভ আশীর্বাদ-স্বরূপ। তারপর এবার যখন ভিড়ের মধ্য থেকেই অভিজাত বংশের চেহারার রাণীর মতো এক মহিলা ধীরে ধীরে কনের দিকে এগিয়ে আসছিলেন, সমস্ত অতিথিবৃন্দ খুবি অভিভূত হয়ে পড়ল। ইনিই নিয়োর সেই মামী—যিনি নিয়োকে ভর্ৎসনা করেছিলেন তার অভদ্র ব্যবহার আর অতি-আধুনিক ধরণ-ধারণের জন্য। তিনি কনের সামনে বসলেন হাঁটু গেড়ে, দুই হাত মুঠো করলেন। তারপর কনের পায়ের দুইপাশের মাটিতে জোর আঘাত হানলেন হাতের মুঠো দিয়ে, আর উচ্চকণ্ঠে বললেন—

'সতীসাধ্বী হও! সতীসাধ্বী হও!'

লেখক : সাইপ্রিয়ান একুয়েন্সি

পশ্চিম আফ্রিকার নক্রুমা যেমন রাজনীতির ক্ষেত্রে অগ্রগণ্য, সাইপ্রিয়ান একুয়েন্সি তেমনি সাহিত্যের ক্ষেত্রে। নাইজেরিয়ার সাহিত্যে ইনি 'ডেনিয়েল ডিফো' বলেই বিখ্যাত। নাইজেরিয়ার শহরজীবনের রূপকার ভূমিকায় ইনি অনন্য প্রতিভা। হোটেল, অন্তঃপুর, পারিবারিক জীবন, প্রেম ও প্রণয়, সমুদ্রসৈকত, কিংবা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান—এমনি সবকিছুই এঁর ছোটগল্পের বিষয়াশ্রয়। তাই বিচিত্র পেশার ও নেশার ও পরিবেশের বিভিন্ন রকমের চরিত্র জীবন্ত হয়ে উঠেছে এঁর কলমে। চরিত্র ও ঘটনার গতি বিশেষ ঔৎসুক্যজনক। শহরজীবনের হৈহল্লা খোসমেজাজ ও ক্ষয়িষ্ণু রূপও বাদ পড়েনি, তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে ধরা পড়েছে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ ও তিক্ততার অভিজ্ঞতাও।

লেখক উত্তর নাইজেরিয়ায় জন্মেছেন ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে, শিক্ষা সমাপন করেছেন ইবাদানে, অচিমোতায় লাগোসে এবং শেষপর্যন্ত লণ্ডনে। নাইজেরিয়া বেতার সংস্থায় কাজ করেছেন যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবাদ-দপ্তরের পরিচালক পদে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হলে পূর্বদেশে গ্রহণ করেন ওই পদ। বর্তমানে চালাচ্ছেন তাঁর অষুধপত্রের কারবার।

জ্বলন্ত ঘাস, শহরের, লোকজন, লোকোশহর, কী সুন্দর পালক, জাগুয়া নানা, এবং অশান্ত শহর—এসব হল লেখকেরই কথাসাহিত্যের পরিচিতি। 'এ শান্তি বেঁচে থাক' শেষের দিকের উপন্যাস, প্রকাশকাল ১৯৭৬ খ্রীষ্টাব্দ।

এই শ্রেষ্ঠ কিশোরগল্প সংগ্রহের গল্পটি 'নর্তকী কন্যা' নির্বাচন করেছি লেখকের 'লোকোশহর' গল্পগ্রন্থ থেকে।

নর্তকী কন্যা

বাজারের দোকানটায় একটা ছায়া পড়ল, আর দোকানের মোমবাতি, দেশলাই বাক্স এবং খাবারের টিনগুলির পিছন থেকে একটি মেয়ে চোখ তুলে দেখল। মোটর থেকে এক যুবক লম্বা লম্বা পা ফেলে এগিয়ে আসছিল তাড়াতাড়ি। ও হল চিবো, সাধারণত সে যেমনটা করে থাকে আজ কিন্তু তেমনি দেরী করল না ড্রাইভারদের সঙ্গে গল্প করতে বা মদের ফেরিয়ালাদের অর্ডার

দিতে, কিংবা বীন বেচিয়ে মেয়েদের দিকে চোখ টিপতেও নয়। মনে হচ্ছে কিছুটা ব্যস্তই,—দোকানে মেয়েটির দিকে এগিয়ে গেল।

আঞ্চলিক এই চমৎকার যুবকটির দিকে তাকাতে মেয়েটির কেমন অপরাধ বোধ ও আফশোষই হচ্ছিল। সাদাসিধে হলুদরঙা একটি একটানা পোশাকে, আর লালচে 'লাম্পা' চাদরে তাকে এমন সুন্দর সৎ ও পুরুষোচিত লাগছিল—ঠিক যেমনটি চায় যেকোনো মেয়ের মন। মেয়েটি তো অস্বীকার করতে পারে না তার বাপমা পছন্দ করে রেখেছে ঠিক ছেলেটিকেই, কিন্তু এই পনেরো বছর পরে তার ভয়ই হচ্ছে সবকিছুই পালটে যাচ্ছে উল্টোদিকে। তাদের বিয়ে হওয়াটা এখন আর অপরিহার্য কিছু মনে হয় না।

চিবো হাসছে না। বিক্রয়দানী টেবিলটা থেকে কয়েক পা দূরে থেমে পড়ল, গায়ের লাম্পাটা গুটিয়ে ধরল কেমন অস্থির হাতে, বলল—'এই যে, আকুন্‌মা, সর্দার বললেন তোমাকে ডেকে দিতে · '

'আ চিবো! একটুখানি হাসিও নয়! কেন, কিছু হয়েছে কি? অথবা, এটা তোমার ওই—'

'না।'—চিবো বলে ওঠে—'কি আর হবে? তোমাকে ডাকতে পাঠিয়েছিল, তোমাকে ডেকে দিলাম।' আকুন্‌মার দিকে তাকিয়ে আছে চিবো কঠিনদৃষ্টিতে।

'ম্‌ম্‌!···'—দীর্ঘশ্বাস ফেলে আকুন্‌মা—'সর্দার কীজন্যে আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন ভেবেই পাচ্ছি না···'

'তা আমি জানি না। আমাকে যেতে দেখলেন, তাই বললেন—"বাজারে গিয়ে হাতী-নাচিয়েকে আসতে বলো।" আমি তাই এলাম। তুমিই তো হাতী-নাচিয়ে—নান্‌কুউ গাঁয়ের সেরা নাচিয়ে?'

আকুন্‌মার দুচোখে দেখা দিল লজ্জার ছায়া—'হ্যাঁ, তাই তো বলে সবাই। কিন্তু নাচের ব্যাপার হয় তো···আমি আমি কাউকে কথা দিয়েছি···'

'কাউকে অর্থাৎ পিটার্স কে?'—চিবো হাসছে এবার সশব্দ। হাসিতে অবশ্য খুশির ভাব নেই—'কিন্তু ও তো চলে গেছে। কি, তাই না?'

'ফিরে এলেই জানতে পাবে। জানো তো, নান্‌কুহু গাঁয়ের সব মেয়েরাই কীভাবে ছুটছে ওর পিছু পিছু···ওকে পাবার জন্যে তারা সব কিছু করতে রাজি।'

'সে তো ভালো কথা!'—বলে ওঠে চিবো—'ওদের আর দোষ দিচ্ছ কেন? কলেজ থেকে এসেছে, গলায় বাঁধা রুমাল, দুনিয়া দেখছে বোতলের ভিতর দিয়ে···তার বাবা ভাবছেন ছেলেকে বিলেত পাঠাবেন। তার পিছনে ছুটবেই না কেন—সব মেয়েরাই, এমন কি আমার এই প্রেয়সীটিও—এই তুমিও?'

'চিবো !'—আকুন্‌মার চোখে ক্রোধের ঝিলিক, কিন্তু মাথার বাঁধুনীটা ঠিক করতে করতে তার আঙুলগুলিই ধরিয়ে দিচ্ছিল তার ভিতরের অস্থির ভাবটা। সে বলে উঠল—'তোমার ঈর্ষা হচ্ছে বুঝি? কি তাই না? এই দোকানটা একটু সময় দেখো না, চিবো ভালোছেলে! বলো, আমরা কি এখন এ-ওর শত্রু? এই এক্ষুনি আসছি, দেরী হবে না।' চিবোর ডান বাহুতে একটা চিমটি কেটে বেরিয়ে যায়।

'মনে রেখো, আমার কাজ আছে কারখানায়। কলেজের ছেলে নই আমি; কঠিন শ্রমে রোজগার করতে হয়—চোখে চশমা লাগিয়ে আর টাই পরেই নয়!'

সর্দার তার ঘরের ছাদের আড়াগুলো গুনেই চলেছেন, আর আকুনমা সেই দাঁড়িয়ে আছে তো দাঁড়িয়েই আছে। এই ঘরটায়ই একত্রিত হয় জ্যেষ্ঠ-জনেরা—ঘরটায় সাজানো গোছানো অদ্ভুত অদ্ভুত প্রাণীর শিং ও চামড়া। রয়েছে পুরোনো ঘড়িও—কোনো কোনোটায় থেমে গেছে টিক্‌টিক্‌ স্পন্দন। আকুন্‌মা চেয়ে চেয়ে দেখছে সবচেয়ে পুরানো ঘড়িটার আলসে ধরনের গতিবিধি। আর তখনি দরজাটা খুলে গেল হঠাৎ।

দরজার ফ্রেমে দাঁড়িয়ে আছেন প্রকাণ্ড চেহারার একটি লোক। তাঁর চোখে মত্তলোকের স্থিরদৃষ্টি।

আকুন্‌মা বলে উঠল—'দীর্ঘজীবী হোন, সর্দার।'—বলেই সম্ভ্রমভরে প্রণত হল তাঁর সামনে। তিনি ওকে মেয়ে সম্বোধন করে উঠতে আদেশ করলেন।

'ওঠো মেয়ে।'—বলতে বলতে সর্দার দাঁড়ালেন এসে ঘরের মধ্যখানে, বললেন—'তোমাকে ডাকতে পাঠিয়েছিলাম। তোমাকে জানিয়ে দিচ্ছি—নাচ দেখাচ্ছ তুমি আজকে রাতেই……'

'কিন্তু সর্দার—'

'এ কী? কেড়ে নিচ্ছ আমার মুখের কথা? শেষ পর্যন্ত এই শিক্ষাই কি পেয়েছ?'

'মাফ করুন, সর্দার।'

সর্দার বলে চললেন যেন কিছুই হয়নি, কিন্তু আকুন্‌মা ঠিকই বুঝতে পারছে বাধা দেওয়ায় উনি বিরক্তই হয়ে আছেন। সর্দার নান্‌কার মতো লোকের কাছে এটা করা অন্যায়।

সর্দার বলতে লাগলেন—'আমাদের গাঁয়ে আজ রাতেই উপস্থিত হচ্ছেন দুজন বিখ্যাত লোক। একজন স্যর আজুমোবি—সেনেটে আমাদের দেশের সর্বোচ্চ সরকারী পরিষদে আমাদেরই প্রতিনিধি। আজি উনি আসছেন পরিদর্শন-ভ্রমণে। অনেকদিন থেকেই আমাদের গ্রামাঞ্চলে ভালো জল সরবরাহের

জন্য বিশেষ আবেদন জানিয়ে আসছি। কিছুই ফল হয়নি। কিন্তু এই আমাদের গাঁয়েরই যে ছেলেটি এই পনের বছরের মধ্যে একবারও গাঁয়ের দিকে পা বাড়ায়নি এবং এখন হয়ে উঠেছেন একজন বিখ্যাত ধনী এবং নামজাদা ব্যক্তি,—এবার আমি তাঁর মন ছুঁয়ে দিতে চাই। তাঁর মনে ধরাবার জন্যে আজ রাতেই তাকে তোমার নাচ দেখাতে চাই—এবং তাঁকে দিয়েই মন্ত্রীকে ধরিয়ে আমাদের জলের ব্যবস্থাটা করতে চাই। এসব অঞ্চলে তোমার নাচই সর্বোৎকৃষ্ট, এবং তা দেখে মন্ত্রীমশাই এমন খোসমেজাজে থাকবেন যে মন দিয়েই শুনবেন আমার কথা। এছাড়াও, স্যর আজুমোবি তার সঙ্গে নিয়ে আসছেন তাঁর বন্ধুকে—একজন আমেরিকান কেউকেটা হবেন বোধ হয়, ঠিক জানি না·· এলে বলবেন আমাদের। তুমি যাতে সবচেয়ে ভালো নাচ নাচো—সেটা আমার পক্ষে এবং আমাদের গাঁয়ের পক্ষে খুবি গুরুত্বপূর্ণ। কথাটা শুনছ তো? যাও, এবার গিয়ে তোমার নাচের দল গুছিয়ে নাও—'

আকুনমা দাঁড়িয়ে না পড়েই বলল—'সর্দার, এই নাচ কি আমরা ঠেকিয়ে রাখতে পারি না—কাল পর্যন্ত?

'যাও বলছি, গুরুজনদের কথায় কথায় জবাব দিতে নাই।'

'সর্দার, আপনার কাছে মিনতি করছি, কথা শুনুন। আমি কথা দিয়েছি আমার···আমার ভাবী বরকে···কখনোই আর নাচ দেখাব না প্রকাশ্য জায়গায়—'

'কে সে? চিবো?'—খেঁকিয়ে উঠলেন সর্দার।

'না, তাকে নয়। সে—সে পিটার্স, যে কলেজে পড়ে। আপনি চেনেন তাকে··· ;

'যে সব সময়েই টাই ঝুলিয়ে বেড়ায়·· তা, এখন কি তাকে তুমি শায়েস্তা করতে বলছ···'

'চেনেন না·· সে ছুটি কাটাতে এসেছে এখানেই।'

'চিনি না। এ গাঁয়ের কারো কাছেই সে চেনাজানা নয়। কেবল তোমরা মেয়েরাই চেনো। যাও, এখন গিয়ে তোমার ওই ছোট ছোট মেয়েদের জড়ো করো—আমাকে যেন আমার ক্ষমতাটা দেখাতে না হয়।'

'সর্দার। পিটার্স এখানে এসে মেকানিকের কাজ করছিল একটা লরীতে—সেই লরীটাতে যেটা রোজ কোল-সিটি থেকে কয়লা এনে নাইজার নদীতে স্টিমারে দিয়ে আসে·· সে যে কাজের ছেলে—তাই আমাকে দেখাবার জন্যেই তো! এখন সে কোল-সিটিতেই গেছে। ওর আত্মীয়স্বজন থাকে তো ওখানেই, ওদের সঙ্গে আলোচনা করতে গেছে। আজ রাতেই তারা আসবে, আমাকে বিয়ে দেবার কথা বলবে মাকে। ও সর্দার। আপনি কি বুঝছেন

না—সবকিছু ফয়সালা না হওয়া পর্যন্ত আমাকে ভদ্রভাবে থাকতে হবে—সম্মানজনক ভাবে ?'

'তোমার মাথাই ঠিক নেই। এই নানুকোতে কেউই চেনে না পিটার্সকে। আমরা সবাই জানি চিবোই তোমার ভাবী বর·· এখানে থেকেই তুমি এখন এভাবে তাকে ফেলতে পারো না! গুরুজনেদের জানাতে হবে। তা, কেন আর এখন সময় নষ্ট করছ। শোনো মেয়ে, ব্যাপারটা আমার ও তোমার মায়ের মধ্যেই মিটমাট হয়ে যাবে। এবার যাও। সন্ধ্যা হতে বড় বেশী দেরী নাই। যে কোনো সময় আমাদের অতিথিটি তাঁর বন্ধুটিকে নিয়ে এসে পড়তে পারেন।'

'সর্দার, আমি পারব না। আমি নাচতে পারব না!'—এবার কাঁদছে। ওর দিকে এক মুহূর্ত কটমট করে তাকিয়ে ঘর ছেড়ে চলে গেলেন সর্দার। আকুন্মা শুনতে পাচ্ছে সর্দার সক্রোধে কথা বলছেন তাঁর স্ত্রীদের কাছে। ভয় পেয়ে গেল। লোকটা তাঁর বিষম ধূর্ততার জন্যে খুবি বিখ্যাত। কিন্তু কী অন্যায় করেছে আকুন্মা ? এখন সে কী করবে ? চলে গেল কয়েকটি মুহূর্ত। চারদিক নিস্তব্ধ, তবু সে বুঝতে পারছে তার বুকের তলায় কেমন এক অস্থিরতা।

খুলে গেল পাশের দরজা। ভিতরে ঢুকে পড়ল দুজন মুখোশধারী পুরুষ। তারা ওকে কব্জি ধরে এগিয়ে নিয়ে চলল বাড়ীটার পিছন দিকে—যতটা ভদ্রভাবে নিয়ে চলা সম্ভব।

জায়গাটা ভেতর-বাড়ীর আঙিনার মতো—দুইপাশে দুইসারি ঘর, প্রত্যেকটি ঘর থেকেই তাকিয়ে দেখছে বিস্ময়-বিস্ফারিত চোখগুলি। এটাই সর্দারের হারেম।

মুখোশধারীরা ওরি একটা ঘরের দিকে নিয়ে এল মেয়েটিকে—ভিতরে ঠেলে দিয়ে চলে গেল। ঘরটা অপ্রীতিকর নয় মোটেই। ঘরে বেশ আলো। দেখলেই বেশ দামী মনে হয় এমন একখানা পালঙ্ক ঘরের এক প্রান্তে ; অন্যদিকে একটা টেবিল—উপরে সারি সারি বই। দেয়াল-আলনায় ঝুলছে বেশ ছিমছাম কয়েকটা ফ্রক। আকুন্মা সবিস্ময়ে ভাবছে—এটা কার ঘর ? দরজা খুলে ঢুকলেন একজন তরুণী—বেশ ফিটফাট রকমের, ফ্রক পরা। ইনিই সর্দারের সর্বকনিষ্ঠা স্ত্রী। মৃদু মৃদু হাসছিলেন।

'ম্‌ম্‌ম্‌ ও, তুমিই হলে সেই মেয়ে! আমিও তাই ভেবেছি। সর্দার আমাকে তোমার কাছে পাঠিয়েছেন—তোমার মত পরিবর্তনের জন্যে। পিটার্সের জন্যে এত অনুরাগ সে তো শুধুই সময় নষ্ট করা। সৎ ছেলে নয়—ওই পিটার্স। তোমাকে নিয়ে সে কেবল খেলছে। এই কথাটাই ভাবো না,

দ্বদিন বাদে যে কিনা হতে যাচ্ছে দেশের একজন নেতা···তোমাকে দিয়ে তার কী দরকার, ভেবে দেখেছ একবার ?'

আকুন্‌মা বলে উঠল—'আমি জানি, ওই সর্দারেরই যোগ্য আপনি। সেইণ্ট এনির গির্জাবাসে থেকে পড়াশোনা করেছিলেন তো। কি, তাই না ? কিন্তু সর্দার তো ঠিকমতো লিখতে কি পড়তেই জানেন না, তব্ু কিনা তিনি বিয়ে করেছেন আপনাকেই !'

উনি শ্বধ্ব বললেন—'আমি এসেছি তোমাকে সাহায্য করতে। সর্দারের অন্য স্ত্রীরা আমাকে পছন্দ করে না, সেজন্যে আমি অবশ্যি দ্বঃখিত নই।'

'আপনি স্বার্থপর, শয়তান। সেজন্যেই দ্বজনে মিলেছে ভালো। আমি জানি সর্দারকে ঠকাচ্ছেন আপনি। যথেষ্ট টাকাকড়ি জমিয়ে একদিন তাঁর দামী দামী জিনিসপত্তর নিয়েই উধাও হবেন।'

'কী যাতা বলছ ! ওভাবে কথা বলে না।'

'কী করতে এসেছেন এখানে ?'

সর্দারের স্ত্রী শয্যার উপরে উপবেশন করলেন। তিনি বললেন—'এটা আমার ঘর। কিন্তু আমি তোমাকে জানাতে এসেছিলাম—আজ তুমি যদি সম্মত না হও তো—সর্দার ভয় দেখাচ্ছেন তোমার মায়ের জমিজমা নিয়ে নেবেন। তুমি তোমার মাকে জানো···কী গরীব সে ! ঐ জমিটুকু হাতছাড়া হলে কী করে সে দাঁড়াবে ! তা, যেসব দামী দামী ইরোকা গাছ তোমার বাবা রেখে গেছেন···তার অধিকার নিয়ে এখনো বাধা আছে।···সর্দার এখনো তোমাদের বির্বদ্ধেই তাঁর মত স্থির করতে পারেন। কিন্তু এসবে কি কিছ্ব আসে যায় তোমার ? তোমার পিটার্সই রয়েছে তো, তুমি তাকে নিয়ে পালিয়ে যেতে চাইছ—তোমার মা না খেয়ে মর্বক না !'

আকুন্‌মা মাথা নত করে রাখল—'শয়তান···তোমরা দ্বজনেই···বেজায় শয়তান।'

সর্দারের স্ত্রী এমন এক কর্বণ চিত্র তুলে ধরেছেন যে আকুন্‌মা ঘরের এক কোণে বসে রইল জড়োসড়ো—নিস্তব্ধ এক অসহায় বন্দী। মাঝেমধ্যে ছোট্ট একটি মেয়ে আসছিল—হাতে ফুলের মালা। সবশ্বদ্ধ বিশটি মেয়ের এক নাচের দল—সবাই কী চমৎকার, কী স্বন্দর ! বয়স পাঁচ থেকে তেরো। সকলেরই কী নিখ্বঁত অঙ্গভঙ্গিমা, নাচ তাদের কাছে যেন চিরন্তন আনন্দের। দলের একজন ভিতরে এল—ঝং ঝং বেজে উঠল পায়ের মল, সারা দেহে কাম-কাঠের আলপনা। আকুন্‌মা ব্বঝতে পেরেছে সর্দার তো সিনেটরের কাছে নাচের দ্শ্যটা উপস্থিত করতে কোনো বাধাই মানবেন না। যা ফন্দিবাজ শয়তান এই সর্দার ! খ্বশির দ্শ্য দেখতে দেখতে মগগ্বল সিনেটর দ্বর্বল

হয়ে পড়বেন, আর নান্‌কৌর জন্যে সর্দার পেয়ে যাবে চমৎকার জল সরবরাহ ব্যবস্থা। আর সে নিজে কী পাবে? হারাবে তার জীবনের সবচেয়ে বড় সৌভাগ্যকে।

সর্দার সন্ধানে এলেন ঠিক সন্ধ্যাবেলা—'কখন শুরু করছ মহড়া? তোমার দলবল তৈরী আছে তো? কী নাচ দেখাবে? হস্তীনৃত্য হলেই ভালো। তুমি তো হাতীর দাঁতের নাচিয়ে। সব নাচের মধ্যে ওইটেই সবচেয়ে ভালো। তোমার হাতীর দাঁতের বলয়গুলি ইতিমধ্যেই চকচকে করে নিয়েছ তো?'

সর্দারের স্ত্রীই জবাব দিলেন—'ও তো ওই কোণে গুটিয়ে বসেই আছে।'

-আকুন্‌মা বলেই ওঠে যেন—'আমাকে একলা থাকতে দিন। হায়রে, সব কিছুই এমন করে আমার বিরুদ্ধে যায় কেন? এই গাঁয়ে সকলেই মনে করে আমি একটা তুখোড় মেয়ে, ডানপিটে মেয়ে। কেউই আমাকে নিয়ে ঘর বাঁধতে চায় না। এমনকি চিবোও ভয় করে আমাকে! আর তারপর যেই চমৎকার এক ভদ্রছেলে এসে পড়ল…'

সর্দার বাধা দেন='চুপ করো। যথেষ্ট হয়েছে। তুমি যদি এতটাই জেদ দেখাও তো, আমাকে সেই কাজই করতেই হবে যা আমি করতে চাই না। সিনেটর এলে তাকে জানিয়ে দেব কোল-সিটির পথে পিটার্স মেরে ফেলেছে একটা লোককে। এবং এখন আর সে ব্যাপারে সাহায্য করতে পারব না।'

আকুন্‌মা তোত্‌লাতে থাকে—'সে·· খুন করেছে·· একটা লোককে!'

কিন্তু সর্দার ইতিমধ্যেই চলে গেছেন ঘরের মধ্যে দুজনকে রেখে।

'ও, তাহলে তুমি শোনোনি?'—সর্দারের স্ত্রী বলতে লাগলেন- 'সবি অবশ্যি চাপা দেওয়া হয়েছিল। তোমার পিটার্সই লরী চালিয়েছিল, কিন্তু তাকে বাঁচাবার জন্যে লরীর মালিক দোষটা নিয়ে নিল নিজেরি ঘাড়ে— দিয়ে দিল জরিমানা। চমৎকার লোক। সে জানতেও দেয়নি যে পিটার্সের ড্রাইভিং লাইসেন্স ছিলই না…'

'আপনি বলছেন যে…পিটার্সই দায়ী ছিল…এজন্যে, অন্য লোকটি নয়? দুর্ঘটনার কথাটা আমিও শুনেছি। মাসখানেক আগে হবে। নান্‌কৌতে পিটার্স আসার পরেই।'

'তুমি সত্যিটাই শুধু শোনোনি।'

'হা, ভগবান। আপনার কাছে মিনতি করছি…আপনি কি সর্দারকে বলে ব্যাপারটা এইখানেই চাপা দিতে পারেন না? আপনি জানেন আপনাকে উনি ভালোবাসেন…এমন কি জ্যেষ্ঠা সব অন্য স্ত্রীদের উপরেই প্রধান স্থান পেয়েছেন আপনিই— আপনিই ওঁর কাছে মিনতি করে বলুন—অতীতটা নিয়ে আর ঘাঁটাঘাটি করেন না যেন।'

'আমার সে ক্ষমতা নেই',—বললেন সর্দারের স্ত্রী—'হ্যাঁ তা আছে বৈকি, তবে তুমি যদি নাচতে রাজি হও।'

'না।…সে অসম্ভব। আমি বরং মরতেও রাজি।'

দামী পণ্টিয়াক গাড়ীটা যখন গাঁয়ের মধ্য দিয়ে আসছিল, একদঙ্গল গাঁয়ের ছেলেও ছুটছিল পিছু পিছু। মুখের পাইপটা ধরাতে ধরাতে নেমে এলেন আজুমোবি—পরণে নিখুঁত তৈরী এক গাঢ়-ধূসর ফ্ল্যানেল স্যুট। পিছুনেই এক আমেরিকান, পরণে হালকা রঙের গ্যাবার্ডিন স্যুট, মাথায় সবুজ রেখা-টানা শিরস্ত্রাণ। 'উনিই স্যাম বিলিং, চলচ্চিত্র নির্মাতা।'—হাত দুখানা দুপাশে ছড়িয়ে ইঙ্গিতে দেখালেন তালগাছগুলি এবং কলাবাগানের ভিতরে ভিতরে কুঁড়েগুলি। 'উনি আফ্রিকার উপরে একটা চলচ্চিত্রের ছবি করছেন, একটা দৃশ্যের সঙ্গে একটা নাচ চান…আপনি বোধহয় এখানটায় সাহায্য করতে পারেন, সর্দার…'

'হয়ত তাই।'—সর্দারের কণ্ঠে অনিশ্চয়তা—'হ্যাঁ, আপনাদের জন্য বিশ্রাম-ভবন এখন প্রস্তুত। এই যাত্রার পরে আপনাদের নিশ্চয়ই প্রক্ষালন ও পোশাক পরিবর্তনটা প্রয়োজন। আপনারা যখন বলছেন কাল সকালেই চলে যাচ্ছেন, খুবি চেষ্টা করছি আজ রাতেই নাচের ব্যবস্থা করতে। কিন্তু ন'টার আগে শুরু হতে পারছে না, নাচিয়েদের প্রস্তুত হবার জন্যে একটু সময় দিতে হবে।'

বিশ্রাম-ভবনের দিকে চলে গেল ওঁদের গাড়ী। আর সর্দার ফিরে এলেন অন্তঃপুরের আঙিনায়, দেখতে পেলেন আকুনমাকে। কিন্তু যেটুকু মাত্র সাড়াশব্দ পেলেন তা হল—'পিটার্সের কাছে আমার কথার খেলাপ করব না।'

'ঠিক আছে, আটটার মধ্যে ও যদি না আসে তো তোমাকে নাচতে হবে। এখন সাতটা।'

আধঘণ্টা পরে চিবো এল দোকানের চাবি ফেরৎ দিতে। এক টুকরো কাপড় বিক্রি করেছে বিশ টাকায়। ও সবসময়েই ঐরকমই, খুবি বিশ্বাস করা যায়।

চিবো উদ্বিগ্নভাবেই বলল—'আকুনমা, লনকোতে রটে গেছে কথাটা : তুমি নাকি নাচছ না। একী বোকামি?'

'ও কিছুই নয়।'

'তোমাকে অনুরোধ করছি, আকুনমা। যা করবে বেশ ভেবেচিন্তে করো। সর্দার কিন্তু এসব ব্যাপারে ভয়ংকর।'

বনের মধ্যে চারদিকে গাছঘেরা ফাঁকা জায়গাটিতে যে নৃত্যস্থানটি আছে সেখানটা থেকে ঝরাপাতা ঝাঁট দিচ্ছে ঝাড়ুদারেরা। মেয়েরা সাজিয়ে রাখছে চেয়ারগুলি, মুছে রাখছে আলোগুলি। সর্দারের সর্বজ্যেষ্ঠা স্ত্রীর ঘরে জমে আছে বিশটি সুগঠনা লাবণ্যময়ী মেয়ে—তাদের গায়ে সুগন্ধি, আর বিচিত্র

রঙসাজ। তারা ঝুং-ঝুং ঝিং-ঝিং বাজাচ্ছে মলগুলি ও বালাগুলি। যে আয়োজন সারাটা গ্রামকে জাগিয়ে তুলছে—দোলা দিচ্ছে তা থেকে সরে আছে একমাত্র আকুন্‌মা। দুম দুম ডিম্‌ ডিম বাজছে এবার দামামাগুলো।

সর্দারের স্ত্রীরা সমবেত হয়েছে আকুন্‌মার দোরের সামনে, কলবল কথা বলছে অধীর কণ্ঠে। কিন্তু পিটার্স ফেরেনি এখনো। সময়টা শেষ হয়ে আসছে। সর্দারেরা স্ত্রীরা একদলে এগিয়ে চলেছে বনের সেই ফাঁকা জায়গাটার দিকে—সকলেরই রঙসাজ আজ, সকলেই ঔৎসুক্যে চঞ্চল।

নতুন রকম কোনো আওয়াজ পেলেই আকুন্‌মা ছুটে আসছে দরজায়। এখন তার শান্তভাব রূপ নিচ্ছে উদ্বিগ্নতায়, আর উদ্বিগ্ন ভাবটার বদলে দেখা দিচ্ছে এক অদ্ভুতরকম আশঙ্কা—সর্দারের কথা না রাখলে কী হবে সেই ভয়। পথ দিয়ে আসছেন একদল মবুথেবু বৃদ্ধ, ডাকাডাকি করছেন—'আকুন্‌মা, কোথায় তুই ?'

বৃদ্ধেরা চলে যাবার কিছু পরেই এক যুবক—ছিন্নভিন্ন পোশাক, কাটা-ছেঁড়া রক্তাক্ত শরীর—ঢুকে পড়ল আকুন্‌মার ঘরে—যে ঘরে বন্দী হয়ে আছে আকুন্‌মা। এ হল পিটার্স।

'ও পিটার্স!'—আঁৎকে ওঠে আকুন্‌মা—'কী হয়েছে, তোমার আত্মীয়-স্বজনেরা কোথায় ?

'দুর্ঘটনা···আকুন্‌মা···দুর্ঘটনা···তোমাকে নাচতেই হবে—বদ মতলবে আছেন সর্দার···নাচবেই···শুনতে পাচ্ছ ? আমি তোমাকে অনুমতি দিলাম ! নাচ দেখিয়ে আমাকে বাঁচাও।'

'কী হবে তবে···আমাদের লোকজন দেখতে পাবে যে ?'

'সে ভাবনা এখন নয়। তোমাদের লোকজন নাচ দেখবে। দেখুক না। তুমি হাতীর দাঁতের বালা পরে নাচবে। আর দেরী করো না।'

দ্রুত পায়ে চলে গেল। আকুন্‌মার সারাটা শরীর কাঁপছে। আগের মতোই নমনীয় দেহভঙ্গী ও নরম লাবণ্য কি থাকবে তার। বাহুতে হাতীর দাঁতের বলয় মনে হচ্ছে বড্ড ভারী। বিদেহীদের মন্ত্রঃপূত বিবাহ-মুখোশটি তার দুর্বল গ্রীবা যেন ধরে রাখতে পারছে না। কিন্তু তারপর নাচের ঘেরের মধ্যখানে এসে দাঁড়াতেই তাঁর দুই চোখে নাচতে লাগল হাজার হাজার দীপের আলো। জমির উপরে কত নিখুঁত কত জটিল রেখা এঁকে এঁকে নাচ শুরু করতেই পায়ে পায়ে ফিরে এল হাল্‌কা ভাব। প্রতিটি ভঙ্গীতে তাকে অপলক চোখে দেখছে সবাই। আর সে দেখছেই না, বরং ঠিকই অনুভব করছে আলোক-ঢাকনার নিচে গণ্যমান্য ব্যক্তিদের উপস্থিতি। ঐ তো মধ্যখানে

সর্দার, একপাশে সিগার টানছেন স্যাম বিলিং, সিনেটর নুয়ে পড়েছেন হাওয়া থেকে দেশলাইর আগুনটা বাঁচাবার জন্যে…

পরের দিন সকালবেলা, তখনো তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গে ব্যথা। বুকের মধ্যটা তখনো কাঁপছে ভয়ে, মলগুলি তখনো ঝুমঝুমি বাজাচ্ছে কানে। আর, স্যাম বিলিংয়ের বারম্বার সে কী প্রচণ্ড সাধুবাদ! আর তাই শুনতে শুনতেই আকুন্‌মা যেন জেগে উঠল তার স্বপ্নলোক থেকে, ফিরে এল বর্তমানে।

ঘরের সামনেই কোথাও থেকে শোনা যাচ্ছে চিবোর কণ্ঠস্বর। বিছানা থেকে উঠে বসল কষ্টেসৃষ্টে। চিবো তার বাগান থেকে নিয়ে এসেছে ঝুড়িভর্তি টাটকা কমলা আর কলা। চিবো তার প্রশংসায় এতটা উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল যে আকুন্‌মা পিটার্সকে দেখতে না পাওয়ার হতাশটা চেপেই রাখল। বরং পিটার্সের কথা জানতে চাইলে সে দুঃখ পেতে পারে, সেই আশংকায় তার কথা তুললই না।

চিবো বলতে লাগল—'সিনেটর এবার তাদের বহু প্রয়োজনের জলব্যবস্থাটা করবার কথা দিয়েছেন, কিন্তু তার আশংকা কেউ কেউ হয়ত জলকর দিতে চাইবে না। আর একটা কথাও সে শুনেছে। স্যাম বিলিং—সেই চলচ্চিত্রের গোড়ার লোকটি তাঁর আফ্রিকার উপরে চলচ্চিত্রটিতে তুলে ধরছেন হাতীর দাঁতের নাচিয়ে এই আকুন্‌মাকে। এসবি সম্ভব হল যেহেতু আকুন্‌মা কাল রাতে একখানা দৃশ্য দেখিয়েছে বটে!' তারপরে বলল—'কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না আকুন্‌মা, কোনো লোক কী করে এমন কাজ করতে পারে—আমি বলছিলাম—ঐ ছেলেটার কথা – ঐ পিটার্স…'

আকুন্‌মা যেন শ্বাস রুদ্ধ করে আছে। মুখ থেকে মুছে গেছে মৃদু হাসিটুকু। সে যেন প্রতিধ্বনি করে ওঠে—'পিটার্স?' এক হিমেল স্তব্ধতার মধ্যে বড় একটা শোনাই যায় না তার কণ্ঠস্বর।

'হ্যাঁ, সে-ই।'

'তা, আর কেন? শুধু শুধু কেন সময় নষ্ট করছ। কাল রাতে তুমি যখন পিটার্সকে বাঁচাবার জন্যে নেচে যাচ্ছ, পিটার্স ওদিকে পালিয়ে গেছে সর্দারের বড়বৌকে নিয়ে—দু'জনে একসঙ্গে। না, না, বৃথা কেন আর চোখের জল ফেলছ!…ওসব ওদেরি মানায়…এখন এর ভালো দিকটা দেখতে পাচ্ছ না কি?'

'কিছুক্ষণ আমাকে একলা থাকতে দাও।'—বলল নাচিয়ে মেয়ে আকুন্‌মা।

সে তার চোখের জল মুছল না, ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্নাটাও থামল না—এগিয়ে গেল তার বিছানার দিকে।

লেখিকা : গ্রেস ওগোট

আফ্রিকার নবীন সাহিত্য লোকে এই আফ্রিকান লেখিকা তাঁর দুখানি বইয়ের কৃতিত্বেই আপন স্থান করে নিয়েছেন : প্রথম ছোটগল্পের বইর ইংরেজী নাম 'ল্যান্ড উইথআউট থান্ডার'—বাংলায় বলা চলে 'যে দেশে বজ্রমেঘ নাই', এবং প্রথম উপন্যাস 'দি প্রমিস্‌ড ল্যান্ড—বাংলায় বলা চলে প্রতিশ্রুত ভূমি।

বর্তমান আফ্রিকায় ইনি একজন চমকে-দেওয়া লেখিকা। ভয়ংকর ও রহস্যময় এই দুদিকেই দুহাতে বল্গা টেনে ধরে ইনি চলতে পারেন কৃতিত্বের সঙ্গে। দৃশ্যের বহুবৈচিত্র্য ও ঘটনার রুদ্ধশ্বাস নাটকীয় বৈশিষ্ট্য এঁর গল্পগুলিকে করে তুলেছে ঐকান্তিকভাবেই স্বদেশীয়। নাইরোবির লেখিকা এই গ্রেস ওগোটের জীবনও বেশ বৈচিত্র্যময় : জন্মেছেন ১৯৩০এ, শিক্ষালাভ করেছেন নুগিয়া ও বুটেরে বিদ্যালয়ে, তারপরে ধাত্রীবিদ্যা গ্রহণ করেন উগান্ডায় ও ইংলন্ডে। ইনি নাটকের পাণ্ডুলিপি তৈরীর কাজও করেন, এবং ছিলেন পরিবার উন্নয়নের অফিসার, এবং একটা আন্তর্জাতিক বিমানসংস্থার জনসংযোগ-অফিসার। বর্তমানে নাইরোবিতে পরিচালনা করছেন নিজেরই ব্যবসাপত্র। নির্বাচিত গল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে ল্যান্ড উইথআউট থান্ডার্স থেকে।

বাঁশের ঘর

অস্ত-সূর্যটা জ্বলছে, ওর ক্রুদ্ধদৃষ্টিতে রক্তাক্ত হয়ে উঠছে ভিক্টোরিয়া লেকের জল। মুবোগার বুক ঢিপ ঢিপ করছে অতিদ্রুত। অস্ত যাবার সময়ে সূর্যের চেহারাটা এত বড় আর এত ভয়ানক দেখাচ্ছে—এমনটা তো দেখেননি আর কখনোই। অগ্রসর হতে লাগলেন তীর্থগিরি রামোগির পাদদেশের দিকে—ওখানেই তাঁর পূর্বপুরুষেরা ঈশ্বরের উপাসনা করেছেন, আর পূর্বপুরুষদের কাছে প্রার্থনা জানিয়ে এসেছেন সেই কোন্ অতীত থেকে।

কত বছর হয়ে গেল মুবোগা মনের কামনা নিবেদন করেছেন রামোগি সমীপে—রামোগিই তো তাঁদের লুউও জাতির জন্মদাতা। তাঁর কাছেই প্রার্থনা জানিয়েছেন একটি পুত্রসন্তানের জন্য—সে যেন তাঁদের এই কাডিপো উপজাতির জন্যে নির্দিষ্ট পবিত্র বেদীতে আসন গ্রহণ করতে পারে। অস্তসূর্যের দিকে তাকিয়ে প্রথামতোই নিষ্ঠীবন উৎক্ষেপ করলেন মুবোগা, তারপর উচ্চারণ করলেন প্রার্থনা-মন্ত্র—

রামোগির ভগবান তুমি, পোধোর ভগবান।

কোন্ দূরদেশ থেকে তুমি আমাদের এনেছ এখানে,
রক্ষা করেছ সমস্ত শত্রুদের হাত থেকে।
তুমি দিয়েছ আমাদের জমিজমা দিয়েছ কত সম্পদ—
বংশে বংশে জেগে থাক তোমার এই রামোগি নাম।
আমাদের উপজাতি বংশে বংশে বৃদ্ধি পাক—
বিস্তৃত হোক দিগ্বিদিকে।
সকলেই বলে আমাকে—মুবোগা মহান, সুন্দর শাসক,
দলের সর্দার।
পুত্রসন্তান ছাড়া সে কেমন মহান শাসক ?
উত্তরাধিকারী ছাড়া কেমন সে পিতা ?

মুবোগা যখন ফিরে এলেন, তখন ঘনিয়ে আসছে সন্ধ্যা। বাড়ীর ভিতর-আঙ্গিনায় তার 'মেয়ের পাল'—(ওদের সম্পর্কে উল্লেখ করতে গেলেই যেমনটা বলেন সবসময়েই) রাত্রের খানা পাকাবার কাজে সাহায্য করছে মায়েদের। মুবোগা তাঁর ষোলটি মেয়ের প্রত্যেককেই ভালোবাসেন ঠিকই, কিন্তু ওরা তো হাওয়ার পাখী—ঠিক সময়টি এলেই উড়ে চলে যাবে অন্যদেশে। কে তাঁর সহায় ও সান্ত্বনা হবে বুড়োবয়সে ?

সন্ধ্যেবেলায় যে ঝিরঝির বৃষ্টি শুরু হয়েছিল চলতে লাগল পরের দিন ভোর পর্যন্তই। শিশুরা সবাই যে যার মায়ের ঘরে। আগিসা একটা রাঙা-রাঙা মিঠে আলু তুলে নিল ঝুড়িটা থেকে, গুঁজে দিল ঘুঁটের আগুনে। একমুঠো শুকনো ঘুঁটেও ছড়িয়ে দিল আগুনের উপর। এবার তার মা আচিয়েং-এর দিকে ফিরে বলল—'মা মা! আমরা ওই বাঁশের ঘরটায় থাকতে পাই না কেন ? কী পরিস্কার পরিচ্ছন্ন, কী ছিমছাম, কী ঠাণ্ডা, আর কী সুন্দর ঘরটা। বাবাকে বলো না, ওখানে থাকব আমরা।'

'কিন্তু খুকী, আমাদের কুঁড়েটাই তো এই বাড়ীতে সবচেয়ে ভালো।'

'আমি জানি তা, মা! কিন্তু ওই যে বাঁশের ঘরটা, ওর কাছে দাঁড়ায় না। আমাদের কুঁড়েটাতে ভিতরের ঘর নাই, প্রার্থনা করার জন্যে কোনো বাঁশের খাটও নাই।'

আগিসো কাঠের খোঁচানীটা দিয়ে আলুটাকে খুঁচিয়ে দিল। এবার খোঁচানী ফেলে রেখে বলল—'ঠিকই মা, তবে তুমি যদি সর্দারের কাছে বলতে ভয় পাও তো আমি নিজেই গিয়ে জিজ্ঞেস করব। আমি ভয় পাই না।'

সর্দারের বড় কুঁড়েটার পাশেই দাঁড়িয়ে আছে বাঁশের কুঁড়েটি। ভারী সুন্দর দেখাচ্ছে সকালের ঝিরঝির বৃষ্টির মধ্যে দিয়ে। আগিসার মা চোখ ফিরিয়ে নেয় ওদিক থেকে। প্রায় সাত বছর পরে এই দ্বিতীয়বার তার বাচ্চা

'হবে। জানে—ঠিক মেয়েই হবে। সর্দারের ন'জন স্ত্রী, কিন্তু তিনি বলে রেখেছেন—তাঁর যে স্ত্রী তাঁকে ছেলের মুখ দেখাতে পারবে—উত্তরাধিকারী করবে, ঐ কুঁড়েটা হবে তারি।'

গিরিতীর্থে মুবোগার সেই প্রার্থনার দুমাস পরে এচিয়েং এক সন্তানের জন্ম দিল—নদীর কাছের কুয়ো থেকে জল আনতে গিয়েছিল যখন। একটা মেয়ে। এতদিন বড় আশা ছিল—তার ছেলে হবে, এবার তাই ঘৃণা জন্মাল মেয়েটির উপর। আর সে কাঁদতে লাগল বুকভাঙা কান্না। 'এই করুণ সংবাদটা কী করে আমি এখন স্বামীকে জানাব? আরো একটা মেয়ে—কী করে তিনি এটা সহ্য করবেন? না, না, না। আমি মুখ বুজে থাকব চির-দিনের জন্যেই। হ্যাঁ, আমাকে অভিশপ্তাই করে রাখলেন পূর্বপুরুষেরা।'

কিন্তু এচিয়েংএর কান্না হঠাৎ থেমে যায়—একটা তীব্র যন্ত্রণা যেন ছুরি দিয়ে চিরে ফেলছে তার পেট ও পিঠটা। এ এক দৈবী ঘটনা—দুর্লভ ঘটনা। এচিয়েং প্রসব করল আর একবারও—এবং এবারে ছেলে।

নদীতীর জনমানবশূন্য, মেয়েছেলেরা কেউই জল আনতে যায় না এই ঝাঁঝাঁ দুপুরে। চারদিক শান্ত স্তব্ধ। কেবলমাত্র কয়েকটা ব্যাঙ ডেকে উঠছে—তার আনন্দেই যোগ দিচ্ছে। বড়ই ক্লান্ত লাগছে, তবু কিছুক্ষণ বিচিত্র আবেগে ও আনন্দে নাচছে তার বুকের ভিতরটা। ভালোবাসা, ঘৃণা, ক্রোধ আর সুখ—ঘোরাফেরা করছে মিলেমিশে যাচ্ছে। সর্দার-স্বামী এই বারো বছর ধরে কেবলি দিন গুণেছেন একটি পুত্রসন্তানের জন্যে। একটিমাত্র ছেলেই থাক শুধু, তাকে দিয়েই সফল হ'ক ও'র সারাজীবনের স্বপ্ন। এচিয়েং মন স্থির করে ফেলেছে। ঘাস দিয়ে একটা ঝুড়ি বানাল, পাতা দিয়ে গেঁথে দিল চারপাশটা। এর মধ্যেই সে রাখল তার সদ্যোজাত মেয়েকে—আপিয়োকে। ঝুড়িটা লুকিয়ে রাখল কুয়োর কাছে। মেয়ের দিকে চেয়ে রইল অপলক—অনেকক্ষণ, তারপর একটা আঙুল বুলিয়ে দিল তার চোখে মুখে চুলে ওষ্ঠে, আর নরম নরম আঙুলগুলির উপর। এবারে ছেলেকে বুকে ক'রে—কেউ দেখতে না পায় এমনভাবে ঢুকে পড়ল তার কুঁড়েটিতে। সবাই তখন দুপুরের খাবার খেতে ব্যস্ত।

সর্দার মুগোবা বিশ্রাম করছেন তাঁর কুঁড়েতে। বিশেষ মূল্যবান সংবাদটি তাঁর কাছে নিবেদন করল তাঁরই প্রধানা স্ত্রী।

ভগবান রামোগি ঢেকে দিয়েছেন জাতির পিতার লজ্জা : মা এচিয়েং জন্ম দিয়েছে পুত্র-সন্তান।

মুবোগা তাকিয়ে আছেন তাঁর স্ত্রীর দিকে—যেন বিশ্বাস হচ্ছে না। সুখের হাসি খেলে গেল তাঁর ওষ্ঠাধরে— মিলিয়ে গেল, দুই কোণে রয়ে গেল

একটু কোঁচকানো ভাব। বড়বৌর দিকে একবার তাকিয়ে ম্‌বোগা চললেন এবার আচিংয়েরের কুঁড়ের দিকে, কিন্তু পথ আটকে রাখল বড়বৌ—'আবেগে অধীর হবেন না, মহামান্য সর্দার। এই চারদিন আচিয়েং থাকবে মেয়েছেলেদের তত্ত্বাবধানে। তারপরেই দেখতে যাবেন ছেলেকে।'

ম্‌গোবা পিছিয়ে গেলেন কয়েক পা, বসে পড়লেন টুলের উপর, বললেন—'ঠিক আছে, আচিয়েংকে বলো গে আমি সুসংবাদটা পেয়েছি।'

সর্দারের জয়ঢাক এবার বাজতে লাগল বুম্‌ বুম্‌ বুম্‌ বুম্‌—জানিয়ে দিচ্ছে জন্ম হয়েছে এক নতুন শিশুর। বুম্‌ বুম্‌ শব্দটা হল একসঙ্গেই চারবার, তিনবার হলে বোঝায় মেয়ে হয়েছে। সমস্ত পরিবারেই শুরু হল সে কী আনন্দ। ঈর্ষার সঙ্গেই কেমন এক বিদ্বেষ একত্র হচ্ছে আচিংয়ের সতীনদের মনে, কিন্তু বাইরে তা দেখাচ্ছে না। প্রসূতি মায়ের জন্য বলি দেওয়া হল একটা ভেড়া, আর উপহার দেওয়া হল কত কিছু।

সর্দার ম্‌বোগা কখনোই হাসতেন না বা চোখের জল ফেলতেন না সকলের মধ্যে, কিন্তু চতুর্থ দিনের দিন ছেলের নামকরণ উৎসবে ছেলেকে দুহাতে তুলে নিয়ে ছেলের যখন নামকরণ করলেন তখন তাঁর খুব ঘনিষ্ঠজনেরা স্পষ্ট দেখতে পেল সর্দারের দুই চোখে টলমল করছে বড় বড় দুফোঁটা অশ্রু।

'ভগবান রামোগির দ্বিতীয় পুত্রের নাম অনুসারেই তোমার নাম হল ওউইনি। বহুকাল বেঁচে থাকবে তুমি, আর আমি বৃদ্ধ হলে তুমিই রামোগি-দণ্ড ডানহাতে নিয়ে শাসন করবে তোমার প্রজাদের।'

রামোগির মন্ত্রঃপূত দন্ড এবার রাখা হল ওউইনির হাতে, সর্দারের রত্নখচিত বাজুবন্ধ রাখা হল তার মনিবন্ধের উপর।

সেদিনই আচিয়েং ও আগিসো—মা ও মেয়ে উঠল এসে বাঁশের কুঁড়েতে। সেখানেই তারা লালনপালন করবে ওউনিকে—ম্‌বোগার আসনে বসবার অধিকারী ওউইনিকে। তীর্থগিরির পাদদেশে সর্দার উদযাপন করলেন কৃতজ্ঞতা-অনুষ্ঠান। তাঁর প্রত্যেকটি প্রার্থনা বাক্যের শেষে উচ্চারিত হল—

'আজ আমি বুঝলাম তুমি ভগবান রামোগি আমাকে যথার্থই গ্রহণ করেছ জাতির শাসকরূপে। তুমি আমাকে দান করেছ পুত্রসন্তান।'

সমস্ত সোরগোলের মধ্যে আচিয়েং বজায় রেখে চলেছে এক আশ্চর্য রকমের স্তব্ধতা। মনে হচ্ছে তার বুকের ভিতরটা ভেঙ্গে চৌচির হতে চলেছে। এভাবে তো আর বেশীদিন পারবে না—কিন্তু কী করবে সে? মেয়ের খোঁজে বেরুবে? না, সেরকম কিছু তো করতে পারছে না। স্বামীকেই কি বলবে সব—কিন্তু বলবে কেমন ক'রে?

প্রসবের পরে মানে চলল সে ছয়দিনের দিন—সেই কুয়োর কাছে।

আপিওকে—তার মেয়েকে যেখানটায় ছেড়ে এসেছিল, তাড়াতাড়ি পার হয়ে গেল জায়গাটা। জায়গাটা তাকে কোনোভাবেই প্রতারণা করেনি—লম্বা ঘাসগুলি দাঁড়িয়েই আছে মাথা উঁচু, যেন কখনো কোনোকিছুই ঘটেনি এখানে। আচিয়েং ভাবছে কতকিছুই, এলোমেলো ভাবনা সব। তবু দুর্ভাবনা তো মাঝেমাঝে স্পষ্টই দেখছে যেন তার হারানো মেয়েকে। স্বপ্নের মতোই অথচ জীবন্ত। দেখছে সে—অস্থিচর্মসার এক বুড়ী, কুয়োর কাছে এগিয়ে এসে তুলে নিল তার খুকীকে। দেখছে—বুড়িটার চারপাশটা ঘুরে ঘুরে সে নাচতে লাগল ডাইনী নাচ, তারপর নিয়ে গেল খুকীকে। যে পথে চলে গেল সেটা হল এক নির্জন নিঃসঙ্গ ভূমি—তাদের স্বভূমি কাদিবো আর তাদের শত্রুভূমির মাঝখানটায়। তারপরেই খুকীকে ছুঁড়ে ফেলে দিল বনের মধ্যে—যে বন হিংস্র সব জন্তুজানোয়ারে ভরা। দেখতে দেখতে নিজের অগোচরেই সে চিৎকার করে উঠল। ঢিপ ঢিপ কাঁপতে লাগল বুক, হঠাৎ ভিজে উঠল দুই হাতের তালু। একি সত্যি? না, না, না।—নিজেই বলে ওঠে।

চলে গেল বছরের পর বছর, আচিয়েংর মানসিক বিপর্যয়ে কোনোই উন্নতি দেখা গেল না। দিনের বেলা দেখা দেয় স্বপ্নছায়া, আর কেমন হতাশা। আর রাতের বেলা সবি বিভীষিকা। তার বুকের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে যে মহাশূন্য গহবর তা তো ভরে তুলতে পারছে না তার সৌভাগ্যের শত সুখসুবিধে—তার ছেলের জীবনের শত সম্ভাবনার কথা। কিছুই তো একটুও ভরে তুলতে পারছে না তার বুকের ভিতরের অগাধ শূন্যতা।

ওউইনি দিনে দিনে হয়ে উঠেছে কী সুন্দর এক শক্তিমান যুবক—আর একমাত্র ছেলে হলে যেমনটা হয় পেয়েছে সেসব চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যও: খিটখিটে, উদ্ধত এবং বেপরোয়া।

একদিন বিকেলবেলা সর্দার প্রতিদিনের মতোই যখন যাচ্ছিলেন তীর্থগিরির দিকে, পথে পড়ল কয়েকটি তরুণী মেয়ে। মাথায় মাথায় নিয়ে চলেছে উনুনের লকড়ি। মেয়েরা পথ ছেড়ে দিল, সর্দারকে চলে যেতে দেবার জন্যে লুকাল গিয়ে ঝোপের আড়ালে। কিন্তু একটি মেয়ে তার মাথার বোঝাটা নিচে নামিয়ে দাঁড়িয়েই রইল। সর্দার খুব কাছে এলে সে মাথা নুইয়ে সর্দারকে অভিভাষণ করল—'মহান সর্দার, আপনার শান্তি কামনা করি।'

সর্দারও বললেন—'খুকী, শান্তি হোক তোমার।'—দৃশ্যতই মেয়েটির সাহস দেখে তিনি অভিভূত। 'তুমি দেখছি তোমার বোনদের মতো সর্দারকে ভয় পাওনা?'—সর্দার তাকে নিয়ে একটু মজা করেন।

'সহস্রবয় সর্দারের সাক্ষাৎ পেলাম এটা তো আমার সৌভাগ্য।' এর পরেই মাথার উপর বোঝাটা তুলে চলে যেতে থাকে।

সেদিন রাতেই মুগোবা তাঁর ছেলেকে ডেকে ওই মেয়েটির কথায় বললেন—'ওই মেয়েটি উলিগু গোষ্ঠির, ওইয়ুর চিলোর মেয়ে। তার কাকীমার কাছে বেড়াতে এসেছে। কালই ওর সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা করবে। যদি তোমার পছন্দ হয় তো আমরা ওর বাবামাকে বলব। ও তোমার যোগ্য বউই হবে।'

ওউইনি ওই তরুণীটির সঙ্গে দেখা করার জন্যে খুবি উৎসুক হল। কে এমন মেয়ে যে নিজেই তার ব্যক্তিত্ব দিয়ে সর্দারের উপরেও এতটা প্রভাব বিস্তার করতে পারে? মেয়েটির গতিবিধি সম্পর্কে সে খুব নজর রাখল। আর তারপর ওর নিযুক্ত একজন এসে জানাল যে ওই মেয়েটি তার সখীদের নিয়ে সাঁতার কাটছে ওড়ুডু নদীতে। ওউইনি সঙ্গেসঙ্গেই দ্রুত চলে যায় জায়গামতো।

নদীটাতে ছয় সাতটি মেয়ে সাঁৎরাতে সাঁৎরাতে পরস্পর কথা বলছিল চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে। ওদের মধ্যে বড়সড় একজনই সর্বপ্রথমে দেখতে পেল ওউইনিকে, জলের মধ্য দিয়ে দ্রুত উঠে আসতে আসতে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলে উঠল—'সর্দারের ছেলে রে, সর্দারের ছেলে।'

মেয়েরা সচেতন হয়ে উঠল হঠাৎ, জল থেকে উঠেই লুকাল গিয়ে ঝোপের আড়ালে। কিন্তু যে মেয়েটিকে মনে হল অন্য সবাইর চেয়ে অনেক ছোট সে কিন্তু সাঁৎরাতেই লাগল নির্ভাবনায়—আপনমনে। ওউইনি ঘনিয়ে এল ওর দিকে, ঠাট্টা করে বলল—'তা, তুমি দেখছি সর্দারেরা ছেলেকেও ভয় পাও না?'

মেয়েটি কিন্তু লজ্জা পেল না। সে এমনভাবে তাকাল স্পষ্টই ধরা পড়ছে সর্দারের ছেলেকে চেনে, মাথাটা একটু উঁচিয়ে স্তনদুটি ঢেকে বলে উঠল—'ভয় পাই না কারণ, সর্দারের ছেলে মেয়েদের গোপন নিরালার সম্মানটুকুও দিতে জানে না।'

'আমি তো পাহাড়ের দিকেই যাচ্ছিলাম শিকার করতে, হৈহৈ শব্দ শুনলাম—তাই দেখতে এলাম ব্যাপারটা কী?'

মেয়েটি জলে ডুব দিচ্ছে আর মাথা তুলছে, আর শেষকথার ভঙ্গীতে বলছে—'ঠিক আছে। এখন জানলেন তো আমরাই চেঁচাচ্ছিলাম, এবারে খাওয়াটা শুরু করুন আবার।'

ওউইনি দাঁড়িয়ে রইল বিব্রতভাবেই। এই জেদী ধরণের মেয়েটি তাদের গোষ্ঠিভুক্ত নয়—উচ্চারণটাই অন্য রকমের। সর্দার যার কথা বলেছেন এ হয়ত সেই।

'তুমি নিজেই উঠে এসে তোমার বন্ধুদের নেংটিগুলো দিতে পারো। আমি ওদের কাছে রূঢ় হতে চাই না।'

'তুমি যদি আমাদের নিরালা থাকতে দাও, তবেই কি ভালো হয় না? এখনো সাঁৎরাচ্ছি আমরা।'

'না।'—ওউইনি বলে দৃঢ়স্বরেই—'সর্দারের আগামী উৎসব সম্পর্কেই আমি তোমাদের সঙ্গে কথা বলতে চাইছিলাম।'

'ঠিক আছে আমার লেংটিটা ছুঁড়ে দাও—মালা-বসানো ঝলমল রঙেরটা।' মেয়েটির স্বাভাবিক অথচ গুরুত্বপূর্ণ ভাবখানা দেখে ওউইনি থমকে যায়। কখনোই সে কারো আদেশ গ্রহণ করেনি, কোনো মেয়েছেলের তো নয়ই। সবসময়ে তো তাকেই আপ্যায়ন করা হয়েছে। সে তার গর্বিত ভাবটা দমন করে ছুঁড়ে দিল ওর লেংটি। সেটা কোমরে জড়িয়ে জল থেকে মেয়েটি উঠে এল নির্ভয়ে। অন্যান্য লেংটিগুলিকে তুলে নিল তার বাহুতে, দিয়ে দিল ঝোপের পিছনে।

ওউইনির গা গরম হয়ে উঠল, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কেমন অস্বস্তি লাগছিল। তার জীবনে এই প্রথম সে নিজের স্থিরতা-বোধ হারিয়ে ফেলল। মেয়েটির দিকে ঘনিষ্ঠ দৃষ্টিতে তাকাল একবার—সর্দার যেমনটা বলেছেন তার চেয়ে অনেক বড়ই হবে। টানাগড়ণের তন্বী পা দুটি আর একটু বয়স হলেই ভরে উঠবে। আঙুলগুলি কী লম্বা লম্বা আর কী সুন্দর, পিঠটি বেশ সোজা, মোলায়েম পেটটি সমতল—কী লাবণ্যময়। স্তনদুটি এখনো অপরিণত—বুকের উপর উঁচিয়ে আছে—কাঠ-খোদাই এক নিখুঁত শিল্পের নমুনা। ফোটা ফোটা জল লেগে থেকে তার গায়ের রঙ—সূর্যোদয়ের আলো যেন। তার দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে ওউইনির মনে হয়—এ যেন পুরাণের কি রূপকথার সেই সাগর-রাণীই—অনিন্দ্যসুন্দরী এক সাগরকন্যা। পরস্পর কথা বলে কিছুটা। মেয়েটি বলল—তার নাম আউইতি।

সেদিন সন্ধ্যায় বিষণ্ণমুখে বসে রইল ওউইনি। তার বুকের ভিতরে জ্বলছে এ কেমন আগুন! বাবাকে জানাল—মেয়েটিকে দেখেছে সে এবং খুবি ভালো লেগেছে।

তখনকার দিনে সর্দারের ছেলের বিয়ের ব্যাপারের প্রাথমিক প্রস্তুতিটা হতেই হত যথাযথ—রীতিমতো। সর্দার তাই লোকজন পাঠালেন মেয়েটির পিছনের জীবনকথা অনুসন্ধান করবার জন্যে। মুখে মুখে ইতিমধ্যেই ওউইনির মা আচিয়েং শুনতে পেল যে তার ভাবী পুত্রবধূর মতো সুন্দরী দ্বিতীয় নাই তাদের সারাটা লৌভূমিতে। আর শুনল তাকে লালনপালন করা হয়েছে ঠিকমতোই, এবং কঠিন পরিশ্রমেও সে অভ্যস্ত।

সংবাদবাহকেরা হাজির হল—পায়ে পায়ে রাঙাধুলো, পেট খালি। ওদের দেখে সর্দার মুখরোচক সংবাদ শুনবার জন্যে এগিয়ে গেলেন তাঁর কুঁড়েতে।

সংবাদবাহকেরা বলল—মেয়েটি সম্পর্কে জানতে চাইলে ওইয়ুর চিলোর পরিবারের লোকজন আমাদের সঙ্গে ভদ্র ব্যবহার করেনি। মনে হচ্ছে আপনার

ছেলেই যে তার পানিপ্রার্থী সেই কথাটা আগেই গিয়ে পৌঁছেছে ওদের কাছে। ওরা মূলবিষয় চাপা দিয়েই বলছে কিনা ও এখনো খুবি ছোট, বিয়ের বয়স হয়নি। আমরাও চাপ দিয়ে কথা বললাম। আমরা দেখেছি মেয়েটিকে, খুবি সুন্দর এবং বিয়ের বয়স হয়েছে ঠিকই। পরিবারের লোকজন তখন বাইরে গিয়ে কী সব আলোচনা করল নিজেদের মধ্যে, আমাদের কাছে ফিরে এসে বলল যে সর্দারের ছেলের সঙ্গে বিয়েতে আউইনির আগ্রহ নেই বোধ হয়।

সংবাদবাহকটি কথা বলতে বলতে চিন্তিতভাবেই বিব্রত হয়ে তাকাচ্ছিল সর্দারের দিকে—জিভ দিয়ে ভিজিয়ে নিচ্ছিল শুষ্ক ওষ্ঠ।

'বলে যাও।'—সর্দার যেন গর্জে উঠলেন ক্রোধে। সর্দার তাকিয়ে ছিলেন অন্যদিকে, তাই সংবাদবাহকেরা দেখতে পেল না তাঁর বিকৃত কুঞ্চিত মুখখানা, দু'চোখে ক্রুদ্ধ ভ্রূকুটি।

সংবাদবাহকেরা বলতে লাগল—'মহান সর্দার, তারা শেষ পর্যন্ত বলল শেষকথা, এ বিয়ে হওয়া অসম্ভব।' সর্দার মুবোগার সুনাম কেবল তার গোষ্ঠীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। ওইউর চিলোর মেয়ে—এমন কী সে একটা, পাত্ররূপে প্রত্যাখ্যান করে কিনা সর্দারের ছেলেকে ?

'বলে যাও।'—বলেন সর্দার।

'যা সব অজুহাত দেখানো হল তাতে আমরা খুশি হইনি। গেলাম পাশের এক গ্রামে, জানতে চাইলাম মেয়েটি সম্পর্কে। জানলাম আউতির বাবা কে জানে না তারা, মা কে জানে না। পরিত্যক্ত অবস্থায় পাওয়া গেছে কুয়োর পাশে। পোষ্যপুত্রী নিয়েছে চিলোর বড়বৌ।'

সংবাদবাহক গলাটা পরিস্কার করে নিল, কপাল থেকে মুছে নিল ফোঁটা ফোঁটা ঘাম।

পরিবেশটা হঠাৎ হয়ে উঠল স্তব্ধ এবং শ্বাসরোধ হবার মতো, সর্দার মুবোগা চলে যেতে বললেন সংবাদবাহকদের। পাইপ থেকে ছাই ঝাড়বার জন্যে ঠুকলেন একটা কাষ্ঠখণ্ডের উপর। চোখে পড়ল ওউইনির নতুন কুঁড়েটা। মুবোগা জানেন—সংবাদটা ছেলের কাছে গ্রহণ বরবার মতো হবে না। কিন্তু তা বলে তো সর্দারের ছেলে বিয়ে করতে পারে না একটা যে-সে মেয়েকে—যার বাপ-মা কে তাই জানা নাই।

সেদিন সন্ধ্যাবেলা অস্থির গাভীগুলিকে যখন দোয়ানো হয়ে গেছে, ক্লান্ত শিশুরা আগুনের চারপাশে বসে আছে তাদের মায়েদের হাতে হাতে রাতের খাবার পরিবেশনের জন্যে,—ওউইনির ডাক পড়ল সর্দারের আস্তানায়। মুবোগা বেদনার্ত সংবাদটা জানালেন তাঁর ছেলেকে—'শোনো খোকা, চিলোর মেয়েকে তুমি বিয়ে করতে পারছ না। কুয়োর পাশে তাকে কেউ ফেলে রেখে

গিয়েছিল শিশুকালে। চিলোর স্ত্রীই তাকে নিয়ে গিয়ে লালনপালন করেছে।
মুগোবা পাইপ টানতে টানতে থুথু ফেললেন শক্ত-পেটাই মেঝের উপর।

'দেশের ভাবী শাসক হয়ে তুমি এমন কাউকে বিয়ে করতে পারো না—যার পিছনটা রহস্যাবৃত।'

যে পিছল টুলটায় ওউইনি বসে ছিল তার উপরে এবার চেপে বসল। উঠে পড়ে সর্দারের কুঁড়ে থেকে বেরিয়ে যেতেই চাইছিল, কিন্তু পিছিয়ে গেল। শ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসছে, মাথা ঘুরছে। আঘাতটা সামলে উঠতেই সে দেখতে লাগল আউইতির ছায়ামূর্তি—দেখতে লাগল তার সুন্দর দেহলতা, তার স্তন। আবার আগুন জ্বলে উঠল। বাবাকে বলতে হবে তার মনের ভিতরের কথাটা। —'বাবা, ওকেই আমার স্ত্রী হতে দাও। আমি ওকে ভালোবাসি। ওকে নিয়েই আমি থাকতে চাই। আমি…'

অশ্রুজলে বেধে গেল তার কণ্ঠস্বর, কথাটা আর শেষ করতে পারল না।

'না, খোকা!'—সর্দার বলতে লাগলেন—'আমাদের পরিবারের পক্ষে তা যথাযোগ্য হবে না—আমাদের পিতৃপুরুষগণ অসন্তুষ্ট হবেন। আমরা তোমার জন্য একটি যোগ্য মেয়ে এনে দেব।'

ওউইনি দাঁড়িয়ে পড়ল—অপ্রত্যাশিতভাবেই, ঘরটায় হাঁটতে লাগল এদিক থেকে ওদিক, উপরে নিচে। তারপর হঠাৎ বাবার দিকে মোড় ঘুরে দাঁড়াল—

'মহান সর্দার কি তাঁর মত পরিবর্তন করতে পারেন না, আমার আকাঙ্ক্ষা মতো মেয়েটিকেই বিয়ে করার অনুমতি দিতে পারেন না?'

মুবোগা হাতের শাসনদণ্ডটা আঁকড়ে ধরলেন দৃঢ় মুঠোয়। 'না!'—তাঁর কণ্ঠে গর্জে উঠল যেন এক বজ্র—কাঁপতে লাগল রাত্রির অন্ধকার। ওউইনি তার বাবার সামনে দাঁড়িয়ে রইল খানিকক্ষণ। তারপর গম্ভীরভাবেই বলল—

'মহান সর্দার, আপনি আমার মুখ আর দেখতে পাবেন না। চিলোর ঐ কন্যাকেই আমি বেছে নিয়েছি—আপনি আপনার পরবর্তী শাসকের পবিত্র বেদীটি নিজের জন্যেই রেখে দিন।'

বাবার উত্তরটা শুনবার অপেক্ষা না করেই চলে গেল ওউইনি। তার ঘরে গিয়ে বন্ধ করে দিল দরজা—চোখের সামনে থেকে সে মুছে ফেলতে চায় সমস্ত দুনিয়া। এখন কী করবে? আত্মহত্যা? না। আউইতিকে বিয়ে করার জন্যেই বেঁচে থাকতে হবে। পালিয়ে যাবে? কিন্তু কোথায়?

সংবাদটা জানতেই বাড়ীতে নেমে এল এক গভীর বিষন্নতা। কিন্তু সব মামারা-মামীরা, কাকারা-কাকীরা সমস্ত আত্মীয়েরাও সর্দারের সঙ্গে একমত: মুগোবার ছেলের জন্যে আউইতি যথাযোগ্য পাত্রী নয়। কেবলমাত্র আচিয়েং

অর্থাৎ কিনা আউইনির মা-ই জানত গোড়ার সত্যটা যে কী। কিন্তু সেই গোপন সত্যটা বুকে বয়েই কি দুচোখ বুজবে? তার ছেলের এখন জীবন-মরণ দশা। সর্দারের সামনে গিয়েই সত্যটা কেন প্রকাশ করছি না? সর্দারের জীবনটা ধ্বংস হয়ে যেতে পারে—কিন্তু তার তো মরবার বয়স হয়েছে। ছেলেটার সারাটা জীবনই যে সামনে। আচিয়েং মন স্থির করে ফেলেছে—সে বলবেই।

'ও আমারি মেয়ে। মহান সর্দারেরই মেয়ে আউইতি,—আপনার ছেলে ওউইনিরই যমজ বোন। কুয়োর পাশে ফেলে এসেছিলাম, আমি যে আপনাকে দিতে চেয়েছিলাম কেবলমাত্র একটি ছেলে।'

মুগোবা বসে রইলেন স্থির অনড়, ভয়-পাওয়া বেড়ালের মতো খাড়া হয়ে উঠল গায়ের লোম। তীর্থগিরির পথ দিয়ে ফেরার ছবিটা মনে জাগছে—আউইতি তাকে তখন পথে দাঁড়িয়েই অভ্যর্থনা জানিয়েছিল। হাঁ, মেয়েটির মুখখানি তাঁর ছেলের মুখের মতোই। রাত্রির অন্ধকারের ভিতর দিয়ে মুগোবা তাকিয়ে রইলেন তাঁর স্ত্রীকে ছাড়িয়ে। আর দু'এক ঘণ্টার মধ্যেই সূর্যোদয় হবে, এবং সারাটা দেশ জানতে পাবে সত্যটা। তিনি জানেন তাঁর স্বভূমির লোকজন স্পষ্টতই দাবী জানাবে আচিয়েংকে দূর করে দেবার জন্যে। আচিয়েং তার নবজাত সন্তানকে ফেলে দিয়েছে—পূর্ব পুরুষদের ক্রোধ সঞ্চার করেছে। সে সর্দারের স্ত্রী হবার যোগ্য নয়।

কিন্তু মুগোবা মনস্থির করেন: না, কেউই তাঁর কাছ থেকে সরিয়ে নিতে পারবে না আচিয়েংকে। সে তার জীবনবৃত্তের কেন্দ্র। সারাজীবনের আত্ম-প্রত্যয় ভেঙ্গে পড়লে যে সংশয় দেখা দেয়—সেই সংশয়ই দেখা দিল মুগোবার মনে। সবিস্ময়ে ভাবছেন—না জানি আরো কত গোপন সত্য ঢাকা আছে তাঁর স্ত্রীদের বুকের ভিতরে। আচিয়েং-এর মাথাটা তিনি তুলে ধরলেন তাঁর পা থেকে—

'আউইতির মা, ওঠো। আমার জন্যেই তো তুমি এতকাল বয়ে ফিরেছ কী দুঃসহ দুঃখ ভার! সন্তানের মুখ দেখে মা যে সুখে সুখী হয় তা থেকেও বঞ্চিত করেছ নিজেকে। যাও, এবার বলো গে তোমার ছেলেকে—তার আছে একটি অপূর্ব সুন্দরী বোন। আর, আমি বলি দেবার জন্যে ছেলেকে দিয়ে দিচ্ছি আমার সবসেরা বলদটাকে। আর খেতে বলছি সবাইকে একসঙ্গেই—ভাইবোন এবং বন্ধুবান্ধব সবাইকে। এবার আমরা সবাই মিলে আনন্দ উৎসব করব, কৃতজ্ঞতা জানাব আমাদের পূর্বপুরুষ রামোগিকে।'

—